বালজাক



যজ্ঞেশ্বর রায়

বালজাক

BALZAC
(A biography)
Publisher : Prakash Bhawan
15 Bankim Chatterjee Street
Calcutta-12
Price Rs, 5·00

বালজাক

প্রকাশ ভবন
১৫ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট ॥ কলিকাতা বারো

প্রথম মুদ্রণ শ্রাবণ ১৩৭৭

প্রকাশক :
শ্রীশচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
প্রকাশ ভবন
১৫, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট
কলিকাতা-১২

মুদ্রাকর :
শ্রীবঙ্কিমবিহারী রায়
অশোক প্রিন্টিং ওয়ার্কস
৭/এ বলাই সিংহ লেন
কলিকাতা-৯

প্রচ্ছদপট :
শিল্পী শ্রীকানাই পাল

পাঁচ টাকা

শ্রীতামস রঞ্জন রায়
দীর্ঘজীবেষু

এই লেখকের অন্যান্য বই

উপন্যাস :

পলিমাটি লোনা জল
যে তাপে রঙ বদলায়
ক্রীতদাস
এক বৃন্ত অন্য বলয়
মৌরি গ্রামের মেয়ে
শান্তনু

প্রবন্ধ :

নারী ও সমাজ
ভালবাসা ও বিবাহ
যৌন অভিলাষ

বালজাক শুধু স্বকালের নয় সর্বকালের শ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিক। কিন্তু নিজেকে শুধু শ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিক করেই ক্ষান্ত থাকেন নি ফ্রান্সের সাহিত্য-জগতের এই প্রমীথিউস। অমৃতে বিষে মিশিয়ে নিজের জীবনটাকেও তিনি এক অবিস্মরণীয় 'মিথ্'-এ রূপান্তরিত করেছিলেন। ধন চাই মান চাই ভালবাসা চাই—এই তিন আকাঙ্ক্ষার নিদারুণ আগুনে ঝাঁপ দিয়েছিলেন বালজাক। যে তীব্র আগুনে পুড়ে আর সকলে ছাই হয়ে যায়, সে আগুন পুড়িয়ে তাঁকে করেছিল খাঁটি সোনা। এ বই সেই নিখাদ সোনা হয়ে ওঠা দুর্ধর্ষ পুরুষটির বেদনা-বিদ্ধ জীবনের মর্মান্তিক সুখের কাহিনী—অনুপম এক উপন্যাস।

প্রচ্ছদ পরিচিতি

ভাস্কর্যের ইতিহাসে শিল্পী অগ্যুস্ত রদ্যাঁর তৈরি বালজাকের এই মুখাবয়বটি সব চেয়ে বিতর্কিত একটি শিল্প-কর্ম। একদা কলাসমালোচক ও কলারসিকরা শিল্পকর্মের এই অসামান্য সৃষ্টির বিরুদ্ধে নিন্দা ও সমালোচনায় মুখর হয়ে উঠেছিলেন। কিন্তু এখন সবাই এ-বিষয়ে একমত যে এটি ভাস্কর্য-শিল্পে রঁদ্যার একটি অন্যতম শ্রেষ্ঠ কীর্তি।



অনরে দ্য বালজাক (৪৩ বছর বয়সের ফটো)

এক

সাহিত্য কারো হাতে শোভন একগাছা ছড়ি। কারো কাছে চায়ের টেবিলে রমণীর আলাপচারিতা। শৌখিন মজদুরি কারো কারো কাছে। কিন্তু বালজাকের কাছে সাহিত্য ছিল লেলিহান এক মস্ত বড় অগ্নিকুণ্ড—যা পুড়িয়ে ভস্ম করে সমাজ সভ্যতা মনুষ্যত্ব, এমনকি প্রাসাদ কুটির মাটি পর্যন্ত যার নিদারুণ দাহে জ্বলে কয়লা হয়ে যায়। এ বিশাল অগ্নিকুণ্ডের পরিকল্পনা তাঁর নিজের; তিনি নিজের হাতে তার ইন্ধন যুগিয়েছেন, উসকানি দিয়েছেন, সঞ্চার করেছেন তাতে বিশ্বগ্রাসী জ্বালা। যৌবনে নিজের হাতে প্রজ্বলিত সে-অগ্নিকুণ্ডে শেষমেশ তিনি নিজেই নিজেকে আহুতি দিয়েছিলেন।

একান্তে একলা ভীষণ দারিদ্র্যের মধ্যে এ আগুন তিনি জ্বালিয়েছিলেন কিংবা দুর্ভাগ্যের নির্মম পেষণে জীবন-যন্ত্রণা আপনা থেকেই প্রবল শিখায় জ্বলে উঠেছিল। আর সে শিখার আগুনে মানুষের যত রকম ভাবাবেগ ও বৃত্তি—সেগুলিকে পুড়িয়ে শিল্প-শুদ্ধ করতে চেয়েছিলেন তিনি।

তাঁর সেই দুর্নিবার আকাঙ্ক্ষার অনির্বাণ শিখাকে জীবিত রাখতে কেউ সেদিন সাহায্যের এতটুকু হাত বাড়ায়নি। প্রশ্রয়ের এতটুকু হাসি ছিল না কারো মুখে। উৎসাহ দেবেন পিতৃবন্ধু পের ডাবলিন ছাড়া দ্বিতীয় আর একজন ছিল না।

নির্মম দারিদ্র্যের যন্ত্রণা ও সহস্র প্রতিবন্ধকের প্রবল স্রোত, যাতে ঐরাবতও ভেসে যায়, বালজাক তারই বিরুদ্ধে কুলিশ কঠোর প্রতিজ্ঞা নিয়ে রুখে দাঁড়িয়েছিলেন। এক নিঃসম্বল দুরাকাঙ্ক্ষী তরুণের সে এক অসীম মনোবলের দুর্লভ ইতিহাস।

এক উচ্চাভিলাষী দরিদ্র কৃষক-পিতার সন্তান বালজাক যখন জন্মগ্রহণ করেন (২০ মে ১৭৯৯) তখন তাঁর অর্ধশিক্ষিত পিত একমাত্র অয়স-কঠিন ইচ্ছাশক্তির জোরে উচ্চমধ্যবিত্ত সমাজের একজন প্রতিষ্ঠিত পুরুষ। সম্পদে ও সম্মানে এক প্রাদেশিক শহরের পাঁচজনের একজন। অথচ সে সুখ ও সৌভাগ্যে বালজাক জন্মমুহূর্ত থেকে বঞ্চিত। আঁতুড়ে মা ঘৃণায় মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিলেন তাঁর দিক

থেকে। আঁতুড়েই তাঁকে দিয়ে দিয়েছিলেন এক দাইয়ের কোলে তুলে। শুধু তাই না, নিজের কোল থেকে দাইয়ের কোলেই নয়, নিজের বাড়ি থেকে দাইয়ের বাড়িতে নির্বাসিত করেছিলেন তাঁকে। শুধু স্তন্য-দুগ্ধ নয়, মায়ের স্নেহ থেকেও বঞ্চিত হয়েছিলেন বালজাক। সপ্তাহে দু' সপ্তাহে একবার যদিবা তিনি মায়ের সামনে আসবার সুযোগ পেতেন, মায়ের কোলে উঠবার অধিকার পেতেন না তিনি কখনই। দু'খানি কচি হাত বাড়িয়ে যখনই তিনি কোলে ঝাঁপিয়ে পড়তে চেয়েছেন নিষ্ঠুর মা তখনই তাঁকে ঠেলে সরিয়ে দিয়েছেন।

অথচ এতখানি নির্দয় হওয়ার কোন প্রত্যক্ষ কারণ ছিল না আন শার্লোত্‌ লোর সালাঁবিএ-র। ছোট্ট শহর তুর-এর অভিজাত পল্লী ভিপারিজি-তে সুন্দর একখানা বাড়ি। স্ত্রীবৎসল স্বামী। বাড়ি ভরতি দাসদাসী। আয়াসের সকল সামগ্রী চারপাশে। অথচ তিনি অসুখী। ক্ষোভের কোন প্রত্যক্ষ কারণ না থাকলেই বুঝি, কিংবা ক্ষোভের কারণ আঙুল বাড়িয়ে দেখাতে না পারলেই যেন অসুখী মানুষ বেশী করে অসন্তুষ্ট ও রুক্ষ হয়ে ওঠে। তিনিও তাই হয়ে উঠেছিলেন।

মস্ত বড় এক ব্যাংকের অন্যতম মালিকের কন্যা সালাঁবিএ-র বয়স যখন উনিশ তখন সেই ব্যাংকেরই সেক্রেটারি পদে চাকরি করেন বেরনার ফ্রাঁসোআ। এগারটি সন্তানের একটিকে চার্চের হাতে তুলে দিয়ে সরল কৃষক-পিতা নিজের বংশকে পবিত্র করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু ধর্মে মতি ছিল না ফ্রাঁসোআর। কয়েক দিন চার্চের পাঠশালায় পড়াশোনা করেছেন কি করেন নি, দু'চার বার প্রার্থনায় যোগ দিয়েছেন কি দেন নি, হুট করে গাঁয়ের ছেলে আবার গাঁয়ে এসে হাজির। পড়াশোনায় মন বসেনি কিন্তু নিত্য অভাবের খিটিমিটির মধ্যে গ্রাম—বাড়িও ভাল লাগল না। ভেড়া চরিয়ে আঙুর ক্ষেতে দিন-মজুরি করে কোন মতে পেট চলে বটে কিন্তু তাতে দামাল ছেলের মন ভরে না। অতএব একদিন জন্মের মতন দেশ ছেড়ে বেড়িয়ে পড়লেন বেরনার ফ্রাঁসোআ বালসা। নগরে বন্দরে দেশান্তরে অস্থির যৌবনের দিন কাটে। পেটে বিদ্যে নেই এক ফোঁটা—সম্বল কেবল অটুট স্বাস্থ্য আর কঠিন সংকল্প। সম্পদ সম্মান আর অভিজাত সমাজের একজন হবার স্বপ্ন দেখতে দেখতে যখন যে-কাজ পান করেন। অকস্মাৎ সুযোগ এনে দিল রাষ্ট্র-বিপ্লব। রাজা, নেপোলেওঁ আর সাধারণতন্ত্রের মধ্যে দেশের মন তিন ভাগ হয়ে গেছে। যুদ্ধ-বিগ্রহ ও অন্তর্দ্বন্দ্বে ঘোলাটে হয়েছে দেশের আকাশ। সে অন্ধকারে লুটেপুটে যে যেমন পারছে নিজের আখের গুছিয়ে নিচ্ছে। ফ্রাঁসোআ-ও পেছিয়ে নেই। যেখানেই পকেট ভারি হওয়ার সুযোগ সেখানেই তিনি। সাপ্লাই, কনট্র্যাকটারি, দালালি,

চাকরি—একটা ধরছেন, আর একটা ছাড়ছেন, অথবা একযোগে দু'টো তিনটেই চালিয়ে যাচ্ছেন। এমনি করে ধাপে-ধাপে এগুতে এগুতে তিনি অবশেষে স্বপ্নের দেউড়ি পার হয়ে এলেন। সচ্ছল হলেন, সম্মান পেলেন। কৃষকপদবি 'বালসা' কেটে অভিজাত পদবি বালজাক করলেন, উচ্চবিত্ত সমাজে ঠাঁই মিলল তাঁর। তিনি তখন এক মস্ত বড় ব্যাংকের খুব উঁচু পদের অফিসার। বয়স তত দিনে পঞ্চাশ পেরিয়ে গেছে কিন্তু পাথরের মতন শক্ত শরীরে কালের নখ এতটুকু আঁচড় কাটকে পারেনি। পঞ্চাশ পেরিয়েও তিনি যুবক—অম্লান স্বাস্থ্য, অটুট কর্মশক্তি, উচ্চাশায় তখনও ঝক্‌মক্ করছে চোখ। সালাঁবিএ-র বাবা, ওই ব্যাংকেরই এক ধনী অংশীদার, অফুরন্ত যৌবনের আধার প্রফুল্লচিত্ত বন্ধুবৎসল পুরুষটিকে দেখে মুগ্ধ হলেন। বয়সের এতখানি ব্যবধান চোখেই পড়ল না তাঁর। উনিশ বছরের মেয়েকে একান্ন বছরের পুরুষের হাতে নির্দ্বিধায় তুলে দিলেন, সঙ্গে দিলেন নগদে ও আসবাব-অলঙ্কারে প্রভূত যৌতুক। রাজকন্যা আর অর্ধেক রাজত্ব দিয়ে প্রসন্নভাগ্য যেন নিজের হাতেই কঠিন কষ্টের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ মানুষটির আত্মপ্রত্যয়কে পুরস্কৃত করলেন। কিন্তু সালাঁবিএ বুঝি এ বিয়েতে সুখী হলেন না। একটি পুরুষের কাছে নারী যা আশা করে সব পেয়েও তিনি অপ্রসন্ন যেন বয়সের ব্যবধানটাই মনের মিল হবার সব বড় বাধা হয়ে সালাঁবিএ-কে অসুখী করে রাখল। প্রতিকারহীন সে আপসোসে অসুখী মনের সমস্ত বিদ্বেষই বুঝি পরম অবহেলা হয়ে নেমে এসেছিল তাঁদের প্রথম সন্তান বালজাকের ওপরে।

পরবর্তী কালে বালজাক অনেকবার কাতরোক্তি করেছেন, "আমার মা নেই, আমার মা ছিল না কোন কালে।" মাতৃস্নেহের কাঙাল বালজাকের বঞ্চিত হৃদয়ের চিরকালের রক্তাক্ত ক্ষত আমরা সব চেয়ে বেশী উন্মোচিত দেখি মাদাম ইভা দ্য হাঁসকাকে লেখা চিঠিতে। সে দীর্ঘ চিঠির এক জায়গায় তিনি লিখছেন, "......আমরা ভেবেছিলাম, আমাদের মা আসলে পাগল। মায়ের সঙ্গে তেত্রিশ বছরের পরিচয় এমন একজন ডাক্তারের সঙ্গে এ বিষয়ে আমরা পরামর্শ করেছিলাম। তিনি বলেছিলেন, 'না, তোমাদের মা পাগল নন, তাঁর চরিত্রের বড় দোষ, তিনি অত্যন্ত ঈর্ষা কাতর।'.. । মা আমাকে নানা কারণেই ঘৃণা করতেন, তিনি বুঝি আমাকে ঘৃণা করতে শুরু করেছিলেন আমার জন্মের আগে থেকেই। আমার জীবনের যত দুঃখ, কষ্ট ও যন্ত্রণা তার সব কিছুর জন্যে দায়ী আমার মা।"

দাইয়ের বাড়িতে সাত বছর মানুষ হওয়ার পর পোটলাপুঁটলি বেঁধে তাঁকে পাঠিয়ে দেওয়া হয় দূরের শহর ভেঁদোমে, এক বোরডিং স্কুলে। অবাঞ্ছিত সন্তানকে

চোখের সামনে থেকে যত দূরে সম্ভব নির্বাসিত করাই যেন ছিল তাঁর মায়ের একমাত্র লক্ষ্য। সেই নির্বাসিত শৈশবের মর্মান্তিক কষ্ট ও শাস্তির কাহিনী তিনি 'লুই ল্যাঁবারত'-এর জবানীতে অমর করে রেখেছেন। সে নিষ্ঠুর অত্যাচারের কাহিনী পড়লে অতি বড় পাষণ্ডের চক্ষুও অশ্রুতে ঝাপসা হয়ে উঠবে।

ছোট্ট নদী লোয়ার-এর ধারে ভেঁদোম শহরের মধ্যেখানে ছিল এই স্কুল বাড়ি। উঁচু পাঁচিল-ঘেরা স্কুল বাড়িটার দিকে তাকালে, স্কুল বাড়ি নয়, মনে হত জেলখানা। আসলে জেলখানাই। দু'তিন শ' কিশোর পড়ুয়া আশ্রম-জীবনের কঠোর নিয়মানুবর্তিতার নামে প্রকৃতপক্ষে কয়েদীর জীবন যাপন করত সেখানে। খাওয়া-থাকা ও পড়ার খরচ সবই দিতে হত অভিভাবকদের। এবং যেহেতু সেখানকার সব ছেলেরাই ছিল কৃষিজীবীর সন্তান, তাদের জীবন ছিল অত্যন্ত দরিদ্রের। তাদের হাতে পায়ে মোজা থাকত না, উপযুক্ত শীতবস্ত্রও জুটত না তাদের। কৃষক-ছেলেদের যদিবা সে কষ্ট সহ্য হত বালজাকের কষ্টের সীমা ছিল না। হাত মুখ শীতে সিঁটে হয়ে থাকত, পায়ে ঘা হত। ঠাণ্ডায় ঠক্‌ঠক্ করতেন সব সময়। প্রতি শীতে কিছু শীতবস্ত্রের জন্যে বালজাক মায়ের কাছে কাতর আবেদন জানাতেন কিন্তু সে আবেদন নিষ্ঠুর মায়ের মনে এক বিন্দু রেখাপাত করতে পারত না, তিনি নীরব নির্বিকার থাকতেন। কোন দিন কেউ বালজাকের বাড়ি থেকে তাঁকে দেখতে আসত না। অভিভাবকদের না আসাটাই রেওয়াজ ছিল সেখানকার।

স্কুলে আসার আগে বালজাকের আর কিছু না থাক বনের নিবিড় ছায়া ও মাঠের উজ্জ্বল রৌদ্রে অবারিত মুক্তি ছিল। যে মানুষটি তাঁকে লালন-পালন করত বালজাকের জন্যে তার মমতা ছিল অত্যন্ত আন্তরিক। সেই আন্তরিক মমতার স্বাধীনতা থেকে স্কুলের পাঁচিল-ঘেরা বন্দী-জীবনের নির্মমতায় এসে, স্কুলের কঠোর নিয়ম-শৃঙ্খলার মধ্যে তিনি অত্যন্ত অসহায় হয়ে পড়েছিলেন। খাওয়ার লাইন, উঠতে বসতে নানা নিয়মকানুন—একটা ঘরের মধ্যে সত্তর আশি জনের শোয়া থাকা অসহ্য লাগত তাঁর। ঘিঞ্জি নোংরা দুর্গন্ধ ও গুমট বাতাস অস্থির করত তাঁকে। বিষণ্ণ করে রাখত সব সময়।

ক্লাসে বসে তিনি কখনো খাতার পাতায় মন দিতে পারতেন না। গাছের পাতায় আকাশের মেঘে মন ঘুরে বেড়াত। হঠাৎ শিক্ষকের চোখে পড়লে, তিনি কর্কশ কণ্ঠে গর্জন করে উঠতেন, "বালজাক তুমি অমনোযোগী হয়ে পড়েছ।" বালজাক শিউরে উঠে খাতার পাতায় চোখ নামিয়ে নিয়ে আসতেন। কিন্তু শিক্ষকের ওই সতর্ক বাণীই শাসনের সব ছিল না। আসলে পড়ানোর চেয়ে শাস্তি

দেওয়ার দিকেই বেশী ঝোঁক ছিল তাঁদের। যে কোন অপরাধে শাস্তি ছিল বেঞ্চির পায়ায় হাত পা বেঁধে মার। অপরাধের গুরুত্ব বুঝে মারের মাত্রার কম বেশী হত। সব চেয়ে গুরুতর অপরাধের শাস্তি ছিল দু ইঞ্চি পাশের পুরু চামড়ার চাবুকের মার। মারতে মারতে অজ্ঞান করে ফেলে তবে ছাড়তেন তাঁকে শিক্ষক। প্রায় প্রতি দিনই কারো না কারো ভাগ্যে এই মারের বরাদ্দ ছিল। যত দিন যাচ্ছিল বালজাকের ভাগ্যে এই মারের বরাদ্দ যেন ক্রমাগতই বাড়ছিল। কেননা তাঁর বিদ্রোহী আত্মা কখনোই এই শারীরিক অত্যাচারের কাছে আত্মসমর্পণ করতে চাইত না। দুর্বল শরীর প্রচণ্ড মারের চোটে কুঁকড়ে যেত, যন্ত্রণার অনিচ্ছুক শব্দ বেরোত মুখ দিয়ে, চোখ দিয়ে জল গড়াত, অজ্ঞান হয়ে যেতেন কখনো কখনো; কিন্তু তাতে মন ভেঙে পড়ত না কখনো তাঁর, ওই বয়সেই তিনি প্রাজ্ঞ দার্শনিকের মতন মনটাকে শরীর থেকে আলাদা করতে পেরেছিলেন। তাঁর ভাষায়, শরীরটা একটা খোসা মাত্র, তার ওপরেই অত্যাচার চালাতেন শিক্ষক, তাঁরা কখনো তাঁর মনের নাগাল পেতেন না।

"বালজাক তুমি অমনোযোগী হয়ে পড়েছ।" এই গর্জন শোনা মাত্র আসন্ন অবশ্যম্ভাবী শাস্তির কথা ভেবে মুহূর্তের জন্যে বালজাক যখন তাঁর শিক্ষকের দিকে তাকাতেন, মুহূর্তের জন্যে হলেও সে-দৃষ্টি সহ্য করতে পারতেন না শিক্ষক। যেন বালজাকের শরীরের কোন গোপন গভীর থেকে একটা অসহ্য বিদ্যুৎ প্রবাহ এসে চাবুকের মতন আছড়ে পড়ত তাঁর চোখে। ছাত্রের এই দৃষ্টি বিনিময়কে শিক্ষক মনে করতেন অবাধ্যতা, বিদ্রোহ। অতএব সে বিদ্রোহ দমন করতে, তাঁকে বাধ্য বশংবদ করতে চাবুক হাতে মূর্তিমান জল্লাদের মতন উঠে দাঁড়াতেন শিক্ষক।

শিক্ষকেরা তাঁদের অজ্ঞাতসারে মনে করতেন, তাঁদের প্রভাব অস্বীকার করার একটা দুর্দান্ত শক্তি যেন ছেলেটার মধ্যে কোথায় লুকিয়ে আছে। প্রতিরোধের সেই লুকানো শক্তির প্রাচীর চূর্ণ করতেই যেন বন্দীশালার সব শিক্ষক বদ্ধপরিকর হয়েছিলেন। তাঁরা কখনো মুহূর্তের জন্যেও অনুভব করেননি যে, ছেলেটির সত্তার গভীরে অত্যন্ত নিভৃতে 'হয়ে ওঠার' এক অলৌকিক প্রক্রিয়া চলছে। তাঁরা কেবল ভাবতেন; ছেলেটা আর পাঁচজন থেকে আলাদা, অলস, ভোঁতা। এ মর্মে চিঠি লিখে তাঁরা বাড়িতেও বালজাকের নামে অভিযোগ পাঠাতেন। ফলে নির্মম মা আরও বেশী নিষ্ঠুর হয়ে উঠতেন। প্রচণ্ড শীতে একটা অতিরিক্ত কম্বল দেওয়া দূরে থাক এক জোড়া মোজা পর্যন্ত পাঠাতেন না। বাড়ির এই অবহেলা, শিক্ষকদের অত্যাচার, স্কুলের দুর্গন্ধ ঘিঞ্জি নোংরার মধ্যে বাস ইত্যাদির জন্যে বালজাকের শরীর দিন দিন যতই ক্ষীণ হয়ে আসছিল মনের মধ্যে ততই উজ্জ্বল হয়ে উঠছিল অনির্বাণ

এক শিখা। এই শিখার সমিধ যোগাতেন স্কুলের লাইব্রেরিয়ান। বালজাকের মধ্যে অতৃপ্ত এক অপরিসীম জ্ঞানপিপাসা আবিষ্কার করে তিনি খুশি হয়েছিলেন এবং অসহায় ছেলেটিকে সান্ত্বনা দিতে, যে বই-ই বালজাক চাইতেন, তিনি পরম আগ্রহে পড়তে দিতেন।

বারো বছর বয়সেই বালজাক প্রচণ্ড পড়ুয়া। তাঁর সমস্ত যন্ত্রণার একমাত্র নিরসন—বইয়ের জগতের মধ্যে তিনি আশ্রয় খুঁজেছেন, আশ্রয় পেয়েছেন। বস্তুত পুঁথির জগৎই হয়ে উঠেছিল তাঁর সান্ত্বনার শান্তিনিকেতন। তাঁর স্কুলজীবনের যত অত্যাচার অপমান বইয়ের জগতে তার সব-ই আনন্দ ও তৃপ্তির ফুল হয়ে ফুটে উঠত। তিনি একখানা বই হাতে নিয়ে সমস্ত চরাচর পরিবেশ ভুলে মগ্ন আত্মবিস্মৃত হয়ে যেতেন। ক্লাসের পড়া, স্কুলপাঠ্য তাঁর ভাল লাগত না। আসলে সেগুলি তাঁর কাছে ছিল জলের মতন তরল শিশুপাঠ্য। তাঁর কানের কাছে যারা সে পাঠ্যপুস্তক চেঁচিয়ে পড়ত তাদের দিকে কয়েক মিনিট কান পেতে থাকলেই সে পাঠ তাঁর তৈরি হয়ে যেত। অতএব বছরের পর বছর অনায়াসে তিনি পাশ করে গেছেন।

চৌদ্দ বছর বয়সে অবশেষে সে-স্কুলের বন্দীশালা থেকে তাঁর মুক্তি ঘটল। এবার আর দূর-আত্মীয়ের মতন সপ্তাহে-দুসপ্তাহে একবার বেড়াতে আসা নয়, এবার তিনি বাড়ির ছেলে বাড়িতে স্থায়ীভাবে বাস করবার সুযোগ পেলেন। তখন তাঁর স্বাস্থ্য একেবারে ভেঙে গেছে। স্কুলে যাবার আগে, সাত বছরের সুঠাম স্বাস্থ্য হাসিখুশি ছেলে, চৌদ্দ বছরে ফিরে এলেন যেন বেতের ছড়ির মতন লিকলিকে হাড়সর্বস্ব একটি রুগ্ন মানুষ। হাঁটেন যেন নিশি-পাওয়ার মতন, তাকান যেন শূন্য দেখছেন। কেউ কিছু জিজ্ঞেস করলে চুপ করে থাকেন। যেন শুনতে পাননি। কিন্তু ভিতরে ভিতরে তাঁর যে আর সকল থেকে স্বতন্ত্র একটা বৈশিষ্ট্য আছে সেটা কারো নজর এড়ায় না।

বাড়িতে থাকতে থাকতে ক্রমশ স্বাস্থ্য ফিরতে থাকল তাঁর। বস্তুত উত্তরাধিকার সূত্রে পিতার স্বাস্থ্য ও মনোবল দু-ই পেয়েছিলেন বালজাক, বন্দীজীবনের শাস্তি অশান্তি থেকে মুক্তি পেয়ে, খোলা হাওয়ায় আলোতে খাদ্যের পুষ্টিকরতায় হৃত স্বাস্থ্য আয়ত্ত করতে বেশী দেরি লাগল না তাঁর।

স্বাস্থ্য একটু ফিরতেই আবার তাঁকে ভরতি করে দেওয়া হল এক গ্রামার স্কুলে। এটাও একটা আবাসিক বিদ্যালয়। এখানে আবার সেই শাস্তি শুরু হল। এবার শারীরিক নয়, মানসিক। এখানে সকলেই সম্পন্ন পরিবারের ছেলে। যদৃচ্ছা খরচ করবার পয়সা সবাইর হাতে থাকে ; কিন্তু বালজাকের সব সময় শূন্য হাত।

স্নেহ মমতাহীন আবাসিক বিদ্যালয়ে শূন্য হাতে বালজাকের বিদ্রোহী মন বারে বারে অমনোযোগী হয়, ফলে এখানেও তিনি কোন মতে পাশ করে বেরোতে পারেন মাত্র, ফল আদৌ আশাপ্রদ হয় না। অতএব মা যথারীতি ক্ষেপে যান। অপদার্থ ছেলের মুখদর্শন করবেন না ঠিক করে সঙ্গে সঙ্গে ভর্তি করে দেন বিশ্ববিদ্যালয়ে। সেখান থেকে আইনের ছাত্র হিসাবে তিনি উত্তীর্ণ হয়ে বেরোন ১৮১৬ সালের ৪ নবেম্বর। নিঃশ্বাস ফেলবার অবকাশ না দিয়ে মা তক্ষুনি তাঁকে এক আইন ব্যবসায়ীর শিক্ষানবিশীতে লাগিয়ে দিলেন। মায়ের ইচ্ছে "ছেলে তাঁর জজ হয়ে নামডাকে সমাজের এক বিশিষ্ট ব্যক্তি হবে, বড় ঘরে বিয়ে হবে, প্রচুর যৌতুক পাবে।" মা যখন ছেলের গৌরবে অভিজাত সমাজে বালজাক-পরিবারের অধিকতর প্রতিষ্ঠা ও সুদূর প্রসারী মর্যাদার এবম্বিধ স্বপ্ন দেখছিলেন; ছেলে তখন স্বপ্ন দেখছিলেন সাহিত্যের—অসামান্য সাহিত্যিক নামে বিশ্বজোড়া খ্যাতির।

সেই সাহিত্যিক-সম্মান সম্পদ ও স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখতে দেখতে কয়েক দিনের মধ্যেই শিক্ষানবিশীর জীবনে বিতস্পৃহ হয়ে উঠলেন বালজাক। ১৮১৯ সালের বসন্তে এক দুপুরবেলা নোটারি-অফিসের চেয়ার ঠেলে উঠে দাঁড়ালেন। দলিল-দস্তাবেজ আইনের বই যেমন খোলা মেলা ছড়ানো ছিটানো ছিল, পড়ে থাকল। তিনি বেরিয়ে এলেন। নোটারি না, অ্যাডভোকেট না, জজ না—আর পারিবারিক ইচ্ছার দাসত্ব করবেন না তিনি। তিনি অভিজাত সমাজের কোন পেশাতেই ঢুকবেন না। তিনি সাহিত্যিক হবেন।

বালজাকের সেই অমোঘ ঘোষণা শুনে মা স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। বাপ বোবা হয়ে রইলেন। কেবল বোন এগিয়ে এসে দাদার হাত ধরল, তাঁর চোখের মধ্যে তাকাল। চোখে তাঁর দিব্য বিভা। বোন মুগ্ধ হয়ে দেখল।

মা ক্ষণকাল স্তব্ধ থেকে চিৎকার করে উঠলেন, "কক্ষনো না, হতেই পারে না।" তাঁর মনশ্চক্ষে ভেসে বেড়াচ্ছে আত্মীয় স্বজন ও সমাজের বিশিষ্ট মানুষদের কুঞ্চিত নাসা, অবজ্ঞার চাহনি, ধিক্কার। যে ছেলে জজ হবে বলে তিনি স্বপ্ন দেখছেন, কারো কারো কাছে বড় মুখ করে ছেলের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে সগর্ব ঘোষণা করেছেন, সে কিনা তাঁর সে আশায় ছাই দিয়ে, তাঁকে সমাজের পাঁচজনের কাছে হেঁট করে লেখক হতে চাচ্ছে। লেখক! কে পোঁছে লেখককে। লেখককে লোকে লোফার মনে করে, যেখানে পয়সা নেই, সেখানে সম্মানও নেই। অসম্মান অবজ্ঞার পাত্র হয়ে তাঁর ছেলে বংশের নাম ডোবাবে, না, এ কখনো হতে পারে না। "না, লেখক হওয়া চলবে না, নোটারি অফিসে ফিরে যাও।" রায় দিলেন মা। "তোমাকে

লেখাপড়া শেখানোর জন্য আমি অনেক টাকা খরচ করেছি, আমি তা বরবাদ হতে দেব না।"

তবু বালজাক তাঁর সঙ্কল্পে অটল। মায়ের কথায় নাক কুঁচকোলেন তিনি। তীব্র চোখে তাকালেন তাঁর দিকে। বললেন, "আমি স্থির করে ফেলেছি।"

এই প্রথম অবনত-মস্তক সর্বদা-বশম্বদ ছেলের চোখে বিদ্রোহ দেখলেন মা। এমন অনমনীয় জেদ যে ছেলের মধ্যে আছে, কোন দিন তিনি ভাবতেই পারেননি। মা কেঁদে ফেললেন। অপমানে দুঃখে ক্ষোভে পুনঃপুন ফিট হতে থাকল তাঁর তথাপি সঙ্কল্পচ্যুত হলেন না বালজাক।

নীরবে পিতা দেখছিলেন পুত্রকে। যেন নিজেরই দামাল যৌবনকে দেখছিলেন সামনে। স্বাস্থ্যে তাঁর মতন বলিষ্ঠ না হোক মনোবলে তেমনি কঠিন। জীবন নিয়ে তিনিও কম জুয়া খেলেন নি, কম অ্যাডভেঞ্চার করেন নি। বার বার পেশা বদল করেছেন, পুনঃপুন নতুন নতুন দুঃসাহসের কাজে ঝাঁপ দিয়েছেন। তাঁর ছেলেও তাঁর মতনই হবে বই কি! তিনি বালজাকের অপরিণামদর্শিতার জন্যে অন্তরে ক্ষুণ্ণ হলেন তবু তাঁর ওপরে কিছুতে কঠিন হতে পারলেন না। অবশ্য স্পষ্টত স্ত্রীর কথার প্রতিবাদ করলেন না কিন্তু মনে মনে তাঁর দুঃসাহসকে সমর্থন করলেন। "করুক না ওর মন যা করতে চায়। বছর দুইয়ের জন্যে ওকে একটা সুযোগ দিলে দোষটা কী।"

বেশ কয়েক দিন বসে গালমন্দ কথা কাটাকাটি জল্পনা-কল্পনার পর অবশেষে অনমনীয় সন্তানের কাছে পরম বিতৃষ্ণায় আত্মসমর্পণ করলেন মা। স্থির হল 'বিখ্যাত' লেখক হওয়ার জন্যে তাকে সুযোগ দেওয়া হবে—কীভাবে সে 'বিখ্যাত' লেখক হবে সেইটে তার নিজের ব্যাপার। তবে তাকে দু'বছরের বেশী এ সুযোগ দেওয়া হবে না। দু'বছরের মধ্যে সে যদি 'বিখ্যাত' না হতে পারে তাকে সাহায্য দেওয়া বন্ধ করে দেওয়া হবে। তাকে ফিরে এসে আবার নোটারি অফিসে ঢুকতে হবে। যদি না ঢুকতে চায়, তাকে জন্মের মতন বিদেয় করে দেওয়া হবে।

উক্ত শর্তে মাসে ১২০ ফ্রাঁ বরাদ্দ হল বালজাকের জন্য। অর্থাৎ অমরত্বের সন্ধানে অনিশ্চয়ের পথে বালজাকের পাথেয় হল দিনে ৪ ফ্রাঁ!

এই ভিখিরীর বরাদ্দেও যখন একগুঁয়ে ছেলের জেদ ভাঙল না তখন ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে মা নিজে এলেন পারীতে। মনে মনে সংকল্প ছেলের জন্যে এমন একটা ঘর ভাড়া করবেন যেখানে প্রচণ্ড ঠাণ্ডায় অনাহারে ও নোংরার মধ্যে থেকে ছেলে হাড়ে হাড়ে টের পাবে বাড়ির খাওয়া থাকা ছিল কত আরামের আর নোটারি

অফিস ছিল কত সুখের। মূর্খরা ঠেকে শেখে, লাঞ্ছনা পেয়ে বোঝে—এই নীতিবাক্য স্মরণ করে তিনি অনেক ঘুরে অনেক অনুসন্ধান করে অবশেষে মনের মতন একখানা ঘর পেলেন—ঘর না খুপরি। তাঁর 'লা পো দ্য শ্যাগ্রাঁ' পুস্তকের বর্ণনা অনুসারে শহরতলির দরিদ্র পল্লীর ৯ নম্বর র‍্যু লে দিগিয়্যে-এর সেই কুৎসিততম খুপরিতে ঢুকলে হঠাৎ কিছু দেখা যায় না, চোখ অভ্যস্ত হতে কয়েক মিনিট সময় লাগে এত অন্ধকার, আর সোজা হয়ে দাঁড়ালে মাথায় ঠেকে, তার ছাদ এমনই নিচু। শুধু তাই না, চারধার থেকে হুড় হুড় করে বাতাস ঢোকে, দেওয়ালগুলি এমন ফুটো ফাটা আর সামান্য হাওয়াতেই ঠকৃঠক কাঁপে, জানলা-দরজা এমন নড়বড়ে। অধিকন্তু শীতে যেমন প্রচণ্ড ঠাণ্ডা গ্রীষ্মে তেমনি নিদারুণ গরম। —দেখেশুনে মা ঠিক করলেন প্রতিভা বিকাশের এইটেই উপযুক্ত জায়গা। দিনে সামান্য তিন 'স্যু' (পাঁচ স্যু-তে এক ফ্রাঁ) ভাড়াতেও বাড়িঅলি এ খুপরির জন্যে ভাড়াটে জোটাতে পারেনি। পড়ে থেকে থেকে খুপরিটা তাই আরও জীর্ণ হয়ে গিয়েছিল। সেই খুপরিতে সেই ভাড়ায় বালজাককে স্থিত করে মা বাড়ি চলে এলেন। দিনে মাত্র চার ফ্রাঁতে যার সব খরচ মিটিয়ে পারীর মতন শহরে বাঁচতে হবে তার মাথা গোঁজবার ঠাঁই এর চেয়ে আর ভাল কী হবে। বাড়ি এসে মা একটা নড়বড়ে খাট ততোধিক নড়বড়ে টেবিল একটা, একটা চেয়ার ও কয়েকটা ছেঁড়া কম্বল কিছু ফ্লানেলের শার্ট পাঠিয়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত রইলেন। মনে মনে আশা ছেলের সাহিত্যিক হবার শখ মিটতে দেরি হবে না। আবার সে ফিরে আসবে নোটারি অফিসে। মা তখনও ছেলের জজ হওয়ার স্বপ্ন দেখতে থাকেন।

কিন্তু বালজাক অটল। তিনি সেই চরম দুর্দশার মধ্যেই ভাগ্য পরীক্ষায় সন্নিষ্ঠ হলেন। ঝি চাকরের খরচ বাঁচাতে নিজেই নিজের ঘর দুরস্ত রাখেন, দূরের ঝরনা থেকে জল বয়ে নিয়ে আসেন, লনড্রির খরচ বাঁচাতে ঘরেই কাচাকুচির কাজ সারেন। তবু দিনে তিন স্যু ঘর ভাড়ায়, দুই স্যু আলোর তেলে, দুই স্যু ঘর গরম রাখার জন্যে কয়লায় এবং আরও তিন স্যু সাবান পেস্ট ইত্যাদি টুকিটাকি মিলে খরচা হয়ে যায়। সারারাত জাগার জন্যে কফি ও দেহ রক্ষার জন্যে সামান্য খাওয়ার বাবদ খরচা করেন আট স্যু! বাদ-বাকি দুই স্যু আকস্মিক প্রয়োজনের জন্যে হাতে রাখেন। প্রতিটি স্যু খরচ করবার আগে পঞ্চাশ বার ভাবেন। খরচ না করে পারলে কিছুতেই খরচ করেন না। এ ভাবে একযোগে কৃচ্ছ্রসাধনা ও সাহিত্যসাধনা চলতে থাকে। যেন যত কষ্ট পান তত জেদ বাড়ে।

কম্বলে পা কোমর মুড়ে তিনি টেবিলে এসে বসেন। ক্ষুধায় মলিন শীতে

কাতর তিনি কলম হাতে করে বাইরে তাকিয়ে থাকেন। এলোমেলো দালান বস্তি ছাদ টালির চাল জলের পাইপ চিমনির ধোঁয়া ধুলো দেখেন। দেখতে দেখতে এই সব দৃশ্য অতিক্রম করে দৃষ্টি কোন দূর অদৃশ্যে চলে যায়। কিছুক্ষণ আত্মবিস্মৃত হয়ে থাকার পর আবার চোখ আপাত দৃশ্যে ফিরে আসে। স্বপ্নাচ্ছন্ন চোখ তীক্ষ্ণ হয়ে ওঠে। বেশী না., পৃথিবীর এই ক্ষুদ্র অংশটুকুকে তিনি জয় করতে চান। পারীকে তিনি জয় করবেন। করতেই হবে। মস্ত বড় একটা দস্তার দোয়াতে কালি, দু' ভল্যুম ডিকসনারি, সাদা কাগজ, কলম সামনে টেবিলের ওপরে সাজানো —আর তাঁকে বেষ্টন করে তাঁকে ছাড়িয়ে দূরে মহান নগরী পারী। চঞ্চল অস্থির সুখী পারী। বিকাশোন্মুখ প্রতিভার দিকে তাকানোর অবসর তার নেই, যেন সেই মেজাজই নয় তার। বস্তির খোপে খোপে কত তরুণ পচছে! অত খবর রাখতে গেলে চলে না। আসলে প্রতিভারা হল বেড়ালের মুখে দুধ। তা ছাড়া জীবন বড় ব্যস্ত জটিল রুদ্ধশ্বাস। তাই আমোদ-ফুর্তির বড় দরকার—সুযোগ পেলেই এবং সুযোগ কারো না কারো কোন না কোন সময় আছেই, অতএব পারী সব সময়ই স্ফুর্তিতে মগ্ন। দাঁতে দাঁত চেপে বালজাক দোয়াতে কলম ডোবান। তিনি যাবেন না, সে-উৎসবে শরিক হবেন না তিনি। যতক্ষণ না এই পারী নগরী তার সব কাজ ভুলে তাঁর দিকে মুগ্ধ হয়ে তাকায় তিনি নিজেকে নির্বাসিত রাখবেন। তাঁর যেন মনে মনে জানা, তাঁর মধ্যে সেই অমোঘ শক্তি আছে, পারী নগরীকে একদিন বালজাকের নামে নতজানু করতে পারবেন। কিন্তু কবে? সেদিনে পৌঁছতে কত দিন লাগবে?

দুই

লিখতে বসে কী লিখবেন ভাবতে গিয়ে হিমসিম খান বালজাক। এলোমেলো মিছিল করে অস্থির চঞ্চল হাজারো চরিত্র এসে তাঁকে ঘিরে ধরে, বক্তব্য-রা বন্যার মতন নেমে এসে তাঁর সমস্ত বোধ আচ্ছন্ন করে থৈ-থৈ করতে থাকে। কাকে রাখবেন কাকে ফেলবেন বুঝে উঠতে পারেন না—সবাইকে রাখতে সমস্ত বক্তব্য উপস্থিত করতে যে আঙ্গিক যে কলা-রীতি দরকার তিনি তা খুঁজে পান না। সময় বয়ে যায়। আর যত সময় বয়ে যায় তত হতাশ অসহিষ্ণু ও অনিশ্চিত হয়ে ওঠেন। কখনো ভাবেন দর্শন লিখবেন, কখনো অপেরায় হাত দেওয়া সহজ মনে হয়। কখনো মনে মনে চিন্তা করেন একটা মহাকাব্য লিখলে কেমন হয়, কখনো উপন্যাসের কথা ভাবতে ভাবতে তন্ময় হয়ে যান। আর কেবলি সব—সমস্ত ভাবনা এসে শেষ হয় বিশ্ববিখ্যাত হওয়ার স্বপ্নে। কিন্তু কিছু একটা না লিখলে যে স্বপ্ন কখনো সত্য হয়ে উঠবে না সে কথা মনে হতেই চমকে ওঠেন। হিজিবিজি দাগ কেটে সাদা কাগজ কালো করেন, একটা লাইনও কলমের মুখে কাগজের পাতায় প্রত্যক্ষ হয়ে ওঠে না। আশঙ্কায় ভরে ওঠে মন। মায়ের কঠিন মুখ বাবার অনিচ্ছুক চোখ মনে পড়ে। চোখে অন্ধকার দেখেন। সে অন্ধকারে পরম সান্ত্বনার মতন জলজ্বল করে ছোট বোনটির মমতার দৃষ্টি। একমাত্র সে-ই আশা করে বসে আছে তার দাদা অসামান্য একটি রচনা উপস্থিত করে সবাইকে অবাক করে দেবে। কিন্তু কিছু লিখতে পারছেন না। হতাশ হয়ে লাইব্রেরি থেকে বই নিয়ে আসেন, দিনরাত বই পড়েন, বোনকে লেখেন, "কী লিখব, কেমন করে লিখব, শিখতে আমি ক্রমাগত বই পড়ছি এখন, নানান রকম বই।"

দেখতে দেখতে দু' মাস কেটে গেল। হঠাৎ তিনি মরিয়া হয়ে উঠলেন, ঠিক করে ফেললেন, একখানা ঐতিহাসিক কাব্য-নাটক লিখবেন। খবরটা জানালেন বোনকে, লিখলেন, "আমার কাব্য-নাটকের বিষয় হবে 'ক্রমওয়েল'। হয় আমি প্রতিভাবান সাহিত্যিক হব, নয় মরব এর মধ্যে বাঁচার আর অন্য কোন শর্ত নেই আমার।"

তিনি লিখতে বসলেন। লিখে চললেন। ক্ষুধা তৃষ্ণা শীত গ্রীষ্ম অবসাদ ক্লান্তিতে ভ্রূক্ষেপহীন অনির্বাণ উৎসাহে লেখা এগিয়ে চলল। লিখতে লিখতে ভাবা আর ভাবতে ভাবতে লেখা। কাটাকুটি করা আবারকরে লেখা—এমনি কঠোর

পরিশ্রমের শেষে দীর্ঘ আট মাসে সৃষ্ট হল 'ক্রমওয়েল'। মাকে সংবাদটা দিতেই তিনি ডেকে পাঠালেন। তাঁর কৃতিত্বের পরীক্ষা নিতে বাড়িতে সভা বসল। মা বাবা পিতৃবন্ধু পের ডাবলিন কতিপয় আত্মীয় স্বজন, তাঁর বোন, বোনের ইতিমধ্যে বিয়ে হয়ে গিয়েছে, তার স্বামী মঁসিয়ে স্যুর্ভিল—সকলের সামনে কাঁপা গলায় দ্বিধাগ্রস্ত বালজাক তাঁর রচনা পড়লেন। শ্রোতারা কেউ সমজদার নন। তাঁরা কেউ নিশ্চয় করে কিছু বলতে পারলেন না। তখন ভগ্নীপতির পরামর্শে, সাহিত্যের অধ্যাপক, কিছু লিখে নামও করেছেন এমন একজনের কাছে মতামতের জন্যে পাঠানো হল। তিনি বালজাককে সরাসরি নিরুৎসাহ না করে তাঁর মাকে জানালেন, "আপনি বরং বালজাককে গল্প উপন্যাস লিখতে বলুন, কাব্য-নাটকের চেয়ে ওটাই ওর পক্ষে বেশী সহজ হবে। তাছাড়া সাহিত্য নিয়ে সর্বক্ষণ পড়ে না থেকে অন্য কোন কাজকর্ম বা চাকরির অবসরে সাহিত্য করা ভাল।"

পরামর্শটা স্বভাবতই মায়ের খুব মনঃপুত হল; কিন্তু বালজাক বেঁকে বসলেন। তাঁর তখনও ধারণা অধ্যাপক যাই বলুন 'ক্রমওয়েল' নিঃসন্দেহে এক অসামান্য রচনা। সে ধারণায় অবিচল তিনি বললেন, "চাকরি নিলে আমি নষ্ট হয়ে যাব। প্রতিদিনকার একঘেয়ে জীবনে বেঁচে থাকার অর্থ মিলস্টোনের মতন ক্ষয় হয়ে যাওয়া। না আমি তা পারব না। কিছুতে না।"

তাঁর মনে মনে বিশ্বাস তিনি এক বিশেষ দায়িত্ব পালনের জন্যে পৃথিবীতে ভূমিষ্ঠ হয়েছেন। সে দায়িত্ব তিনি পালন করবেনই। গতানুগতিক জীবনের কাছে আত্মসমর্পণ করবেন না, কখনো না। "আরও একটা বছর আছে। দু'বছর তোমরা আমায় সময় দিয়েছিলে, দু'টা বছর পূর্ণ হতে দাও।" বালজাক আবেদন জানালেন। "বেশ," মা বললেন, "দু'বছর পূর্ণ হয়ে গেলে আর একটি পয়সাও আমাদের কাছ থেকে পাবে না তুমি।" মা তাঁর শেষ রায় দিয়ে বিদায় দিলেন ছেলেকে।

পারীর সেই বস্তির খোপে আবার ফিরে এলেন বালজাক। পিতৃবন্ধু পের ডাবলিন আন্তরিক মমতায় 'ক্রমওয়েল' নিয়ে নাট্যসঙ্ঘ, প্রকাশকসংস্থার দোরে-দোরে ঘুরলেন, কেউ তাঁকে পাত্তা দিলে না। অবশেষে হাল ছেড়ে দিয়ে বালজাক 'ক্রমওয়েল'-এর পাণ্ডুলিপি দেরাজে তুলে রেখে অন্য পথ ভাবতে লাগলেন। 'ক্রমওয়েল' রচনা ব্যর্থ হয়ে যাওয়ার ফলে তাঁর বিখ্যাত হওয়ার স্বপ্ন চূর্ণ হয়ে গেছে। স্বপ্নের মানুষ এবার মাটিতে নেমে এসেছেন: খ্যাতি অপেক্ষা করতে পারে, সে অপেক্ষা করুক, তাঁর এই মুহূর্তের সমস্যা টাকা, যেমন করে হোক টাকা চাই। যে কোন

উপায়ে টাকা রোজগার করতে হবে। বাপমার কাছ থেকে ভিক্ষার টাকা এনে তার প্রতিটি কপর্দকের হিসাব দিতে আর তিনি রাজি নন। রাজি থাকলেও অনন্তকাল তারা তাঁর ভরণপোষণ করবে কেন? করবে না। তিনি তাদের দাস হয়েও থাকতে চান না। এ দাসত্বের জীবন থেকে অবিলম্বে মুক্তি চাই। সে-মুক্তি কিনতে যে-লেখা লিখলেই টাকা, সে-লেখা লিখবার জন্যে অস্থির হয়ে উঠলেন। কিন্তু কোন্ লেখা তৎক্ষণাৎ টাকা প্রসব করে তিনি ভেবে পান না। অথচ দিন যায়, দিনের সঙ্গে শর্তের সময় সংক্ষিপ্ত হয়ে আসে। অস্থির হয়ে ওঠেন বালজাক। পাগলের মতন রাস্তায় রাস্তায় ঘোরেন, কখনো লাইব্রেরিতে কখনো রেসতোরাঁয় বসেন। এই চরম মানসিক বিপর্যয়ের সময়ে তাঁর সঙ্গে পরিচয় হল একটি যুবকের, নাম অগুাস্ত্ ল্য পোয়াতভ্যাঁ দ্য লেগ্রভিল। সুন্দর সুপুরুষ এই চতুর যুবকের সাহিত্য-প্রতিভা ছিল না কিন্তু ব্যবসায় বুদ্ধি ছিল। পিতা ছিলেন শস্তা নাট্য সংস্থার অভিনেতা। সব দেশে সব কালে বটতলার লেখক ও প্রকাশক থাকে। পারীতেও সেদিন ছিল। পিতার পেশার সূত্রে বটতলার সেই লেখক ও প্রকাশকদের সঙ্গে যুবকটির পরিচয় ছিল। সাহিত্য-পাগল বালজাকের সঙ্গে আলাপ হতে সে সে-পরিচয়কে কাজে লাগাতে চাইল। "কাগজে কালি শুকোতে না শুকোতে যদি টাকা চাও ত আমি যা বলি কর। খুন জখম রাহাজানি মারামারি ব্যভিচার বলাৎকারের ছড়াছড়ি থাকবে এমন উপন্যাস লেখ। তোমার নাম দেবার দরকার নেই, ছদ্মনামে লিখে যাবে। এক এক নামে এক একখানা বই লিখবে। ইতিহাসের পটভূমি, বস্তির পটভূমি, যুদ্ধের পটভূমি—তোমার উপন্যাসের পরিবেশ যাই হোক আসলে যা থাকবে তা ওই যা বললাম।"

অনন্যোপায় বালজাক রাজি হয়ে গেলেন এবং সেই দিন থেকেই শুরু করে দিলেন বটতলার ফরমাস খাটা। তাঁর মধ্যে জলে উঠবার জন্যে যে আগুন ধিকি-ধিকি জলছিল সে এবার দাউ দাউ করে উঠল। সে আগুনে পুড়তে থাকল তাঁর উচ্চাশা, বিখ্যাত লেখক হওয়ার স্বপ্ন। এমনকি নিষ্ঠা সততা পর্যন্ত তিনি আহুতি দিলেন। পাঁচ সাতখানা উপন্যাস সামনে করে তিনি লিখতে বসেন, ক্ষ্যাপার মতন লিখে চলেন, অবিবেকী মন তাঁর কারো প্লট কারো চরিত্র কারো বর্ণনা নিরংকুশ চিত্তে চুরি করে যায়, উড়ন্ত দুরন্ত কল্পনা ছাড়া নিজের বলতে তার মধ্যে আর কিছু থাকে না। দিনে পঁচিশ তিরিশ পাতা করে লিখতে হলে, দু'সপ্তাহে দেড় সপ্তাহে একখানা করে উপন্যাস শেষ করতে হলে এ ছাড়া আর উপায়ই বা কী থাকে! খাওয়া নাওয়া ঘুম বিশ্রাম উবে গেছে বালজাকের। চার শ' পাঁচশ' ফ্রাঁ করে

পাচ্ছেন একএকখানা বইতে, আসলে বইয়ের কলেবর অনুযায়ী আট শ' থেকে হাজার-বারশ' ফ্রাঁ তাঁর হকের পাওনা কিন্তু দালাল ছ লেগ্রভিলের সঙ্গে তাঁর আধাআধি বখরার শর্ত, নইলে পাবলিশারকে বই গছাতে ঘুরবে কে? তিনি ত নিত্য প্রসূতির মতন আঁতুড় ঘরে বন্দী, অতএব ন্যায্য পাওনার অর্ধেক পেয়েই তাঁর আনন্দ, সুখ; সেই আনন্দে সুখে বুঁদ হয়ে তিনি স্বাস্থ্য সময় যৌবন সব ভুলে গেছেন।

পারীর বস্তির খুপরি ছেড়ে ভিপারিজি-তে চলে এসেছিলেন তিনি লেগ্রভিলের সঙ্গে কন্ট্রাক্ট হবার কয়েক মাস পরেই। নিজের বাড়িতে বোনের পরিত্যক্ত ঘরে তিনি সাহিত্যের কারখানা খুলেছিলেন, অথবা আঁতুড় ঘর। সেখানে তিনি দিনরাত পড়ে থেকে সাহিত্য সৃষ্টি করেন, অবিশ্রাম অনবরত। নিরলস নিরবচ্ছিন্ন সে কারখানার কর্মে নিমেষের বিরতি নেই। খোঁচা খোঁচা দাড়ি, উস্কখুস্ক চুল, ক্লান্ত অপরিচ্ছন্ন চেহারা, কোটরগত চোখ ক্ষ্যাপার মতন জ্বলছে। দেখে শুনে মা একদিন রেগে গিয়ে স্বামীকে বললেন, "ছেলেটা রাতদিন খাওয়া ঘুম ছেড়ে পাগলের মতন কেবল লিখছে, এর পরিণামটা ভেবে দেখেছো? আমি শেষমেশ একটা অথর্ব মানুষের বোঝা সারাজীবন বইব?" কিন্তু বালজাক কোন দিনই বাপমার বাধ্য নন, আজও কেউ তাঁকে বাধ্য করতে পারল না। আজ ত আরও না পারার কথা কেননা, আজ তিনি স্বয়ম্ভর স্বাধীন। বাড়িতে খাওয়া-পরা-থাকার জন্যে মাকে নিয়মিত টাকা দিচ্ছেন। তারপরেও তাঁর হাতে কিছু জমছে। আজ আর তাঁর বিশ্ববিখ্যাত সাহিত্যিক হওয়ার স্বপ্ন নেই, আজ তাঁর কেবল স্বপ্ন ধনী হওয়ার।

এ সময়ে বালজাক তাঁর বোনকে লিখেছেন:

প্রিয়বোন, আমার কলম এখন চতুর্থ হেনরির ঘোড়ার মতন ছুটছে...... আমার আশা বছর ঘুরতে না ঘুরতে বিশ হাজার ফ্রাঁ উপার্জন করতে পারব। আর সেই অর্থ হবে আমার ভবিষ্যতে নিশ্চিন্ত মুক্তির ভিত্তি। এখনও আমার চারখানা বই শেষ করতে বাকি, তাছাড়া আরও কয়েকখানা নাটকের ফরমাস আছে। বোন তুমি দেখো, সেদিন সুদূর নয় যখন লরড্ আরঅঁ্য একজন বহুপ্রজ রোমাঞ্চ লেখক হিসেবে বিশ্ববিখ্যাত হবে। মেয়েরা তাঁকে তাদের চোখের মনির মতন ভালবাসবে। তখন তোমার 'অনরে' পকেট ভরতি টাকা নিয়ে নিজের জুড়ি-গাড়িতে করে বেড়াবে। তার উন্নত শির গর্বিত চোখ দেখে রাস্তার লোক সসম্ভ্রমে সরে দাঁড়াবে, ফিস্ফিস্ করে বলবে ওই দেখ, মাদাম ছ স্যুরভিলের দাদা যাচ্ছে।

ছোটবোন লোর্ বিয়ে হয়ে হয়েছে মাদাম দ্য স্যুরভিল আর অনরে বালজাক শ' খানেক ছদ্ম নামে লিখতে লিখতে অবশেষে নিজের 'Honore' নামটিকে ভেঙেচুরে হয়েছেন লরড্ আরওঁ্যা। শেষমেশ আরও একটি ছদ্মনাম নিয়েছিলেন। ওরেস দ্য সে ওব্যাঁ। বিবিধ ছদ্মনামে বালজাক যে কত বই লিখেছিলেন অতি বড় বালজাক-বিশেষজ্ঞও আজ পর্যন্ত তার সীমা-সংখ্যা নির্ণয় করতে পারেননি। ১৮২০ থেকে ১৮২২ এ-তিন বছরে তিনি বছরে গড়ে বারো চোদ্দখানা করে উপন্যাস লিখেছেন। কোন কোন বইয়ের আবার দু' তিনটে করে খণ্ড ছিল। তার একখানা বই আট শ' থেকে হাজার বারো শ' ফ্রাঁ দামে বিক্রি হত কিন্তু আগেই বলেছি এ অর্থের সবটাই তাঁর পকেটে আসত না। আদ্দেক টাকা দালালি বাবদ চলে যেত পোয়াৎভ্যাঁ দ্য লেগ্রভিলের পকেটে, কেননা সে-ই বাজারে ঘুরে বালজাকের জন্যে প্রকাশক সংগ্রহ করত। তবু বালজাক আশা করতেন অচিরেই তিনি এ উপায়ে প্রভূত ধনের মালিক হবেন। এ আশার উৎসাহে জানপ্রাণ দিয়ে খাটলেও, হাজারো ছদ্মনামে রোমাঞ্চ-পিয়াসী অর্ধশিক্ষিত মানুষের মন ভোলানো বস্তাপচা বই লিখতে লিখতে কখনো কখনো তাঁর হাতের কলম অবশ হয়ে আসত, মন রচনা-বিমুখ অন্যমনস্ক হয়ে পড়ত। তিনি অত্যন্ত বিষণ্ণ বোধ করতেন। সে বিষণ্ণ-মুহূর্তে তাঁর সত্তার গভীরে বুভুক্ষু শিল্পিমনের হাহাকার তাঁর কানে আসত। তিনি চমকে উঠতেন। কেবল অর্থের ধান্ধায়, কেবল বাপ-মার অধীনতা থেকে মুক্ত হওয়ার ঐকান্তিক বাসনায় তিনি যে তাঁর শিল্পিসত্তাকে তিলে তিলে হত্যা করছেন, টের পেয়ে অস্থির হয়ে উঠতেন। এই আপাত-লোভের পাপচক্রের মধ্যে নিজেকে তখন রুদ্ধশ্বাস মুমূর্ষু মনে হত।

সেই আত্মিক যন্ত্রণার মুমূর্ষু মুহূর্তে তিনি তাঁর বোনকে লিখেছিলেন: "স্বাধীন ভাবে লিখে কিছু রোজগার করবার এই সুযোগ পেয়ে আমি নিজেকে সর্বদাই ভাগ্যবান মনে করি। আমি আশা করি, এ পথে আরও অনেক দিন লেগে থেকে বেশ মোটা একটা টাকা সঞ্চয় করতে পারব। কিন্তু বোন, লিখতে লিখতে ক্রমাগতই আমি আমার শক্তি সম্পর্কে সচেতন হচ্ছি। আর যতই সচেতন হচ্ছি ততই আমার মন বেদনায় ভরে উঠছে। আমি আমার শক্তি কতকগুলি অতিশয় বাজে লেখার মধ্যে অপব্যয় করছি দেখে মাঝে মাঝে আমার চোখ ফেটে জল আসে। আমি আমার মনশ্চক্ষে দেখতে পাই, কে যেন আমায় হাত ছানি দিয়ে ডাকছে। বোন, আমি যদি আর একটু সচ্ছল হতে পারি, দেখো, আমি আবার আমার প্রকৃত সাহিত্যকর্ম নিয়ে বসব।......আমি উপন্যাস লিখে স্বাধীনতা

চেয়েছিলাম, স্বচ্ছলতা চেয়েছিলাম, কিন্তু আমি কোথায় আজ নেমে এসেছি ছাখ।......"

তিনি যা লিখতেন দ্বিতীয়বার আর তা পড়তেন না। ঘৃণাভরে দালালের হাতে তুলে দিতেন, সে-দালালের মুখের দিকে পর্যন্ত তাকাতেন না। তাকে পর্যন্ত তিনি ঘৃণা করতেন। এই ঘৃণা-বশতই, বটতলার ভাড়াটে লেখক হিসাবে নিজেকে যতপরোনাস্তি পঙ্কে নিমজ্জিত করলেও নিজের নামটিকে কখনো তার সঙ্গে অপবিত্র কলঙ্কিত করেননি। তিনি অজস্র ছদ্মনাম ব্যবহার করেছেন কিন্তু কোন বইতেই নিজের নাম যুক্ত করেননি। যে বোন তাঁর এত প্রিয় ও তাঁর প্রতিকূল সংসারের একমাত্র আশ্রয় তাকে পর্যন্ত তিনি এসব বইয়ের ছু'একখানার বেশী দেননি। এবং দিয়ে লিখেছেন। "কাউকে পড়তে দেবে না। আমার ব্যর্থ সাহিত্য রচনার সাক্ষী রাখতে শুধু এ বই তোমাকে পাঠালাম। তুমি পড়ে ছিঁড়ে ফেলে দিও। কেউ যেন না জানতে পায় এ বই তোমার দাদার লেখা—বালজাক এ বই লিখেছে।"

এ ঘৃণা শুধু তাঁর বইয়ের প্রতি নয়, নিজের প্রতিও। তাই নিজেকে তিনি যৎপরোনাস্তি অবহেলা করতেন। নিজের শরীরটাকে মেশিনের মতন খাটিয়েছেন —ছুটি নেই, বিশ্রাম নেই, খাওয়া নেই, ঘুম নেই, আমোদফুর্তি নেই, কেবল ঘোড়ার মতন ছোটা, গাধার মতন খাটা। খাটুনির নেশায় নিজেকে ক্ষয় করে দেওয়ার জেদে পেয়ে বসেছিল তাঁকে। সাহিত্যিক হওয়ার জন্যে নয়, টাকার জন্যে। টাকা আর টাকা। টাকার জন্যে যেন না আর কখনো তাঁকে বাপমার কাছে হাত পাততে হয়, চাকরি করতে হয়। হাড় কালি করে স্বাস্থ্য বরবাদ করে তিনি টাকা রোজগার করবেন, এত টাকা, যেন ভবিষ্যতে ছু'হাতে ওড়ালেও সে টাকা না ফুরোয়। রূপসী নারী, সাজানো-গুছনো বাড়ি, দাস-দাসী গাড়ি-ঘোড়া—ধনাঢ্য মানুষের স্বপ্ন দেখতেন বালজাক।

কিন্তু শুধু স্বপ্নে ত যৌবনের সব ক্ষুধা মেটে না, বাস্তবের স্পর্শে ধন্য হতে চায় যৌবন। বুভুক্ষু যৌবনের সে জ্বালা তেইশ বছরে পা দিয়ে তীব্র হয়ে উঠল তাঁর। সে তীব্র জ্বালা মর্মস্পর্শী হয়ে উঠেছে যখন তিনি বলেছেন,—"আহা, যদি কেউ আমার এই তুষার-অস্তিত্বের শরীরে কোমল কবোষ্ণ হাতে জাদুস্পর্শ বুলিয়ে দিত··· ···আমি আজ অবধি পুষ্পিত বসন্তের আনন্দ কী জানলাম না। আমি ক্ষুধার্ত কিন্তু আমার আকাঙ্ক্ষার তৃপ্তির জন্যে কিছু নেই, কিছু পেলাম না।···আমার জীবনের ছটি তীব্রতম ঐকান্তিক আকাঙ্ক্ষা—ভালবাসা পাওয়া আর বিখ্যাত হওয়া,— এ ছটোই আজ অবধি আমার কাছে সুদূর পরাহত।"

তেইশ বছর বয়স অবধি বালজাক প্রেম কী, প্রণয়ের জাদু স্পর্শ কাকে বলে জানতেন না। স্কুলে বন্দীশালার অনাথ ছেলের নির্মম শাসনে ভুগেছেন, বাড়িতে মায়ের অবহেলা পরিবারের তাচ্ছিল্য কুড়িয়েছেন। বিখ্যাত সাহিত্যিক হতে চেয়ে পয়সার জন্যে উঞ্ছবৃত্তি করছেন; কিন্তু যে বিশ্বাসের বর্তিকা হাতে নিয়ে এ নিবিড় অন্ধকার অতিক্রম করতে চেয়েছিলেন শুরুতেই যেন সে বর্তিকা নিভে গেল। তিনি এখন অন্ধকারে একটা অদৃশ্য বিন্দুকে বেষ্টন করে চক্রনেমির মতন পাক খাচ্ছেন। মুক্তি? কোথায় মুক্তি!······মুক্তির জন্যে অবারিত স্বাধীনতার জন্যে তিনি তখনও হাহাকার করছেন। কেননা তখনও তাঁর মধ্যে বিশ্বজয়ের শক্তি সুষুপ্ত। শৈশব কৈশোরের শাসন শাস্তি অবহেলা অত্যাচার তাঁর বিকাশোন্মুখ প্রতিভার ওপরে ভীরুতার এক ভারী আবরণ চাপিয়ে রেখেছে। তাঁর ভিতরকার বিসুভিয়সের শক্তি সম্পর্কে তখনও তিনি অচেতন। তাঁর আর একটা কারণও অবশ্য ছিল। সে কারণটি তাঁর অবয়ব।

"একটা অদকুচ্ছিৎ যুবক"—বালজাকের অবয়বের বর্ণনা দিতে গিয়ে কবি ভিনি শুরুই করেছেন ওই বলে। সে কুৎসিত চেহারা আরও কুৎসিত দেখাত শরীরের প্রতি তাঁর অবহেলার জন্যে, চেহারায় জৌলুস আনবার কোন চেষ্টা ছিল না তাঁর। তাই তাঁর মুখে সব সময় খোঁচা-খোঁচা দাড়ি থাকত, মাথায় থাকত উস্কখুস্ক চুল। খাটো বেঢপ মোটা মানুষটার শরীরের কোথাও ছাঁদ শ্রী ছিল না, পেশীবহুল শক্ত সমর্থ চেহারা সত্ত্বেও তাই নারীর আকাঙ্ক্ষা সহজে তার প্রতি আকৃষ্ট হত না। তাছাড়া তিনি নিজেও নিজেকে কুৎসিত মনে করতেন বলে মানুষের সাহচর্য এড়িয়ে চলতেন, এড়িয়ে চলার পেছনে বিখ্যাত না হওয়া পর্যন্ত নিজেকে নির্বাসিত রাখবেন এই প্রতিজ্ঞাও কাজ করত। কিন্তু তাতেও আটকাত না যদি তাঁর মধ্যে যৌবনের তাড়না থাকত। সাহিত্যিক হওয়ার প্রচণ্ড জেদ, কঠোর পরিশ্রম ও দারিদ্র্যের সঙ্গে নির্মম সংগ্রাম তাঁর যৌবনাগমকে অনেকদিন ঠেকিয়ে রেখেছিল। একটু দেরিতে হলেও যৌবনাবেগ ভিতরে ভিতরে তাঁর মধ্যে কাজ করছিল কিন্তু অনুক্ষণের ব্যস্ততার মধ্যে তার তাড়না তখনও তাঁর মধ্যে স্পষ্ট হয়ে ওঠেনি কিংবা রগরগে উপন্যাস লেখার মধ্যেই তা তৃপ্ত ছিল।

স্পষ্ট হয়ে উঠল অতৃপ্তি জাগল তেইশ বছরে পা দিয়ে। আর্থিক স্বচ্ছলতার মুখ দেখলেন, সংসারের অর্থনৈতিক-দাসত্ব থেকে মুক্তি মিলল তাঁর, নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারলেন। নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে মুক্ত স্বাধীন উন্নত শির তুলে তিনি যখন তাকালেন সব আগে চোখে পড়ল এক নারী—স্নেহ মমতা প্রেম প্রণয়ের

জাদুকরী স্পর্শের নায়িকা। মনে সেই প্রথম জাগল যৌবনের ক্ষুধা। বালজাকের চেহারা বেঢপ বিশ্রী হলে কী চোখ দুটি ছিল আশ্চর্য রমণীয়। তীক্ষ্ণধার সে চোখে বুদ্ধি ও প্রতিভার দীপ্তি সর্বদা চকমক করত। বালজাকের সেই উচ্চাভিলাষী সুদূরদর্শী চোখের দিকে তাকিয়ে অভিভূত না হয়ে উপায় ছিল না। সেই চোখ তুলে তেইশ বছরের যুবক বালজাক যখন নয়টি সন্তানের মা পঁয়তাল্লিশ বছরের নারী মাদাম বেরনির দিকে তাকালেন তখন তিনিও অভিভূত না হয়ে পারলেন না। নারীর দিকে সেই প্রথম দৃষ্টি নিক্ষেপ তাঁর এবং সেই প্রথম দৃষ্টিতেই জয়লাভ। সেই দৃষ্টি বিনিময়ের নিভৃত লগ্নেই বিশ্ববিখ্যাত সাহিত্যিক "অনরে দ্য বালজাকের" জন্মলাভ বলা যায়।

মাদাম বেরনির মমতাপ্লুত দৃষ্টির জাদু স্পর্শে বালজাকের নিদ্রিত প্রতিভার ঘুম ভেঙে গেল। বালজাক সেই প্রথম নিজেকে আবিষ্কার করে বিষম চমকে উঠলেন। সেই সদ্য উন্মেষিত প্রতিভার জ্যোতির্ময় চোখ মেলে তিনি যেদিন প্রথম অলৌকিক এক রমণী হৃদয়ে প্রেমের উদ্ভাস দেখলেন সেদিনই নতজানু হয়ে প্রেম ভিক্ষা করলেন। দুর্জয় সে ভিক্ষার দাবি। মাদাম বেরনি অস্বীকার করতে পারলেন না। সংসার স্বামী সন্তান সে-দাবির কাছে তুচ্ছ হয়ে গেল। প্রৌঢ় বয়সে ব্যভিচারিণীর কলঙ্ক মাথা পেতে নিয়ে তিনি বালজাকের হাতে হাত রাখলেন।

ঘটনাটা আকস্মিক অস্বাভাবিক বা অপ্রত্যাশিত নয়। আগুন বাতাস জলকে কখনো চেপে রাখা যায় না। ভিতরে ভিতরে শক্তি সংহত ও প্রবল হয়ে উঠলে এক সময়ে প্রচণ্ড বেগে সব চুরমার করে সে বেরিয়ে আসে। সাবধানে সংরক্ষিত কিছুই আর তখন আস্ত থাকে না।

তুর-এর ভিপারিজি ছিল অভিজাত পরিবার-অধ্যুষিত পল্লী। আর রাজদরবারের প্রাক্তন কাউনসিলর ও ভূতপূর্ব গভরনর ম সিয়ে গাব্রিয়েল দ্য বেরনি ছিলেন সেই অভিজাতদের মধ্যে বিশিষ্ট একজন। বালজাকদের প্রতিবেশী এ মাননীয় পরিবারটির সঙ্গে বালজাক-পরিবারের ঘনিষ্ঠতা অনেক দিনের। মাদাম বেরনির সঙ্গে শ্রীমতী বালজাকের বন্ধুত্ব ছিল। উভয়েই সমবয়সী ও উভয়ের স্বামীই তাদের দ্বিগুণেরও বেশী বয়সের বলে মনের মিলটা সমবেদনায় গাঢ় ছিল। তাকে গাঢ়তর করেছিল উভয় পরিবারের সমবয়সীরা। বালজাকের ছোট ভাই আঁরির লেখাপড়া ও খেলা-ধূলার সাথী ছিল সমবয়সী আলেকজাঁদের দ্য বেরনি। বালজাক

বাড়ি এসে বটতলার সাহিত্য রচনার ফাঁকে ফাঁকে আঁরিকে কখনো কখনো আবার পড়াতেন। সে সুবাদে তিনি আলেকজাঁদের-এরও প্রাইভেট টিউটর নিযুক্ত হলেন।

সেই থেকে বালজাকের মধ্যে অল্পে আস্তে একটা লক্ষণীয় পরিবর্তন ঘটতে থাকল। তিনি এখন বেশ-বাস বিন্যাসে মনোযোগী, পাউডার পমেডের প্রতি আসক্ত। সপ্তাহে দু তিন দিন পড়ানোর কথা অথচ তিনি সপ্তাহের সাত দিনই সেখানে যান এবং অবসরের সবটুকু সময় সেখানে কাটান। মা অলক্ষ্যে দেখেন আর মনে মনে হাসেন, খুশি হন। ছেলে নির্ঘাৎ প্রেমে পড়েছে। মাদাম বেরনির সুন্দরী কন্যা ইমানুয়েলকে ভালবাসবার সুযোগ পেলে যে কোন যুবক কৃতার্থ বোধ করবে; কিন্তু ইমানুয়েলের মতন মেয়ে যদি বালজাকের মতন ছেলেকে পছন্দ করে থাকে সে তার পরম ভাগ্য। মায়েরও গৌরব। কেননা এতে করে রাজপরিবারের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ এক অতি উচ্চ অভিজাত পরিবারের সঙ্গে তাদের পারিবারিক আত্মীয়তা ঘটবে। আর সে সূত্রে শুধু যে অভিজাত সমাজে অধিকতর প্রতিষ্ঠাই হবে তা নয়, পণ যৌতুক বাবদও ঘরে প্রচুর সম্পদ সম্পত্তি আসবে। সর্বোপরি ছেলের এই লেখালেখির উঞ্ছবৃত্তিও ঘুচবে, একটা লোভনীয় চাকরি জুটবে তার।

কিন্তু চিরকাল যেমন আজও তেমনি, বালজাককে মা ভুল বুঝলেন। এ কী কোন মা কল্পনা করতে পারে যে, ন'টি সন্তানের গর্ভধারিণী, তাঁর ছেলের প্রণয়িনী হবে! অথচ ঘটনা তা-ই জেনে ক্রোধে ক্ষোভে ও আশাভঙ্গে তিনি ক্ষেপে উঠলেন। কী পেয়েছে বালজাক এই বিগতযৌবনা নারীর মধ্যে! কী দিয়েছে এই নারী তাকে, কী দিতে পারে এই নারী, যা এমানুয়েলের মতন পূর্ণ যুবতীও দিতে পারে না?

যার প্রথম সন্তান বালজাকেরও বড়, যে ইতিমধ্যেই ঠানদিদি হয়েছে, পঁয়তাল্লিশ বছরের সে নারী তেইশ বছরের এক যুবকের প্রেমিকা, আশ্চর্য!

মা আশ্চর্য হবেন বই কি! "যুবতী মেয়েরা কেবল নিতে পারে, কেবল পেতে চায়, দিতে পারে না, দিতে চায় না কিছুই..." বালজাকের এ অভিজ্ঞতা তিনি পাবেন কোথা থেকে!..."বঞ্চিতা প্রৌঢ় রমণীর বুভুক্ষু নারীত্বের শেষ প্রেম প্রথম যৌবনের নবোন্মেষিত ভালবাসাকে যে কত গভীর ও আত্মবিস্মৃত তৃপ্তি দিতে পারে", তাঁর মায়ের মতন আত্মকেন্দ্রিক দাম্ভিক নারীর তা জানবার কথা নয়।

অতএব মা তাঁর মেয়েকে লিখলেন : "লোর্, যদি সম্ভব হত ত আমি এক্ষুনি ভিপারিজি ছেড়ে কয়েক যোজন দূরে চলে যেতাম। এ লজ্জা এ অপমান আমি সইতে পারছিনে।"

কিন্তু এ লজ্জা এ অপমান যে তাঁর নিজেরই পরাজয়ের লজ্জা ও অপমান তা অস্পষ্ট ছিল না। তিনি এতদিন ছেলেকে কঠিন শাসনের মধ্যে শৃঙ্খলিত রেখেছিলেন, তিনিই ছিলেন তার ভাগ্যের একমাত্র নিয়ামক, ছেলেকে পদানত রেখে তাকে তাঁর খেয়াল-খুশির ক্রীড়নক করে এতদিন তিনি তাঁর দাম্ভিক আত্মপ্রসাদে মগ্ন ছিলেন। নিজের কর্তৃত্বের সেই অমোঘ শক্তি আজ তাঁরই বয়সী এক নারী এসে একেবারে মিথ্যে করে দিল, তাঁর ছেলেকে কেড়ে নিয়ে গেল তাঁর বন্ধন থেকে, এ পরাজয়ের অপমান ও গ্লানি তাঁর কাছে অসহ্য হয়ে উঠেছিল। কলঙ্কের কথাটা ছোট্ট শহরের চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়তে বাকি থাকেনি। নিজের সেই শহরবিদিত পরাজয়ের অসম্মানে তিনি আরও পীড়িত অসুস্থ হয়ে উঠলেন, আত্মবিস্মৃত হয়ে গেলেন, বালজাককে তাড়িয়ে দিলেন বাড়ি থেকে।

পরাজিত পর্যুদস্ত চূর্ণ-অহমিকার ভগ্নস্তূপের মতন মায়ের আর্ত মুখের দিকে ভ্রূক্ষেপ মাত্র না করে বালজাক প্যারীতে চলে এলেন। এতকাল পরে বালজাক যেন প্রতিশোধ নিতে পারলেন। বালজাকের মতন সুখী আজ আর কেউ না। যা তিনি কোনদিন পাননি, মাতৃস্নেহ-কাঙাল হৃদয় তাই পেয়েছে আজ মাদাম বেরনির মধ্যে। উচ্চাভিলাষী দুরাকাঙ্ক্ষী বালজাকের স্বপ্নের প্রতি শ্রদ্ধা বিশ্বাস এমন করে আর কেউ দেখায়নি। তাঁর রচনাকে এমন আন্তরিক সহানুভূতির সঙ্গে কেউ সমালোচনা করেনি, সংশোধন করেনি, পরিমার্জন করে দেয়নি। তাঁর কাছে কেউ দেশের অতীত ইতিহাসকে এমন মনোহর গল্পের মতন পরিবেষণ করেনি। এমন করে কেউ তাঁকে বুকে টেনে নিয়ে তাঁর ক্ষতলাঞ্ছিত হৃদয়কে মৃতসঞ্জীবনী ধারায় স্নান করায়নি।

সত্য বটে মাদাম বেরনি একদা-পদস্খলিতা নারী। স্বামীর বয়সের অর্ধেকেরও কম বয়স তাঁর। প্রথম যৌবনে বৃদ্ধ স্বামীর প্রতি বিদ্বেষে মুখ ফিরিয়ে তিনি কিছু দিনের জন্যে এক অখ্যাত যুবকের কাছে আত্মসমর্পণ করেছিলেন। কতিপয় বছর পরে আর একবার তাঁর পদস্খলন ঘটেছিল। তাঁর ন'টি সন্তানের শেষের দুই সন্তান পর-পুরুষের ঔরসজাত। কিন্তু সেও প্রায় দু'দশক আগেকার কথা। তারপর থেকে মাদাম বেরনি স্বামীপরায়ণা নিষ্ঠাবতী গৃহিণী। সেই পরিশুদ্ধ গৃহিণী-জীবনের অম্লান পরিবেশের মধ্যে তাঁর সন্তানের মতন এসে বালজাক তাঁর মায়ের স্নেহ দাবি

করেছিলেন। মাতৃরসাপ্লুত মন শ্রীমতী বেরনি মায়ের মন নিয়েই সে দাবিতে সাড়া দিয়েছিলেন।

মাতৃস্নেহ-বঞ্চিত ছেলেকে মমতার সান্ত্বনায় স্নিগ্ধ করতে গিয়ে তিনি তাঁর প্রথম যৌবনের দুর্জয় ক্ষুধাকে জাগিয়ে দিচ্ছেন এ তিনি প্রথম ভাবতেই পারেন নি। কিন্তু তাঁর কোমল কবোষ্ণ স্পর্শে সে অনপনেয় ক্ষুধা জেগে উঠেছে দেখে তিনি দারুণ চমকে উঠেছেন, ভীষণ ভীত হয়েছেন। আঘাত না দিয়ে প্রাণপণে তাঁকে দূরে ঠেলে রাখতে চেয়েছেন, পারেননি, অবশেষে ঘরে তিনটি যুবতী কন্যা থাকা সত্ত্বেও অনন্যসাধারণ প্রতিভার দুর্বিনীত দাবির কাছে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হয়েছেন। প্রায়ান্ধ বৃদ্ধ পিতার প্রতি মায়ের এই বিশ্বাসঘাতকতাকে সন্তানেরা অমার্জনীয় অপরাধ বলে ধিক্কার দিয়েছে, তিনি অবনত মস্তকে তা সহ্য করেছেন তবু বালজাককে তিনি দূরে ঠেলে দিতে পারেন নি।

শ্রীমতী বেরনির সেদিনের সেই অসামান্য ত্যাগের ফলশ্রুতি পরবর্তিকালের বিশ্ববিখ্যাত সাহিত্যিক বালজাক। সেদিন যদি হতাশ্বাস নিরবলম্ব বালজাক মাদাম বেরনির কাছে এ প্রেরণা ও প্রশ্রয় না পেতেন, তিনি যদি সেদিন একাধারে তাঁর মাতা প্রণয়িনী ও প্রেরণাদাত্রী না হয়ে উঠতেন ত পৃথিবী নিঃসন্দেহে এক অলোকসামান্য প্রতিভার সৃষ্টি থেকে বঞ্চিত থাকত। এ বুঝি নিয়তিরই অলক্ষ্য বিধান, প্রতিকূল প্রতিবন্ধকতার দুর্লঙ্ঘ্য প্রাচীর পার করে দিয়ে মাদাম বেরনি বালজাককে আলোকিত জীবনের সিংহদ্বারে এনে দাঁড় করিয়ে দেবেন। এবং দিলেন বলেই, এখান থেকে বালজাকের জীবনের আর এক অধ্যায়ের, এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা হল।

তিন

এতদিনে বালজাক যেন পিঞ্জরমুক্ত হলেন। ভালবাসার নির্মল আকাশে উজ্জ্বল রৌদ্রে ডানা মেলে দিতে পারলেন তিনি। পেছনে পড়ে থাকল চূর্ণ অহমিকার ভগ্নস্তূপের মতন মা আর অলস ব্রণেচ্ছু মানুষের কানাকানিতে কলুষিত অভিজাত শহর ভিপারিজি। পারীতে যেন তিনি উড়ে এলেন।

১৮২৪ সালের শীতের সন্ধ্যা সেদিন। তাঁর সদ্যসমাপ্ত উপন্যাস 'ভান ক্লোর'এর পাণ্ডুলিপি হাতে তিনি এসে ঢুকলেন ৩০ নম্বর প্লাস সেঁ আঁদ্রে দে আর্স-এ। প্রকাশক য়ুর্বাঁ কানেল-এর সামনে বালজাককে মুখোমুখি বসতে দেখে তাঁর বিরূপ নিয়তির ঠোঁটে বুঝি তির্যক হাসি ফুটল।

না। মঁসিয়ে কানেল তাঁর পাণ্ডুলিপি ফিরিয়ে দেন নি। তিনি বেশ ভাল করেই জানতেন খুন জখম প্রেম ষড়যন্ত্রের রগরগে লেখক ওরেস দ্য সেঁ ওব্যাঁ ছদ্মনামে বালজাক ফ্রান্সের সাধারণ মানুষের চোখের মণি প্রাণের প্রিয়। তিনি পাণ্ডুলিপিটি হাতে পেয়ে তক্ষুনি সযত্নে দেরাজে তুলে রাখলেন ও কথায় কথায় তাঁর নতুন ব্যবসায়ের এক পরিকল্পনার প্রসঙ্গ তুললেন।

"ফরাসী ক্লাসিক সাহিত্যের চাহিদা হালে প্রচণ্ড বেড়েছে। অভিজাত গৃহস্থের ঘরে রাখার মতন ভাল কাগজে ঝকঝকে ছাপা ও সুন্দর বাঁধাইয়ের মনোজ্ঞ সংকলন যদি বের করা যায় হট্ কেকের মতন বিকোবে ; কিন্তু মুশকিল হয়েছে ক্যাপিটেলের। অনেক টাকা চাই। যদি অংশীদার পেতাম, এক্ষুনি নেমে যেতাম। লাফোতাঁ্যা-র সংকলন তৈরি আছে আমার হাতে, মলিয়ের তৈরি হচ্ছে। ঝানু ব্যবসায়ী মঁসিয়ে কানেল সোনার খনির ছবি আঁকলেন বালজাকের মনে।

সব শুনে বালজাক সেইখানে তক্ষুনি দ্বিতীয় বার না ভেবে সোৎসাহে বলে বসলেন, "লেগে যাই আসুন, আমিই আপনার পার্টনার হব।"

নিয়তির তির্যক হাসি নিঃশব্দে এবার যেন ঠোঁট ছাপিয়ে সারা মুখে ছড়িয়ে পড়ল। কেন না, কিছু মাত্র কারণ ছিল না এমন এক অনিশ্চিত ভাগ্যের খেলায় হঠাৎ তাঁর ঝাঁপিয়ে পড়ার। দিব্যি ছিলেন বালজাক। মাসে কয়েক বাণ্ডিল পাখের কলম আর কয়েক রিম সাদা কাগজ খরচ করে বালজাক বটতলার নভেল লিখে আশাতিরিক্ত টাকা পিটছিলেন, বছরে বেশ কয়েক হাজার ফ্রাঁ আয় হচ্ছিল তাঁর।

কিন্তু উচ্চাভিলাষী স্বপ্নবিলাসী বালজাকের তাতে তৃপ্তি ছিল না। একজন অভিজাত মহিলার প্রেমিকের জীবন উঞ্ছবৃত্তি করে কাটবে তার চেয়ে অসম্মানের লজ্জার কী আছে! তিনি সম্পদে মর্যাদায় মাদাম দ্য বেরনির যোগ্য হয়ে উঠতে চাইলেন। যোগ্য হয়ে ওঠার জন্যে কোন উপায়কেই তিনি অযোগ্য মনে করতেন না। অথবা তাঁর ভিতরকার দুর্বার প্রাণশক্তিই ক্রমাগত বাধার দেওয়াল ভেঙে বেরিয়ে আসতে চাইছিল, স্ব-মহিমায় আত্মপ্রতিষ্ঠ হতে অস্থির হয়ে উঠেছিল। ফলত তাঁর কাছে কোন কাজই অযোগ্য বিবেচিত হয় নি—লোহা কাঠ ফাটকা দালালি ব্রোকারি বইয়ের ব্যবসা, প্রেস কি টাইপ ফাউনড্রি সব কিছুই তাঁর কাছে সমান আকর্ষণীয় ছিল। তার চাই টাকা, সে যে পথে আসুক। তাঁর চাই সম্মান প্রতিপত্তি, সে যে কোন উপায়ে হোক। সাহিত্যই করতে হবে এমন কোন মাথার দিব্যি নেই, তাই অনায়াসে সাহিত্য ছেড়ে বইয়ের ব্যবসায় ঝাঁপ দিতে পারলেন বালজাক। কিন্তু কোন কাজে নামতে গেলে যে অভিজ্ঞতা দরকার, তাঁর বাধা অসুবিধা ক্ষয় ক্ষতির দিকগুলি চিন্তা করা দরকার, সে কথা ভাববার প্রয়োজন তিনি মনে করতেন না। উৎসাহে দপ্ করে জলে উঠে দৃকপাত না করে লাফিয়ে পড়তেন। এই অপরিণামদর্শী উচ্চাকাঙ্ক্ষাই হল কাল!

১৮২৫ সালের এপ্রিলে চুক্তিপত্র স্বাক্ষরিত হল। অত্যন্ত নিরীহ চুক্তি। পনরশ' ফ্রাঁ দিয়ে দিলেই নিশ্চিন্ত বালজাক, খাটাখাটুনি আর যা কিছু করবেন মঁসিয়ে কানেল ও আর দু'জন অংশীদার। কী করে যে আরও দু'জন অংশীদার জুটেছিল ঈশ্বর জানেন অথবা মঁসিয়ে কানেলের সোনার খনির স্বপ্ন দেখানোর কৌশলে কিনা কে জানে—তাঁরা একজন হলেন ডাক্তার আর একজন রিটায়ার্ড অফিসার। কী ঘটেছিল বালজাকের অজ্ঞাত চুক্তির কয়েক দিন পরেই ডাক্তার ব্যবসা থেকে নিজের নাম খারিজ করে নিলেন, শুনে রিটায়ার্ড অফিসারটিও আর থাকতে চাইলেন না। বালজাকের পনরশ' ফ্রাঁ নিয়ে ভাগের কারবারে নামতে দ্বিধা ছিল মঁসিয়ে কানেলের। তিনিও হাত গুটালেন। এ দিকে বালজাকের তখন জেদ চেপে গেছে। একবার কোন কাজে মনস্থির করে ফেললে সে কাজ না করে কোন দিনই স্থির থাকতে পারেন নি বালজাক। এবারও তাই হল। প্রাণান্ত পরিশ্রম করে যে ক'টা টাকা জমিয়ে ছিলেন নিয়ে নেমে পড়লেন পাবলিশিং বিজনেসে। বেপরোয়া এই তরুণের দুঃসাহসী যাত্রার সেই কণ্টকাকীর্ণ পথ কিছুটা মসৃণ করতে একটা মোটা অঙ্কের অর্থ জোগালেন মাদাম বেরনি।

অভিজাত সমাজে উন্নীত হবার বরাবরের লোভ এবার অভিজাত প্রকাশকের

ভূমিকায় সূচিত হতে চলেছে। তারই উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করলেন বালজাক। একটা অফিস ঘর ভাড়া নিলেন। চেয়ার টেবিল আলমারি সেলফ-এ অফিস ঝকঝকে করে তুলতে অনেক অর্থ ব্যয় হয়ে গেল। ফলে যে জন্যে এত আয়োজন সেই লাফোর্ত্যাঁ-র সব রচনা ঠাসতে হল এক ভল্যুমের মধ্যে। তার ওপরে আবার তিনি কাগজ চেনেন না, প্রেসের ব্যাপার বোঝেন না। সুতরাং গুদামে পড়ে থাকা লাট কাগজ সরবরাহ করল কাগজঅলা, প্রেসঅলা ক্ষুদে ক্ষুদে রদ্দি টাইপে ছেপে দিল বই। আর বালজাক বইয়ের যে ভূমিকা লিখলেন তাও হল সমান নীরস। এহেন সংস্করণের দাম করলেন তিনি আবার কুড়ি ফ্রাঁ। এত দাম দিয়ে এ বই কিনবে কে! বইয়ের কারবারীরা বই ঘরে তুলে টাকা আটকে রাখতে রাজি হল না।

বালজাক ভাবলেন প্রচার প্রয়োজন। কিন্তু একখানা বই নিয়ে প্রচার চালানোয় খরচা বেশী, ঝামেলা অনেক। দু'খানা বই হলে ওটা পুষিয়ে যাবে। যেই ভাবা অমনি কাজ। বালজাকের উদ্দীপনার তাপে অভিভূত হয়ে তাঁদের পরিবারের এক বন্ধু পাঁচ হাজার ফ্রাঁ দাদন দিলেন। ঝকঝকে অফিস আর প্রডাকশন সম্পর্কে উচ্চাশা প্রচার করে ধার জোগাড় করে ফেললেন আরও দশ হাজার। মলিয়ের প্রেসে গেল। আর একবার কাগজঅলা প্রেসঅলা আর দপ্তরির কাছে ঠকলেন, এ বইয়েরও দাম পড়ল কুড়ি ফ্রাঁ। প্রচারে বেশ খরচও করলেন কিন্তু মলিয়েরের ভাগ্যে লাফোর্ত্যাঁ-র থেকে ব্যতিক্রম কিছু ঘটল না। বই চলল না বাজারে। কুড়ি ফ্রাঁর বইয়ের দাম ধাপে ধাপে নামিয়ে দশ ফ্রাঁ করলেন, তবু না। খদ্দের লুব্ধ হল না। বই দপ্তরির বাড়িতে পড়ে পড়ে নষ্ট হতে থাকল।

বছর ঘুরতে চলল তবু যখন বইয়ের কোন হিল্লে হল না তখন তাঁর মাথায় আর এক খেয়াল চাপল। তিনি প্রেস কিনবেন। কেমন করে তাঁর মাথায় ঢুকেছিল বই-ব্যবসার লাভের সর সবটাই গিয়ে ওঠে প্রেস-মালিকের ঘরে অতএব বইয়ের ফলাও ব্যবসা করতে হলে আগে প্রেস চাই। ইতিমধ্যেই ঋণের বোঝা বিশ হাজার তবু বালজাক পরম উৎসাহে প্রেস খুঁজতে লাগলেন। খুব শস্তায় পেয়েও গেলেন পুরোনো একটা। শস্তা মানে ষাট হাজার ফ্রাঁ। কয়েকটা মেশিন আর ক্ষয়ে যাওয়া কিছু টাইপ নিয়ে টিমটিম করে চলছিল প্রেস। বালজাকের ধারণা নতুন করে টাকা ঢালতে পারলে ব্যবসা রবরবে হতে বেশী দিন লাগবে না। তিনি ছুটে এলেন বাড়িতে, বাবার সামনেও নিজের সে উজ্জ্বল আশার চিত্র তুলে ধরলেন, বললেন, বাবা প্রেস- ব্যবসার মতন ব্যবসা নেই দুনিয়াতে। সভ্যসমাজ যত দিন আছে, প্রেস-ব্যবসা ততদিন থাকবে। ক্রমাগত উন্নতি হতে থাকবে তার।

—"না বাবা তোমাকে এক পয়সা দিয়েও আমি বিশ্বাস করিনে।" মাথা নাড়লেন তিনি। মা মুখ ফিরিয়ে ছিলেন। মুখ ফিরিয়েই থাকলেন। অবশ্য মনে মনে আশ্বস্ত হলেন ছেলের শুভ বুদ্ধি হয়েছে, ছাই পাশ লেখা ছেড়ে ব্যবসার দিকে ঝুঁকেছে, মন্দের ভাল, এবার হয়ত কিছু উন্নতি হবে।

বালজাক বাবার মুখের দিকে মুহূর্ত তাকিয়ে থেকে বললেন—"তোমাকে টাকা দিতে হবে না বাবা, তুমি শুধু গ্যারানটার হবে। একজন ভাল গ্যারানটার না থাকলে গভর্নমেন্ট প্রেস ডিক্লারেশন দিতে চাইছে না।"

অতএব এক পারিবারিক বৈঠক বসল। বালজাক ভাষার ফুলঝুরি দিয়ে ব্যবসার এক উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ আঁকলেন সকলের সামনে। তখন বাপ শুধু গ্যারানটার নন কিছু নগদ অর্থ দিতেও রাজি হলেন। তাঁদের পারিবারের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ মাদাম ভেলানোয়ে-ও এই উদ্যোগী তরুণকে উৎসাহ যোগাতে ওয়াকিং ক্যাপিটেল হিসেবে দিলেন ক্যাস তিরিশ হাজার ফ্রাঁ, অবশিষ্ট টাকা এল মাদাম বেরনির কাছ থেকে।

ম্যানেজার থেকে সুইপার চব্বিশ জন কর্মচারী নিয়ে বালজাক নামলেন ছাপাখানার ব্যবসায়। কাজপাগলা মানুষ কালিঝুল মেখে দিন রাত খেটে চলেছেন অথচ ছাপা হয় কী, না, প্যাম্পলেট, প্রসপেকটাস, হাণ্ডবিল, সভাপতির ভাষণ। বটতলার বই দু একখানা কদাচিত যদি বা আসে অভিজাত প্রকাশকের কাছ থেকে বই পাওয়া যায় না একখানাও। বাজে টাইপ বাজে মেশিন—ছাপার নমুনা দেখে মনঃপূত হয় না তাঁদের। তবু বালজাকের ক্লান্তি নেই, হতাশা নেই, নতুন টাইপ কিনছেন, মেশিনের পার্টস পাল্টাচ্ছেন।

হাতে কালি মুখে কালি উস্কখুস্ক বেঢপ ঘর্মাক্ত মানুষটিকে দেখে সে দিন কেউ ভাবতেই পারেনি, তিনিই একদা তাদের কালের শ্রেষ্ঠ লেখকের শিরোপা পাবেন।

সেদিন বোকা মানুষটাকে কেবল ঠকাত সবাই। কর্মচারী ম্যানেজার থেকে টাইপ ফাউনড্রি পেপার মার্চেন্ট, সকলেই যেন বোকা ঠকানোর মওকা পেয়ে গেছে। ফলে অতিদ্রুত ওয়াকিং ক্যাপিটেল খরচ হয়ে যাচ্ছিল। তখন অনন্যোপায় হয়ে কুড়ি ফ্রাঁ দামের বই লাফোতঁ্যা আর মলিয়েরের দু হাজার পাঁচশ' কপি, যা দপ্তরি বাড়ি পড়ে পড়ে নষ্ট হচ্ছিল, সাড়ে আট ফ্রা দরে সব ঝেড়ে দিলেন। মোট বাইশ হাজার ফ্রাঁ দাম হল। কিন্তু এখানেও সেই ঠগের পাল্লা। যে কিনল সে তাঁকে নগদ দিলে মাত্র পাঁচ হাজার ফ্রাঁ, বাকি অর্থের বাবদ দু'জন বুকসেলারের নামে দু'খানা ড্রাফ্‌ট্‌ দিলে। ড্রাফট দু'টো ভাঙাতে গিয়ে বালজাক দেখেন যাদের নামে ড্রাফট তারা ইতিমধ্যেই দেউলিয়া খাতায় নাম লিখিয়ে বসে আছে।

এদিকে টাইপ ফাউনড্রির দেনা পেপার মার্চেণ্টের দেনা সর্বোপরি চব্বিশ জন কর্মচারীর মাইনে যোগানোর দায়। অসহায় বালজাক এবার গা ঢাকা দিলেন। সপ্তাহে এক দিন দুদিন প্রেসে আসেন কি তাও না, উদ্‌ভ্রান্তের মতন পাওনাদারের দোরে দোরে ঘোরেন—দয়া করে আমাকে একটু সময় দিন। কিন্তু কেউ সময় দিতে চায় না। তারা তাঁকে জেল খাটাতে চায়। অথৈ জলে পড়ে নাকটাকে কোন মতে জলের ওপরে রাখবার সেই প্রাণান্ত চেষ্টার দিনগুলিতে যে অপমান লাঞ্ছনা ও মানসিক যন্ত্রণার অভিজ্ঞতা তাঁর হয়েছিল তা অমর হয়ে আছে তাঁর 'সেজার বিরোতো', নামক বিখ্যাত উপন্যাসে।

তিনি অসুরের মতন অমানুষিক খাটুনি খেটে, হাঁটাহাঁটি, পায় ধরাধরি করেও আর ছাপাখানাকে বাঁচাতে পারলেন না। ১৮২৭-এর গ্রীষ্মের একদিন ঋণের দায়ে ছাপাখানা জলের দরে বিকিয়ে গেল। বালজাক কপর্দকহীন রাস্তার ভিখিরী, তবু দুরাশার স্বপ্ন তাঁর সঙ্গ ছাড়ে না। প্রকাশকের কারবার যখন ডুবতে বসেছিল তিনি ছাপাখানার ব্যবসা ধরে ভাসতে চেয়েছিলেন। সে ব্যবসারও যখন ভরাডুবি হল তিনি হাত দিলেন টাইপ ফাউনড্রির ব্যবসাতে। বইয়ের কারবার চালাতে হলে প্রেস চাই, প্রেস চালাতে টাইপ। অতএব টাইপ ফাউনড্রির ব্যবসার ভাগ্য নিঃসন্দেহে উজ্জ্বল। বালজাক তাঁর প্রেস বাঁচাতে যখন চারদিকে হন্যে হয়ে ঘুরছিলেন তখন এই টাইপ ফাউনড্রি ব্যাপারটার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে আসেন। সেই থেকে তাঁর মাথায় নতুন নতুন টাইপের ডাইস ম্যাট্রিক্স-এর পরিকল্পনা ঘুরছিল। চার জন অংশীদার নিয়ে সে পরিকল্পনা এক যৌথকারবারের রূপ নিল ১৮২৭ সালের সেপ্টেম্বরে। বালজাক দায়িত্ব নিলেন প্রচার ও বিজ্ঞাপন বিভাগের। নতুন ব্যবসায়ের অসামান্য সম্ভাবনায় উদ্দীপ্ত হয়ে বিবিধ প্রকারের টাইপের সুদৃশ্য নমুনা-পুস্তক ছেপে ব্যাপক বিলি বিজ্ঞাপন শুরু করেছেন তখন হঠাৎ একজন অংশীদার নাম খারিজ করতে চাইলেন। জাহাজ বন্দর ছাড়ার আগেই ডুবি হওয়ার আশঙ্কা দেখা দিল। সে বিপদে আর একবার হাত বাড়ালেন মাদাম বেরনি। তিনি আঁদ্রে কারবেয়ারের অংশটা কিনে নিলেন, জাহাজ সমুদ্র পাড়ি দেওয়ার রসদ পেল আবার। কিন্তু ততক্ষণে সর্বনাশ যা হবার হয়ে গেছে। মূল্যবান কাগজে মনোরম সব টাইপের নমুনা দেখে যে সব কোমপানী ও ছাপাখানা টাইপের অর্ডার দিয়েছিলেন প্রেস লাইনে অভিজ্ঞ আঁদ্রে কারবেয়ার কোম্পানীতে আর নেই শুনে আতঙ্কিত হলেন। কোম্পানীর ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত ভেবে তাঁরা এক মাসের মধ্যে তাঁদের টাইপ অথবা দাদনের সব টাকা দাবি

করে বসলেন। এত অল্প সময়ে টাইপ সরবরাহ করা অসম্ভব, টাকা ফেরত দেওয়া আরও কঠিন। টাকা ইতিমধ্যে নানা খাতে ব্যয় করা হয়ে গেছে। বালজাক আবার দোরে দোরে ঘুরতে লাগলেন—আপনারা একটু সবুর করুন ফাউনড্রির প্রডাকশন শুরু হতে কয়েক মাস দেরি হবে।

কিন্তু কেউ বালজাককে বিশ্বাস করে না। বিশ্বাস করে না বালজাকের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট অংশীদারদেরও। কারবারে কারবেয়ার না থাকাটাই প্রচণ্ড সংকট হয়ে দেখা দিয়েছিল। ফলে সাত মাসের মধ্যে দারুণ সম্ভাবনার যৌথ কারবার দেউলিয়া খাতায় নাম লেখাতে বাধ্য হল।

বালজাকের মাথায় চাপল এক লক্ষ ফ্রাঁ ঋণের বোঝা। তিনি কয়েকটা পাখের কলম কয়েক দিস্তা কাগজ নিয়ে পারী শহর জয় করতে এসেছিলেন, প্রতিষ্ঠায় প্রতিপত্তিতে শালবৃক্ষের মতন প্রাংশু, ঋজু, সবাইকে ছাড়িয়ে উন্নতশির, পরম গৌরবের সামগ্রী হতে চেয়েছিলেন। নিষ্ঠুর নিয়তি কিংবা তাঁর অপরিণামদর্শী উচ্চাভিলাষ তাঁর সে স্বপ্ন গুঁড়িয়ে দিয়ে তাঁকে পারীর ধুলায় লুটিয়ে দিলে। দশটা বছরের কঠোর শ্রম মিথ্যা হয়ে গেল। তিনি পলাতক আসামীর মতন পাওনাদারের শ্যেন দৃষ্টি এড়িয়ে অন্ধকারে ঘুরে বেড়ান। মাথা গুঁজবেন—আশ্রয় নেই, খাবেন—এক কপর্দক নেই, বসে যে কিছু লিখবেন সে মানসিক অবস্থা নেই। অন্ধকার ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়ে ব্যাকুল বালজাক বোনকে লিখলেন: "বালজাকের নামে পারী শহর শিউরে ওঠে, কেউ আমাকে আর ঘর ভাড়া দিতে চায় না, চাইলেও নেবার জো নেই, ভাড়া নিলেই পুলিশের খাতায় নাম লেখাতে হয়, সেখান থেকে পাওনাদার ঠিকানা জেনে নিয়ে ছুটে এসে আমার টুটি টিপে ধরবে। আমি এভাবে ইঁদুরের মতন মরতে চাইনে। আমি তোমার কাছে টাকাও চাইনে। তুমি শুধু আমার একটি উপকার কর, তোমার স্বামীর নামে ঘর ভাড়া করবার অনুমতি চেয়ে দাও আমাকে।"

সত্যি ইঁদুরের মতন মরতে পারেন না বালজাকের মতন বজ্রকঠিন সংকল্পের মানুষ। এক লক্ষ ফ্রাঁ ঋণের বোঝা নিঃসন্দেহে ভারী। কিন্তু বাস্তব পৃথিবীর নিষ্ঠুর বিরুদ্ধশক্তির সঙ্গে নির্মম সংগ্রামের তিনটা বছরে তিনি জগৎ ও জীবন সম্পর্কে যে জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা আহরণ করেছেন তার দাম লক্ষ ফ্রাঁর অনেক অনেক বেশী। সে তুলনায় লক্ষ ফ্রাঁ যে কত তুচ্ছ আজকের পৃথিবীর সাহিত্য-রসিক মানুষ সবাই তা শ্রদ্ধার সঙ্গে নত শিরে স্বীকার করেন।

তিনটা বছরের প্রাণান্ত সংগ্রামের মধ্যে সংসারে অর্থের যে কী তাৎপর্য তা

হাড়ে হাড়ে টের পেয়েছিলেন তিনি। শ্রমিকের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করতে গিয়ে, পাওনাদারের সঙ্গে বোঝাপড়া করতে বসে, বেচা কেনা উপলক্ষে বিভিন্ন ব্যবসায়ীর সাহচর্যে এসে সর্বোপরি পরিণত বয়সের নারীর অকৃত্রিম ভালবাসা পেয়ে তিনি সমাজ ব্যবস্থা, অর্থনীতি ও মনস্তত্ত্ব সম্পর্কে যে গভীর বাস্তব জ্ঞান অর্জন করেছিলেন তা তাঁর সমকালীন কোন লেখকের ছিল না। তদানীন্তন বিখ্যাত লেখক ভিকতর য়ুগো, লামার্তিন কি আলফ্রেদ দ্য মুসে সকলেই অভিজাত জীবন ও সে জীবনের ঐশ্বর্য ও রোমাঞ্চের দিকটাকেই তুলে ধরতে তাঁদের শিল্পশৈলীকে নিযুক্ত রেখেছিলেন। তা ছাড়া তাঁদের উপায়ও ছিল না। অভিজাত বংশের এই সব সাহিত্যরথীরা কখনো জীবনের আর কোন দিক দেখেন নি, দেখলেও তা নিয়ে যে কিছু লেখা যায়, তা যে সাহিত্যের উপজীব্য হতে পারে তা তাঁরা কল্পনা করতে পারেন নি। কিন্তু বালজাক পেরেছিলেন। তিনি বঞ্চিত পর্যুদস্ত হতভাগ্য মানুষের কষ্ট, লাঞ্ছনা ও অসম্মান এমন ঘনিষ্ঠভাবে নিজের দুঃসহ দুঃখ যন্ত্রণার সঙ্গে মিলিয়ে মিশিয়ে দেখেছিলেন যে, তাদের কথা ছাড়া আর কারো কথা তাঁর সাহিত্যের বিষয় হতে পারে, হবে, বলে তিনি ভাবতেই পারেন নি।

দারিদ্র্যের মধ্যে যে চিরন্তন নিষ্ঠুরতা, অসহায় জীবনের মধ্যে যে অনপনেয় লজ্জা তাঁর মতন করে বুঝি তাঁর যুগে, না, কোন যুগেই কেউ দেখে নি। কেউ দেখে নি কী দুর্জয় প্রাণশক্তি মানুষের ছোট্ট বুকটির খাঁচার মধ্যে আত্মপ্রকাশের আকুল আকুতিতে মাথা কোটে, ডানা ঝাপটায়।

নিয়তিই যেন এক নির্দিষ্ট কাজের যোগ্য পাত্র করে গড়ে তুলতে যন্ত্রণার আগুনে পুড়িয়ে দুঃখের নেহাইয়ে রেখে তাঁকে বিড়ম্বনার হাতুড়ি পেটা করছিল। তিন বছরের নির্মম অভিজ্ঞতা তাঁর মন থেকে কল্পনার সব স্বপ্ন ধুয়ে মুছে সাফ করে দিয়েছিল। তাঁর দৃষ্টিকে বাস্তবনিষ্ঠ স্বচ্ছ ও উজ্জ্বল করে তুলেছিল। সেই স্বচ্ছ উজ্জ্বল তীক্ষ্ণ চোখে তিনি দেখেছেন পাওনাদার অসহায় ঋণগ্রস্তকে কী কঠিন জালে আটকে তিলে তিলে তার রক্ত শুষে হত্যা করে। কঞ্জুস নিজেকে বঞ্চিত করে কী ভাবে অর্থ সঞ্চয় করে। উড়নচণ্ডী আখেরের কথা না ভেবে কী ভাবে সব অর্থ উজাড় করে দেয়। প্রতারকের হাতে কী ভাবে সর্বস্বান্ত হয় সরল মানুষ। অন্তঃসারশূন্য বিলাসী সমাজের নারী একঘেয়ে জীবনের অভিশাপ থেকে মুক্তি পেতে কী ভাবে পরপুরুষাসক্ত হয়। এক কথায় বালজাক অভিজাত সমাজ থেকে বস্তির নোংরা মানুষ পর্যন্ত সমাজের সব স্তরের সকলকে অত্যন্ত আপন করে দেখেছিলেন। তাঁর অন্তর্ভেদী পরিচ্ছন্ন দৃষ্টির কাছে তাঁর যুগ অনাবৃত হয়ে ধরা পড়েছিল। তারই

বিশ্বস্ত আলেখ্য আমরা দেখতে পাই তাঁর অমর রচনা 'লেজিল্যুজিওঁ পেরদ্যু', 'লা পো দ্য শাগ্র্যাঁ', 'লুই লঁাব্যের', 'সেজার বিরোতে' প্রভৃতি উপন্যাসে।

কিন্তু ওই সব অনেক পরের কথা। ওই সব সৃষ্টির কল্পনা তখনও তাঁর মাথায় আসেনি। ওই সব মহৎ রচনা কখনো তাঁর দ্বারা সম্ভব হবে তাই তিনি তখনো জানতেন না। তখনও তিনি পারীর শড়কে ধুলিধূসর। ক্ষুধার্ত অসহায় অবসন্ন ফেরারী মানুষটির তখন অন্য চিন্তা—অন্নচিন্তা। আসলে একটা আশ্রয়ের চিন্তাই তাঁর সমস্ত অস্তিত্ব আচ্ছন্ন করে আছে তখন। অবশ্য পারী ছেড়ে চলে গেলে, পরাজয় স্বীকার করে নত মস্তকে মায়ের কাছে আশ্রয় চাইলে এত কষ্ট সইতে হত না তাঁর। কিন্তু না, তা কখনো হবার নয়। তিনি ধ্বংস হয়ে যাবেন তবু পরাজয় মানবেন না। যে মাটিতে মানুষ আছাড় খায় সে মাটিতে ভর করেই আবার সে মানুষ খাড়া হয়ে দাঁড়ায়। বালজাকেরও সেই প্রতিজ্ঞা। যে পারী শহর তাকে রাস্তার ধূলায় নস্যাৎ করে দিয়েছে সেই পারী শহরকেই তিনি পদানত করে তার বুকে বুক ফুলিয়ে দাঁড়াবেন। তা ছাড়া দিনান্তে একটি বারও যদি তিনি মাদাম বেরনিকে না দেখতে পান ত বাঁচবেন তিনি কোন্ প্রেরণায়। অতএব কষ্ট যতই কঠোর হোক তাঁর পক্ষে পারী পরিত্যাগ অসম্ভব।

চার

সেই নিদারুণ বিড়ম্বিত দুদিনে হঠাৎ একটি আশ্রয় মিলল বালজাকের। আঁরি দ্য লেতুশ বালজাককে এনে তাঁর বাড়িতে আশ্রয় দিলেন। এই ধনী মানুষটি সাহিত্য সৃষ্টি করতে পারতেন না কিন্তু সৃষ্ট সাহিত্যের ভালমন্দ বুঝবার মাথাটি ছিল অত্যন্ত সাফ। অখ্যাত লেখকদের মধ্যে প্রতিভা খুঁজে বেড়ানো ছিল তাঁর অন্যতম খেয়ালের পেশা। সে খেয়ালের পেশা থেকে তাঁর কিছু বাণিজ্যিক সাফল্যও ছিল। ইতিমধ্যেই তিনি কিছু বিগত লেখককে অন্ধকার দেরাজ আলমারির ধুলো থেকে উদ্ধার করে এনে জনপ্রিয়তার আসনে বসিয়ে দিয়েছিলেন। সেই সূত্রেই তাঁর সঙ্গে বালজাকের পরিচয়। নানা পত্র পত্রিকায় কিছু রচনা এবং দুঃসাহস ও অপরিণাম-দর্শিতার কিছু খবর পড়ে তিনি বালজাক সম্পর্কে কৌতূহলী হয়েছিলেন। সেই কৌতূহলের বশেই উনত্রিশ বছরের অদূরদর্শী ফেরারী যুবক, যে বড় হওয়ার জন্যে পাগল অথচ প্রতিভার এতটুকু স্ফুলিঙ্গ আছে এমন এক লাইন লেখা

তখনও পর্যন্ত লেখেননি তাকেই খুঁজে পেতে ধরে এনে আশ্রয় দিলেন নিজের বাড়িতে।

"—থাক, খাও, আর ব্যবসা করার পাগলামো ছেড়ে মনযোগ দিয়ে লেখ।" তাঁকে লোকচক্ষুর আড়াল দিলেন তিনি। উপদেশ দিলেন, উৎসাহ দিলেন, নির্জন ঘর সাদা কাগজ পাখের কলম কালি দিলেন। "—লেখ, লিখে উপার্জন করবার চেষ্টা কর আর একবার।"

কিন্তু অতিভাষী এই সহৃদয় মানুষটি নিজেই এসে তাঁর মনোযোগ নষ্ট করতেন। ঘণ্টা মিনিটের হিসেব না রেখে উৎসাহ ও উপদেশ বর্ষণ করতে থাকতেন; ফলে বিরক্ত হয়ে উঠতেন বালজাক। তাঁর কাজের নেশায় দিন রাতের ভেদ থাকত না। খাওয়া নাওয়া ঘুমোনোর ঠিক থাকত না। বড় লোকের বাড়ির বাঁধা নিয়ম, অতিভাষী বন্ধুর সাহচর্য, দুদিনেই অসহ্য হয়ে উঠেছিল। বড়লোকের বাড়ি সুখের আশ্রয় কিন্তু লেখকের আশ্রম নয়।

অতএব সে-বাড়ি ছেড়ে দিলেন বালজাক। তিনি পনর দিন এক মাসের জন্যে ঘর ভাড়া করতে লাগলেন, দু' তিন সপ্তাহের বেশি কোথাও থাকেন না আর ভাড়াটে হিসেবে পুলিশের খাতায়ও নাম লেখান না পাছে সেখান থেকে ঠিকানা পেয়ে পাওনাদার এসে পেছনে লাগে। এমনি করে দুর্জয় সঙ্কল্পের রথ পথচিহ্নহীন পাথুরে বন্ধুর সময়ের জমি চষে চলেছে। বেঁচে থাকার নির্মম অভিশাপে তখনও ছদ্মনামে বটতলার উপন্যাস লিখছেন। কিন্তু মনের মধ্যে মর্মান্তিক যন্ত্রণা—সময় হয়েছে, এবারে স্বনামে আত্মপ্রকাশ করবেন কিন্তু সে কঠিন দায়িত্ব পালন করবার জন্যে নিশ্চিন্ত একটি আশ্রয় ও নিরঙ্কুশ অবসর চাই। পান না। ছট্‌ফট্ করেন আর সে অস্থির মনে যখন যা মাথায় আসে লেখেন। তরল গম্ভীর ব্যঙ্গ বিদ্রূপ যে কোন হ্রস্ব দীর্ঘ রচনা তাঁর সাবলীল কলমের অনায়াস আয়ত্ত; ফলত ছদ্মনামের এই লেখক দৈনিক সাময়িক সব কাগজের প্রয়োজনের বস্তু হয়ে ওঠেন। বিশেষ করে অভিজাত সমাজের অন্তঃসার শূন্য জীবনচর্যা প্রেমপ্রণয় ও ফাঁকা আভিজাত্যের নোংরামি ক্ষুরধার কৌতুকে ঠাট্টায় এমন মর্মান্তিক অথচ হার্দ্য হয়ে উঠত যে অচিরেই তিনি অভিজাত সমাজের অন্দর মহলের প্রিয় হয়ে উঠলেন, ছদ্মনামের আড়ালের মানুষটিকে তাদের কেউ কেউ আবিষ্কারও করে ফেললেন। কিন্তু দুঃখের সঙ্গে যাদের অনুক্ষণের নির্মম লড়াই, প্রেম করবার সময় কোথায় তাদের। ঘরের দরজা জানালা বন্ধ করে মোমবাতি জালিয়ে লিখতে বসেন, দিন ফুরিয়ে রাত, রাত ফুরিয়ে আর এক নতুন দিন আসে। বালজাকের তখনও কলম চলে। চলতেই থাকে। এক সময়ে

হাত অবশ হয়ে আসে। মন ক্লান্ত হয়। তিনি উঠে পড়েন। কিছুক্ষণ পায়চারী করেন কি শুয়ে থেকে অসমাপ্ত রচনার শেষ অংশ ভাবেন কিংবা তখনও পাবলিশারের দরজা খোলা আছে মনে হলে দৌড়ে যান ; অগ্রিম দেওয়া টাকা কেটে রেখে একশ দু'শ ফ্রাঁ যা দেয় পাবলিশার পকেটে পুরে ফিরে আসেন। কোনদিন যান কাগজের অফিসে নতুন লেখার বায়না আনেন, পাওনা আদায় করেন। কিন্তু রোজ এমন শরীর মগজ নিংড়ানো লেখা চলে না। এমন করে চললে মেশিনও মাঝে মাঝে অচল হয়ে যায়। মাথা ঝিমিয়ে আসে, শরীর অবশ হয়। এমন সব ব্যর্থ চেষ্টার অপ্রসন্ন দিনে অনিদ্রায় অবসন্ন ক্ষুধায় কাতর তিনি ছুটে আসেন কোন বন্ধুর বাড়িতে। কিছু খাদ্য কিছু প্রেরণার আশায়।

ধরে প্রাণ ধরে রাখার দায়ে লেখা ; স্বাভাবিক, এ সময়ে তিনি অনেক বাজে লেখা লিখবেন, লিখেছেনও তাই। ঝড়ের বেগে লিখেছেন, মাথায় যা আসে লিখেছেন, লিখে দ্বিতীয় বার পড়ে দেখারও সময় পান নি কি গ্রাহ্য করেন নি, কালি শুকোতে না শুকোতে প্রেসে চলে গেছে লেখা, দুদিন পরেই ছাপা হয়ে বেরিয়ে গেছে কাগজে। কিন্তু ভাবতে বিস্ময় লাগে তখনকার সেই এক বছরে, সেই আতসবাজী পোড়ানোর মতন হেলাফেলার লেখার খেলার মধ্যেও এমন গোটা বারো গল্প তাঁর কলম থেকে বেরিয়েছে যেমন, 'যুন প্যাসোঁ দ্যঁ ল্য দেজার্ত', 'যুন এপিজোদ স্যু লা ত্যরোর', 'এ ভারদুগো', 'সারাজি' ইত্যাদি যার গভীরতা ও সুন্দরতা আজ এই পঞ্চাশাধিকশততম বছর পরেও আমাদের চমকে দেয় অভিভূত করে। ওই লোকোত্তর প্রতিভার পায়ে আপনা থেকে নত হয়ে আসে মাথা।

বালজাকের এই নিরাশ্রয় নিরবসর দুঃসময়ের একদিন তাঁর বাবা মারা যান। ঠিকানাহীন ছেলেকে সে খবর দিতে পারেন নি মা কিংবা অপদার্থ সন্তানের প্রতি বিরূপ বিরক্ত মা সময় মতন খবরটা পৌঁছে দেওয়ার বিশেষ চেষ্টাও করেন নি। বালজাক যখন খবরটা জানলেন তখন তাঁর পিতাকে সমাধিস্থ করা হয়ে গেছে।

বালজাকের নিরাশ্রয় জীবনের অবসান ঘটে ১৮২৯ সালের গোড়ার দিকে। বোনের কাছে এরই কিছুদিন আগে অনন্যোপায় হয়ে পূর্বোল্লিখিত চিঠি লিখেছিলেন : ঘর ভাড়া করবার জন্যে ভগ্নীপতি মঁসিয়ে স্যুরভিল-এর নাম ব্যবহার করবার অনুমতি চেয়েছিলেন তিনি চিঠিতে। বোন তার স্বামীর সেই অনুমতি আদায় করে দাদাকে চিঠি দেন। তখন পারীর শহরতলিতে মাদাম বেরনিই তাঁর ফ্ল্যাট ভাড়া করে দিলেন। মাদাম বেরনির ভিলার সঙ্গে রু দ্য কাসিনির এই ফ্ল্যাট বাড়িটি এমন ভাবে সংলগ্ন ছিল যে তিনি অন্যের দৃষ্টি এড়িয়ে অনায়াসে যখন তখন

বালজাকের ফ্ল্যাটে আসতে পারতেন। বছরে চারশ ফ্রাঁ ভাড়ার পাঁচখানা ঘরের এই ফ্ল্যাটে বালজাক ন'বছর আত্মগোপন করেছিলেন। এখানে তিনি তাঁর জীবনের শ্রেষ্ঠ রচনাগুলি লিখেছেন। তাঁর কল্পনার হাজার হাজার মানুষ এই ঘরের নিভৃতে কাগজের ওপরে কালির আঁচড়ে চিরকালের জন্য রক্তমাংসে জীবন্ত হয়ে উঠেছে।

এই জীবন-গড়ার কারিগরীর কাজে কী যে কঠিন সংকল্প ও অনির্বাণ অভীপ্সা তাঁর ভিতরে অনুক্ষণ লেলিহান হয়ে জ্বলত তার একটি ঘটনার উল্লেখ করেছেন বালজাকের অন্যতম বন্ধু গোতিয়ের। তিনি লিখছেন—"কখনো কখনো বালজাক সকাল বেলাতেই এসে হাজির হত আমার বাড়িতে। ক্লান্ত বিধ্বস্ত শরীর সোফায় এলিয়ে দিত। আমি তার রাতজাগা অবসন্ন চোখ আর ক্ষুধা পীড়িত শুষ্ক মুখ দেখতাম এবং বিন্দুমাত্র দেরি না করে প্রচুর সারডিন (মাছ) মাখন আর রুটি আনবার হুকুম দিতাম চাকরকে। খাবার এলে আর তর সইতো না তার। বালজাক মাছে মাখন জড়িয়ে একটা পিণ্ড পাকাত তারপর রুটির সঙ্গে গোগ্রাসে তাই গিলত। খেতে খেতে ঘুমে চোখ বুজে আসত তার। খাওয়া হয়ে গেলে আর এক মিনিটও দেরি করত না। এসে ডিভানের ওপরে টান হয়ে শুয়ে পড়ত। শোয়ার আগে বলত, "মাত্র এক ঘণ্টা ঘুমোবো। ঠিক এক ঘণ্টা পরে আমাকে ডেকে দিও। না দিলে কুরুক্ষেত্র হয়ে যাবে।"

তার সেই ধমকের ভয়েও সবদিন তার কথায় সায় দিতে পারতাম না। একদিন বড় মায়া হয়েছিল। কঠোর পরিশ্রমের পরে কী নিবিড় হয়ে ঘুম এসেছে তার চোখ জুড়ে! এক ঘণ্টা পার হয়ে গেছে তবু আমি তাকে জাগাতে পারলাম না। এত মায়া লাগল, ভাবলাম, আজ ও প্রাণ ভরে ঘুমোক, আমি ডাকব না। পাছে কেউ এসে ঘুমের ব্যাঘাত ঘটায় আমি জানালার পর্দা টেনে নিকটের চেয়ারে বসে রইলাম।

ঘুম যখন তার ভাঙল দিনের আলো মলিন হয়ে সন্ধ্যার ধূপছায়ায় নীলের ছোপ ধরেছে।

সে লাফিয়ে উঠে রাগে কাঁপতে কাঁপতে আমার সামনে এসে দাঁড়াল,—"তুমি একটা বিশ্বাসঘাতক বেইমান ডাকাত খুনে—"প্রাণপণে যা খুশী গাল পাড়তে লাগল। তাতেও তার রাগ পড়ল না। সে শেষে আমার দু'কাঁধ ধরে প্রবল বেগে ঝাঁকুনি দিতে লাগল,—"তুমি আমার দশ হাজার ফ্রাঁ ক্ষতি করেছ। যে সময়টা আমি ঘুমিয়েছি ততক্ষণে অনায়াসে একটা উপন্যাসের পরিকল্পনা হয়ে যেত। পচিশ গেলি

প্রুফ দেখা হত। পাঁচটা পাবলিশারের সঙ্গে নতুন চুক্তি হত, তারপরেও কোন রাজকুমারীর সঙ্গে কিছুক্ষণ সময় কাটাতে পারতাম আমি।"

এই ছিলেন বালজাক। দিনরাত খ্যাতির স্বপ্ন দেখতেন, প্রেমের স্বপ্ন দেখতেন, সর্বোপরি টাকার স্বপ্ন। তিনি তাঁর এক বিখ্যাত বইয়ের নায়কের মুখে বলেছিলেন. যেনতেন প্রকারেণ খ্যাতি চাই। তা সে ব্যবসা করে হোক, ধনী বিধবা বিয়ে করে হোক কি স্টক একচেঞ্জে, শেয়ার মার্কেটে জুয়া খেলে হোক। আসলে সারা জীবনই বালজাক তাঁর জীবন নিয়ে জুয়া খেলেছেন। মাদাম বেরনির ছেচল্লিশ হাজার ফ্রাঁ ঋণ বাদ দিয়ে তাঁর অবশিষ্ট ষাট হাজার ফ্রাঁ চিরস্থায়ী ঋণের জন্যে তাঁকে বছরে ছ' হাজার ফ্রাঁ সুদ যোগাতে হত। তার পরেও তিনি সেই ঋণদাতাদের কাছেই হাত পাততেন ; তারাও সেই ঋণ আদায়ের দায়ে পড়েই নতুন করে ঋণ দিত। ঋণে ঋণে বিব্রত বিভ্রান্ত বালজাক, সাহিত্যে যখন খ্যাতি হতে শুরু করেছে, অর্থাগম ও প্রতিপত্তি বাড়ছে ক্রমশ, তখনও অর্থ উপার্জনের অন্য পথ খুঁজেছেন। রাতারাতি ধনী হবার দুরাশায় অসম্ভব সব ব্যবসার ঝুঁকি নিয়েছেন। তিনি প্রাচীন রোমানদের পরিত্যক্ত এক রুপোর খনি থেকে রুপো উদ্ধারের পরিকল্পনা করেছিলেন, পারীর উপকণ্ঠে আনারসের চাষ করবার উদ্যোগ আয়োজন করেছিলেন, পোল্যাণ্ড থেকে কাঠ আমদানীর ব্যবসা করতে নেমেলিছেন। কিন্তু কোন ব্যবসায়িক চেষ্টাই কোনদিন ফলবতী হয়নি, কেবল গুচ্ছের টাকা অপব্যয় হয়েছে ; ঋণের দুর্বহ বোঝা অধিকতর ভারী হয়েছে কেবল। সম্পদের স্বর্ণ গোলক স্বপ্নের ভ্রিথলয়েই থেকে গেছে। তিনি নিজে ডুবেছেন, কথার জৌলুসে মুগ্ধ করে আরও হাজার জনকে ডুবিয়েছেন। স্বর্ণ হরিণীকে ধরবার জন্যে হাজার বনবাদাড় ব্যর্থ হানা দিয়ে ক্লান্ত হতাশ অবশেষে নিজের লেখার টেবিলে এসে বসেছেন, কল্পনা আর অভিজ্ঞতার টানা পোড়েনে বোনা অলৌকিক প্রতিভার জাল ফেলে অবশেষে তাকে ধরেছেন। আসলে তাঁর ছিল দুর্জয় ইচ্ছাশক্তি, অনমনীয় জেদ আর নিখাত নিষ্ঠা। আর এই সবকিছুর আত্যন্তিক লক্ষ্য ছিল—টু বী ফেমাস অ্যাণ্ড টু বী লভড্ অ্যাণ্ড নেক্সট টু ফেম অ্যাণ্ড লভ মানি।

বালজাকের জীবনের মৌল লক্ষ্যের দিকে যাত্রা শুরু হয় তাঁর ত্রিশ বছর বয়সে। তখন তিনি রু দ্য কাসিনি-তে পাঁচখানা ঘরের ফ্ল্যাটটিতে এসে নিরুপদ্রব আশ্রয় পয়েছেন। পাঁচখানা ঘরের চারখানাকেই তিনি সাজিয়ে ছিলেন রাজ্যের যত অপ্রয়োজনীয় শৌখিন আসবাবপত্রে। এ ব্যপারে তিনি যেন ছিলেন শিশু। আভিজাত্যের ঠুনকো অহংকারে অন্ধ। এর জন্যে তিনি প্রায়ই নিলামের বাজারে

ঘুরে বেড়াতেন আর যখন যে বস্তু তাঁর শিশুসুলভ কৌতূহল আকর্ষণ করত কিনে আনতেন। কিন্তু নেপোলেওঁর ছোট্ট মূর্তিটি তিনি কিনেছিলেন তাঁর দুর্জয় ইচ্ছা শক্তির প্রতীক হিসেবে। বস্তুত একমাত্র নেপোলেওঁর সঙ্গে ছাড়া তাঁর দুর্জয় ইচ্ছা শক্তির সঙ্গে আর কারোর তুলনা চলেনা।

বালজাকের পাঁচখানা ঘরের একখানা ছিল লেখার ঘর। এমন বিলাসপ্রিয় মানুষটির লেখার ঘরটিতে ঢুকলে কিন্তু বোঝা যেত আসলে তিনি কতখানি নিরাসক্ত ছিলেন। তাঁর অন্যান্য ঘরগুলি থেকে এ ঘরখানি ছিল এক আশ্চর্য ব্যতিক্রম— নিরলংকার যেন পুজোর ঘর। আসবাবহীন ঘরখানিতে থাকত একটি টেবিল। টেবিলে পাখের কলম অনেকগুলি, একটা মস্ত দোয়াত আর কয়েক রিম নীলাভ কাগজ। আলো পড়ে ঝিকিয়ে উঠে চোখ পীড়িত করে বলে সাদা রংয়ের কাগজ তিনি পছন্দ করতেন না। টেবিলে আর যে মূল্যবান জিনিসটি থাকত সে ওই নেপোলেওঁর প্রস্তর মূর্তিটি। অবশিষ্ট জায়গা জুড়ে প্রুফ আর পাণ্ডুলিপির ডাঁই।

বালজাক তাঁর জীবনের পরম প্রতিশ্রুতি, বরং মন্ত্রই বলা ভাল, একটি কাগজে বড় বড় হরফে লিখে নেপোলেওঁর মূর্তির বেদীতে এঁটে দিয়েছিলেন। Ce qu'il n'a pas pu achever par l'épée, je l'accomplirai par la plume. নেপোলেওঁ তরবারি নিয়ে জয়যাত্রা শুরু করেছিলেন, কলম দিয়ে আমি তা সার্থক করব।

এ প্রতিশ্রুতির মন্ত্রের মধ্যেই বালজাকের নবজাগ্রত দায়িত্ব বোধের সূচনা। যার ফলশ্রুতি ছদ্মনামে লেখা বন্ধ করে দেওয়া ও স্বনামে পুস্তক প্রকাশ। তাঁর অনমনীয় আত্মবিশ্বাসের পরিচয় পাওয়া যায় এ সময়ে। তাঁর প্রথম বই 'ল্য দেরনিয়ে শুআঁ' উপন্যাস রচনা করতে বসে তিনি তাঁর বন্ধুর কাছে সগর্বে বলেছিলেন, "ঐতিহাসিক উপন্যাস লিখে আমি শুধু স্যার ওয়ালটার স্কটের সমানই হব না, আমি তাঁকে ছাড়িয়ে যাব। আমি তাঁর থেকে ভাল উপন্যাস লিখব। স্কটের লেখার ত্রুটি বিচ্যুতি আমার লেখায় থাকবে না।" পানও নি মঁসিয়ে লেতুশ। পূর্বেই বলেছি লেতুশ ছিলেন জহুরী। বই তখন পর্যন্ত মাত্র পঞ্চাশ ষাট পাতা লেখা হয়েছে সেই লেখা পড়েই মঁসিয়ে লেতুশ টের পেয়েছিলেন, বালজাককে চিনতে তিনি ভুল করেননি। তক্ষুনি তাঁকে দু'হাজার ফ্রাঁ অগ্রিম দিয়েছিলেন বইখানার জন্যে। দু'বছর বসে বালজাক তাঁর সেই চার ভলুমের উপন্যাস শেষ করেছিলেন। যিনি দু'তিন সপ্তাহে এক একখানা বই লিখে শেষ করতেন বোঝা যায় দু'বছর বসে এ উপন্যাসে তিনি তাঁর কী ঐকান্তিক নিষ্ঠা ও প্রচেষ্টা প্রয়োগ করেছিলেন। যদিও

বইখানা একবছরে মাত্র চারশ কপি বিক্রি হয়েছিল কিন্তু খ্যাতির স্বাদ পেয়েছিলেন বালজাক, এই তরুণ লেখকের প্রতি সচকিত হয়েছিলেন পারীর গুণীরা। তারপরে আরো কয়েক বছর গত হয়েছে, স্বনামে তাঁর আরও কয়েকখানা বই বেরিয়েছে কিন্তু তখনও তিনি অনরে বালজাক। তখনও তিনি দ্য বালজাক নন। তখনও তিনি বিখ্যাত হননি। এ সময়ে তাঁর এক পুরোনো পাওনাদার কেমন করে তাঁর গোপন আস্তানার ঠিকানা আবিষ্কার করে এসে হাজির রু দ্য কাসিনিতে। কবে যে বালজাক তাঁর থেকে দু'শ ফ্রাঁ অ্যাডভান্স নিয়েছিলেন মনে নেই বললেই ত রেহাই পাওয়া যায় না অতএব পুরোনো ফাইল ঘেঁটে একটা রম্য রচনার অসমাপ্ত লেখা বার করলেন তিনি এবং তাকেই নতুন করে লিখতে বসলেন। তাঁর এ পুস্তকের জন্যে অভিজাত সমাজের প্রেম প্রণয়ের বহু রোমাঞ্চকর তথ্য সরবরাহ করেছিলেন মাদাম বেরনি আর ড্যশেস দাব্রানতে। লয়ালিস্ট দলের এই বিচিত্র রুচির চল্লিশোত্তীর্ণ মহিলা নিজেও একজন কথাসাহিত্যিক ছিলেন। তা ছাড়া তাঁর ছিল নানা ধরণের অনেক প্রণয়ী। অভিজ্ঞতার খনি এই মহিলা বালজাকের ছিলেন বিশিষ্ট বন্ধু। সেই সুবাদে ড্যশেস দাব্রানতে-র অভিজ্ঞতার সাহায্য পেয়েছিলেন বালজাক। মাদাম বেরনির অভিজ্ঞতার সঙ্গে সে অভিজ্ঞতা মিশিয়ে উজ্জ্বল কৌতুক ও তীব্র কটাক্ষের মনস্তত্ত্ব 'ফিজিওলজি দ্যু মারিআজ' রচনা করলেন বালজাক। এই বই-ই প্রথম যথার্থ খ্যাতি নিয়ে এল বালজাকের। বাজারে বইখানা বেরোতে না বেরোতে অভিজাত পরিবারের দরজা খুলে গেল বালজাকের সামনে। তিনি প্রতিদিন গুচ্ছ গুচ্ছ চিঠি পেতে থাকলেন। কেউ কেউ গালমন্দ করতে লাগলেন তাঁদের নিয়ে কেচ্ছা করা হয়েছে বলে, কেউ কেউ তাঁদের মনের কথা মুগ্ধ ভাষায় বলা হয়েছে বলে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করলেন। এই সব পত্র প্রেরকদের অধিকাংশই কাউনটেস, মারকুইস কিংবা ড্যশেস। তাঁদের বৈঠকখানায় ক্লাবে বাড়িতে নিমন্ত্রণ আসতে থাকল তাঁর। তাঁর সঙ্গে পরিচিত হতে পারীর অভিজাত সমাজ উদগ্রীব হল। বালজাকের পরিচয় হল দ্যলফ্যাঁ গে, ভিকতর য়ুগো, লামার্ত্যাঁ, জুল জান্যাঁ প্রভৃতি সাহিত্যরথীর সঙ্গে। ভালবাসা ও খ্যাতি যেন গলাগলি হয়ে তাঁর দুয়ারে এসে কড়া নাড়ল।

কিন্তু সে মরীচিকার মোহ তাঁকে সংকল্পভ্রষ্ট করতে পারেনি। তাঁর সমকালীন লেখকরা যখন আড্ডায় রেস্তোরাঁয় থিয়েটারে জমায়েত হচ্ছে, তারস্বরে সাহিত্যের গতি প্রকৃতি নিয়ে আলোচনা সমালোচনা করছে, কি নিজের কৃতিত্বের গৌরব ঘোষণা করতে পাঠ করে শোনাচ্ছে স্বরচিত সাহিত্য, বালজাক তখন

নেপোলেওঁর ছোট্ট মূর্তিটি সামনে করে মোমের আলোয় অবনত মস্তকে অনর্গল লিখে যাচ্ছেন।

দশটা বছর অন্ধের মত চতুর্দিকে হাতড়ে অবশেষে যেন তিনি নিজের যোগ্য পেশা খুঁজে পেয়েছিলেন। পারীকে যদি এক অতিকায় প্রাণী ধরা যায় ত দেখতে দেখতে তিনি হয়ে উঠলেন তার ঐতিহাসিক, মনস্তাত্ত্বিক শারীরতাত্ত্বিক ডাক্তার শিল্পী, বিচারক, কথাকার—না শুধু পারীর না, ফ্রান্সেরও নয়, সারা পৃথিবীর মানুষেরই যেন আলোকবর্তিকা হয়ে উঠেছিলেন তিনি।

বালজাকের মূল সমস্যা ছিল তাঁর উপাদানগুলিকে সাজানো নিয়ে। তাঁর মাথার মধ্যে এক সঙ্গে অসংখ্য ভাব ও চরিত্র গিস্‌গিস্ করত। সে ভাব ও চরিত্রের পরম্পরা এত ঘনিষ্ঠ আর তার সংক্রমণতা এত ব্যাপক ছিল যে, সেগুলির শিল্প সৌকর্য বজায় রেখে প্রকাশ করা তাঁর পক্ষে প্রায় অসম্ভব হয়ে উঠত। তুচ্ছ চরিত্র সামান্য ঘটনাগুলি পর্যন্ত এমন সজীব ও প্রাণবন্ত হয়ে উঠত যে তার কোন একটিকেও বাদ দেবার কথা তিনি চিন্তাও করতে পারতেন না। তাঁর সৃষ্ট চরিত্রগুলি তাদের আপন মহিমায় ও শক্তিতে যেন তাঁকে শুদ্ধ ভাসিয়ে নিয়ে চলে যেত, তিনি কোন মতেও যেন তাদের বাগ মানাতে পারতেন না। রাশ টানতে সংযত করতে হিমসিম খেয়ে যেতেন। ফলে একটা লেখা হাজার বার কাটাকুটি সংযোজন সংশোধন করে তবে গিয়ে নিটোল হত। যদিও তখনও তাঁর মনে সন্তোষ থাকত না। তিনি কেবলই খুঁতখুঁত করতেন, পাঁচ সাতবার প্রুফ দেখার পরেও তিনি ছুটে ছুটে প্রেসে যেতেন, নতুন নতুন ঘটনা সংযোজন, দৃশ্য পরিবর্তন, বাক্য পুনর্গঠন ত হামেশাই করতেন এমন কি একটা মনোমত শব্দের জন্যে তিনি উন্মত্তের মতন মাথা কুটতেন। প্রুফ হাত ছাড়া হয়ে গেলেই তাঁর মনে হত কোথায় যেন একটি বড় রকমের ত্রুটি থেকে গেছে। এ সন্দেহ সংশয় তাঁর একটা দুরারোগ্য ব্যাধির মতন ছিল। এ ব্যাধির তাড়নায় ঘুম খাওয়া উবে গিয়েছিল তাঁর। এইভাবে তাঁর মধ্যে শিল্পের আহিতাগ্নি জ্বলতে শুরু করেছিল। আর ক্রমাগত তা আত্মদহনে সর্বগ্রাসী ও লেলিহান হয়ে উঠছিল। উঠছিল জীবনের তিনটি আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করতে—বিখ্যাত হতে, ভালবাসা পেতে, ধনী হতে। আর তারই জন্যে তিনি এক প্রচণ্ড উদ্যমে সমস্ত জীবন সেই আহিতাগ্নিতে ইন্ধন যুগিয়েছেন। এমন কি যখন তিনি তাঁর জীবনের ধূলি ধূসর অধ্যায় পেরিয়ে এসেছেন তখনও তিনি সেই নিদারুণ দহন জ্বালার দাসত্ব থেকে মুক্তি পাননি।

পারী যখন উৎসব মাতাল—প্রমত্ত তখনও, যখন পারী ক্লান্ত অবসন্ন নিঃসাড়

ঘুমে অচেতন তখনও একাকী ধ্যান নিমগ্ন মন তাঁর নেপোলেঁওর মূর্তির বেদী-মূলে মোমের আলোর তলায় নত শির। সামনে ঈষৎ ঝুঁকে তিনি হয়ত নিরবচ্ছিন্ন দ্রুত লিখে চলেছেন অথবা নিবিষ্ট চিন্তায় প্রুফ সংশোধন করছেন।

রাত্রিই বাধা বন্ধহীন নিরবচ্ছিন্ন কাজের স্বর্ণ সময়। তাই বালজাক রাতকেই তাঁর সৃষ্টির সহচর করে নিয়েছিলেন। মধ্য রাতে চাকর এসে আস্তে করে দরজায় টোকা মারত। আর অমনি উঠে বসতেন বালজাক। এবং তক্ষুনি তাঁর সাদা যাজকের জোব্বাটি (white monk's cassock) পরে প্রস্তুত হতেন। এ জোব্বা পরে তিনি কাজ করতে খুব আরাম পেতেন। গরমের কালে তাঁর জন্যে এ জোব্বা তৈরি হত লিনেন দিয়ে আর শীতের জন্যে উলে। যাজকের-জোব্বা পরার পেছনে শুধু যে কাজের সুবিধে বোধটাই ছিল তাই নয়, ও জোব্বাটি পরে তাঁর মনে হত এ জীবন ভোগের নয় যোগী সন্ন্যাসীর, তিনি ক্ষণস্থায়ী আমোদ স্ফূর্তির জন্যে জন্মান নি। তাঁর তপস্যা মহৎকে জীবনের উপলব্ধিতে সত্য করে তোলা। তাঁর জোব্বার কলারের সঙ্গে প্রথমে সুতোর, পরে স্বচ্ছল হলে সোনার চেন থাকত। তার এক প্রান্তে বাঁধা থাকত একগাছা কাঁচি আর এক প্রান্তে একখানা ছুরি। পোশাক পরে তিনি দু চারবার ঘরময় পায়চারি করে চোখের ঘুম তাড়িয়ে নিতেন ; ততক্ষণে তাঁর চাকর পড়ার ঘরের মোমদানিতে ছটা মোমবাতি জ্বালিয়ে দিয়েছে, সামনে রেখে দিয়েছে কালো কফির পাত্র। দরজা জানালায় পর্দা টেনে দিয়েছে ভাল করে। কাজ করতে করতে কখন ভোর হয়ে যাবে, দিনের আলো ঘরে ঢুকে জানিয়ে দেবে একটা দিন শেষ হয়ে নতুন আর একটা দিন এল, তাঁর জীবন থেকে একটা দিনের আয়ু শুকনো পাতার মতন খসে পড়ল এটা তিনি বরদাস্ত করতে পারতেন না। পড়ার টেবিলের সঙ্গে বালজাক যতখানি ঘনিষ্ঠ ছিলেন, যতখানি সময় তাঁর ওই টেবিলে কাজ করে কেটেছে তার এক চতুর্থাংশ সময়ও নারীর সঙ্গে কাটেনি তাঁর। সারা জীবন তিনি তৃষ্ণার্থের মতন নারীর প্রেম ভিক্ষা করেছেন, পেয়েছেনও অনেক, তবু কখনো প্রেম কাজকে ছাপিয়ে উঠতে পারেনি। তিনি কাজ করতে করতে নিজেকে ক্ষয় করেছেন, মৃত্যু বরণ করেছেন।

বালজাক যখন লিখতেন নিরবচ্ছিন্ন লিখে যেতেন। যত লিখতেন তত উত্তপ্ত হত চিন্তা, উদ্ভিন্ন হত প্লট, উচ্ছ্বসিত হত ভাষা। যত রাত বাড়ত, লেখাও তত দ্রুত হত। কলমের সঙ্গে আঙুল চেপে বসে যেত, মাথা ঝিমঝিম করত। তখন বাধ্য হতেন কলম থামাতে, কলম রাখতে। তখন তিনি কফি খেতেন। কালো কফি।

বালজাক তামাক পছন্দ করতেন না। বলতেন তামাক স্বাস্থ্যের পক্ষে

অতিশয় খারাপ। ওটা মনের ওপরেও বিষক্রিয়া করে। বুদ্ধি ভোঁতা করে দেয়। তিনি পছন্দ করতেন কফি। কালো কফি। কফির গুণকীর্তনে তিনি পঞ্চমুখ ছিলেন।

সেই কফিই তাঁর কাল হয়েছিল। একজন সংখ্যানবীসের মতে ১৮৩০ থেকে ১৮৪৫ এই পনর বছরে তিনি প্রতি রাতে যে কড়া কফি খেয়েছেন তার মোট সংখ্যা পঞ্চাশ হাজার কাপ। শেষ দিকে পুনঃপুন কফি খেতেন। এত বারবার খেয়েও তাঁর শরীর চাঙ্গা হত না। কাপের পর কাপ ঢক্‌ঢক্ করে গিলতে হত। কফি গিলে গিলে শেষমেশ এমন হয়েছিল কফি পেটে পড়লেই যন্ত্রণা হতে থাকত। বালজাকের সারা জীবনের বন্ধু ডাক্তার নাকোয়াৎ বলেছেন, ওই অপরিমিত কফিই বালজাকের অকালমৃত্যুর জন্যে দায়ী। বালজাক মারা গিয়েছিলেন হৃদ-রোগে। রাতজাগা, একটানা বারো পনর ঘণ্টা বসে বসে লেখা আর কেবল কফি গেলা—এই করে করে তিনি নিজেকে খতম করেছিলেন। শেষকালে সেই ভয়ংকর দিনগুলির আগে পর্যন্ত দেখা গেছে পারী শহরের অতন্দ্র-প্রহরী বালজাক মধ্য রাত্রি থেকে সকাল আটটা পর্যন্ত লিখে চলেছেন। আটটা বাজলে তাঁর চাকর এসে দরজায় টোকা দিলে উঠে এসে দরজা খুলেছেন।

চাকর এসে টেবিলের লেখা ও প্রুফের স্তূপ সরিয়ে প্রাতঃরাশের জায়গা করত। আর তিনি জানালার পর্দা সরিয়ে বাইরে তাকিয়ে ক্ষণকাল স্তব্ধ হয়ে থাকতেন। যে পারীকে জয় করবার জন্যে তিনি অনিদ্রায় রাত্রি ফুরিয়েছেন তার নীল আকাশ, উজ্জ্বল রৌদ্র দেখতেন। নিঃসাড় ঘুমের পর পারী তখন সম্পূর্ণ সজাগ। তার দোকান পাট সব খুলে গেছে ততক্ষণে। যান জনতায় ভরে উঠেছে রাস্তা। কোলাহল মুখর হয়ে উঠেছে চারদিক। ব্যস্ত জীবনের উদ্দাম রক্ত বইতে শুরু করেছে।

বালজাক ফিরে আসেন জানালা থেকে। প্রাতঃরাশ শেষ করেন। শেষ করে স্নান করতে যান। নতুন কাজ আরম্ভ করবার আগে সারারাতের শ্রমক্লান্ত শরীর চাঙ্গা করতে সুসজ্জিত স্নানের ঘরে ঘণ্টা খানেক কাটান। তারপর আসেন শোবার ঘরে। এ ঘরখানি প্রাচীন কোন সামন্ত অভিজাতের বৈঠকখানার মতন শৌখিন বাহুল্যে সাজানো। অলস চোখে শিশুর কৌতূহলে সে সব প্রিয় সামগ্রী দেখতে দেখতে একটা নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত ঘুমিয়ে নেন। ওঠেন। খান। এবং তাড়াতাড়ি পোশাক পালটে বেরিয়ে পড়েন। নিজে হাতে প্রুফ পৌছে দিয়ে আসেন প্রেসে। সেখানে বসেও কিছু প্রুফ দেখেন। আবার এক গাদা নতুন

প্রুফ দেখবার জন্যে নিয়ে আসেন বাড়িতে। অবশিষ্ট দিন প্রুফ কাটাকুটি সংশোধন পরিমার্জন বর্জন সংযোজন চলে। বিকেলে বেরোন কোন প্রেমিকার নিমন্ত্রণ রাখতে। অথবা টান হয়ে শুয়ে পড়েন, নতুন করে লিখতে বসবার আগে আর একটু ঘুমোন কিংবা ঘুমোতে পারেন না। অভিনব কোন প্লট মাথায় ঢুকে সব ঘুম কেড়ে নেয়।

পাঁচ

মানুষ গোড়াতেই জানেনা সে কী হবে। সে ক্রমাগত 'হয়ে ওঠে' আর সেই হয়ে ওঠার মধ্যে দিয়ে জানতে পারে সে কী হয়ে উঠেছে, সে কী হবে, কী হয়ে ওঠার ক্ষমতা তার মধ্যে আছে। বালজাকের জীবনেও সে সূত্রের ব্যতিক্রম ঘটেনি। তাঁর মধ্যে একটা দুর্দমনীয় ইচ্ছা কাজ করত। একটা দুঃশাসিত বাসনার আবেগে তিনি ছুটে বেড়াতেন। "টু বী রিচ্, টু বী ফেমাস্ অ্যাণ্ড টু বী লভড্" এই ছিল তাঁব জীবনের মটো। কিন্তু ধন চাই মান চাই ভালবাসা চাই বললেই তা সব আপনা থেকে হাতের মুঠোয় এসে ওঠে না। তার জন্যে কাজে ঝাঁপিয়ে পড়তে হয়। বালজাকও পড়েছিলেন। সব আগে তিনি চেয়েছেন টাকা। তিনি নিজে লিখেছেন, "আমি দেখেছি, যার টাকা নেই তার কোন প্রতিপত্তিও নেই, অভিজাত সমাজে স্থান নেই তার কোন। সে অবজ্ঞার আস্তাকুঁড়ে তাচ্ছিল্যের নোংরার মধ্যে পচতে জন্মেছে।" তিনি তেমন করে ইঁদুর কুকুরের মতন পচে মরতে চাননি। তাই যখন যেখানে টাকার সম্ভাবনা দেখেছেন, ছুটে গিয়েছেন। প্রাণান্ত পরিশ্রমে সেখান থেকে টাকা উপার্জন করতে চেষ্টা করেছেন। তিনি কখনো জর্নালিস্ট হতে চেয়েছেন, কখনো রাজনীতিক। অর্থ আর খ্যাতির জন্যে কেবল ছুটোছুটি করেছেন। তিনি যে সাহিত্যিকই হবেন এমন কোন কঠিন প্রতিজ্ঞা ছিল না তাঁর।

অথচ সাহিত্যিক হওয়ার জন্যে অপরিহার্য তিনটি গুণের সব ক'টিই তাঁর সহজাত ছিল, স্বতঃস্ফূর্ত ছিল—ছিল দুরন্ত কল্পনা, গভীর অন্তর্দৃষ্টি আর মনুষ্যত্বে অপরিসীম বিশ্বাস। খ্যাতি ভালবাসা ও অর্থের জন্যে হাজার দুয়ার থেকে নিষ্ফল হয়ে শেষে অবসন্ন ক্ষত-বিক্ষত অপমানিত তিনি বারেবারে নিজের দক্ষতার কাছে ফিরে এসেছেন। জীবন ও জগৎ সম্পর্কে সেই শৈশব থেকে যে তিক্ত ও মর্মান্তিক

অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে এসেছেন, সে সব উপকরণকে নির্জন ঘরে রাত্রির অতন্দ্র প্রহরে স্টাইলে প্লটে কনটেণ্টে অমর কথাচরিত মানসে রূপান্তরিত করেছেন। যার সমস্ত ভল্যুম মিলে একটাই মহান নাম—কমেদি য়ুমেন (Comédie humaine).

তাঁর এই 'কামেদি য়ুমেন' লেখার পরিকল্পনা তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ 'ফিজিওলজি দ্যু মারিআজ' লেখার পরেই। সেই ১৮৩১-৩২ সালে।

স্যার ওয়ালটার স্কট উপন্যাসকে ইতিহাসের পর্যায়ে তুলে ধরেছেন ; তাকে ইতিহাসের সম্মান দিয়েছেন। কিন্তু তিনি কখনো তাঁর সমগ্র রচনাকে ইতিহাসের মহান ধারার ধারক করতে পারেন নি। ঐতিহাসিক ঐক্যের নিরবচ্ছিন্ন সূত্রে রচনাগুলি বিধৃত হয় নি। সেগুলি বিচ্ছিন্ন বিভক্তই থেকে গেছে। আসলে সে-কথা কখনো চিন্তাই করেননি স্যার ওয়ালটার স্কট। কিন্তু বালজাক করেছিলেন। হঠাৎ যেন কেমন করে তাঁর মাথায় এসে গিয়েছিল কিংবা স্কটের রচনার অসম্পূর্ণতাই আপন রচনার পূর্ণতার প্রতি বালজাককে সচেতন করে থাকবে—তিনি মনস্থ করে ফেলেছিলেন, তাঁর সমগ্র রচনাকে একটি নিটোল পুষ্প স্তবকে গ্রথিত করবেন।

হঠাৎ এসে যাওয়া সেই পরিকল্পনাই হয়েছিল বালজাকের পরবর্তী সাহিত্য সৃষ্টির প্রবল প্রেরণা। বালজাকের প্রতিভা সেই প্রবল প্রেরণার উৎসাহে মানবচরিত্রের এক সামগ্রিক রেখা-চিত্র অঙ্কণে ব্রতী হয়। আর সেই মহান ব্রত উদ্‌যাপনে উৎসর্জিত হয় সমগ্র জীবন। তাঁর সমগ্র জীবনের সৃষ্টি সেই চরিত্রের সংখ্যা প্রায় তিন হাজার। এই হাজার তিনেক চরিত্রের মধ্যে দিয়ে বালজাক তাঁর কালের সমাজ অর্থনীতি রাজনীতি ব্যভিচার অনাচার অত্যাচার ; বলীর দম্ভ দুর্বলের হতাশা মেহনতী জনতার দুঃখ অভিজাততন্ত্রের চক্রান্ত সামন্ত রাজের শোষণ নিষ্পেষণ সব—সমস্ত এক নিরপেক্ষ দৃষ্টির কলমে ফুটিয়ে তুলেছেন। তাঁর সেই সৃষ্টির সাফল্য সম্পর্কে তাঁর অন্যতম জীবনীকার আঁদ্রে মোরিও বলেছেন, "শিল্পীর মমতা আর ছাত্রের মনোনিবেশ তাঁর রচনায় এমন এক অপ্রতিরোধ্য শক্তি সঞ্চার করেছে যে, উপন্যাসগুলিতে বর্ণিত ঘটনাগুলিকে মনে হবে বাস্তব ঘটনার জীবন্ত ইতিহাস। আর সে ইতিহাস বিতংসের মতন এমন নিপুণ কৌশলে পরস্পর গ্রথিত যে তাঁর রচনার জাদু যদি সমগ্র হৃদয় ভরে ভোগ করতে হয় ত তাঁর সমস্ত বইগুলিই একনাগাড়ে পড়তে হবে। আর তেমন ভাবে পড়তে পারলেই কেবল তখন পাঠক বালজাকের দীপ্তবুদ্ধির বিস্তার ও গভীরতা সম্যক ধারণা করতে পারবেন।"

না। ১৮৩১-৩২-এর সেই স্মরণীয় দিনটিতেই তিনি তাঁর সমগ্র সৃষ্টির মহান নাম 'কমেদি য়ুমেন' কথাটি আবিষ্কার করতে পারেন নি। কেবল এক ঐতিহাসিক

চেতনার সূত্রে তাঁর সকল রচনাকে অনুস্যুত করবেন পরিকল্পনা করে ফেলেছিলেন মাত্র। বস্তুত তখনও এই বিশাল শিল্প-কর্মের যৎসামান্যই রচিত হয়েছে। বলা যায় পরবর্তী কালে যা বিশ্ব-সাহিত্যের আঙ্গিনায় শাখায় পল্লবে বহু বিস্তৃত হয়ে মহা মহীরুহে পরিণতি লাভ করবে, সেদিন তা কেবল অঙ্কুর মাত্র। সেই অঙ্কুরের মধ্যে ভবিষ্যতের মহীরুহকে আবিষ্কার করতে পেরেছিল বালজাকের লোকোত্তর প্রতিভা। আর আবিষ্কার মাত্র সেই সেদিনের পরম দারিদ্র্যের মধ্যেও গর্বে বুক ফুলে উঠেছিল বালজাকের। মনে হয়েছিল, এ পৃথিবীতে তাঁর ভূমিষ্ঠ হওয়ার প্রয়োজন যেন তিনি জেনে গিয়েছেন। মনে হয়েছিল, এমন এক দুরুহতম কর্তব্য সম্পন্ন করার সংকল্প নিয়ে বেঁচে থাকাই আসলে যথার্থ বাঁচা।

পূর্বেই বলেছি, বালজাকের নানাবিধ শখ ছিল—বিলাসিতার শখ, সৌখিন হওয়ার শখ, কৌতূহলের বিবিধ অকেজো সুন্দর জিনিস কেনার শখ। সে শখের কেনা একটি ছিল তাঁর এক গাছা মোটা ছড়ি। সোনায় বাঁধানো সে ছড়ির মাথায় খোদাই করা ছিল এক তুর্কী সম্রাটের বাণী: "আমি সর্ববিপদ-বিজয়ী পুরুষ।" সেই বিখ্যাত ছড়িখানি হাতে নিয়ে বালজাক সেদিন ছুটে এলেন তাঁর বোনের কাছে। বালজাকের মাথায় অভিনব কোন পরিকল্পনা এলে চিরকাল তিনি দূরে থাকলে চিঠি লিখেছেন, কাছে থাকলে সব আগে ছুটে গিয়েছেন তাঁর এই প্রিয় বোনটির কাছে। এখনও রুদ্ধশ্বাসে ছুটে এসে সামনে দাঁড়ালেন, চিৎকার করে বলে উঠলেন—"আমাকে সম্বর্ধনা কর বোন, সম্বর্ধনা কর, আমি এক লোকোত্তর প্রতিভা হতে চলেছি।"

এ খবর জানিয়ে তিনি সেদিন তাঁর এক বন্ধুকে লিখেছিলেন, "আমার সমগ্র রচনা মিলিয়ে বই হবে একটাই আর সে একখানা বই হবে একটা যুগের এক মহা নাটক, তাতে চরিত্র থাকবে পাঁচ হাজার। এমন একটা নাটকের নাট্যকার স্বয়ং আমি—তোমার বন্ধু বালজাক। তোমার কি গর্ব হয় না ভাই।"

নিজের ভিতরে নিজের প্রতিভা সম্পর্কে যখন এই পরিপূর্ণ বিশ্বাস এসেছে—তিনি কী পারেন, কী জন্যে জন্মেছেন যখন জানলেন তখন নিজের নামের আগে আভিজাত্যের স্মারক 'দ্য' শব্দটি বসালেন। ১৮৩১ থেকে তিনি স্বাক্ষর করতে শুরু করলেন অনরে দ্য বালজাক বলে।

উচ্চাভিলাষী পিতা ফ্রাঁসোআ উচ্চ মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সামিল হওয়ার আকাঙ্ক্ষায় তাঁর কৃষক পদবী বালসা কেটে করে ছিলেন বালজাক। তাঁর দুরাকাঙ্ক্ষী পুত্র প্রতিভা ও প্রতিপত্তির শীর্ষে উঠবার স্বপ্ন দেখতে দেখতে নিজের নামের আগে

শ্রেষ্ঠ সামাজিক পরিচয় দ্য বসালেন। শুধু বসালেন না, ঘোষণা করলেন, দ্য বসানোর একতিয়ার তাঁর আছে। কেননা তিনি নাকি প্রাচীন নাইট বংশের শিরোমণি দাঁত্রাজ পরিবারের অধস্তন উত্তর পুরুষ। বালজাক যখন জুড়ি-গাড়ি কিনলেন তখন সে গাড়ির গায়েও সেঁটে দিলেন দাঁত্রাজ পরিবারের প্রতীক চিহ্ন। সেদিন মানুষ জ্র কুঁচকেছে, বিদ্রূপ করেছে। এক বালখিল্য মানুষের চাঁদে হাত দেওয়ার ঔদ্ধত্য দেখে তাদের মধ্যে হাসাহাসির অন্ত ছিল না। সে হাসি-মসকরার উত্তরে তিনি কেবল নির্বিকারে ঠোঁট উলটেছেন, বলেছেন, ,'আমার জন্মের রেজস্ট্রি দেখগে, দেখবে সেখানেও আমার নাম লেখা আছে অনরে দ্য বালজাক। কিন্তু সে যে নির্জলা মিথ্যে ইতিহাসই তার সাক্ষী। ইতিহাসের সে সাক্ষ্য ও সমকালের সে বিদ্রূপ সত্ত্বেও তবু সেই অলোকসামান্য প্রতিভার মানুষটির ঠুনকো আভিজাত্য-লোলুপতাকে ঘৃণা করেনি পরবর্তী কালের মানুষ। উত্তর কাল বরং সেই মিথ্যে উপাধিকেই সত্য বলে স্বীকার করে নিয়েছে। অথবা তারা জানতে চায়নি, নিঃসন্দেহে বিশ্বাস করেছে অভিজাত পরিবারের বুদ্ধিজীবী ঐতিহ্যের ধারা তাঁর রক্তে ছিল বলেই যেন বালজাকের পক্ষে এমন চিরকালের প্রতিভা হওয়া সম্ভব হয়েছে।

১৮৩০-১৮৪২ এই বারো বছরে টাকার জন্যে নানা দৈনিক সাময়িক কাগজে হাজার রকম লেখা এবং কিছু দিন একটা সাহিত্য পত্রিকার সম্পাদনা ছাড়াও বালজাক উনত্রিশখানা উপন্যাস লিখেছিলেন। তারও আটবছর পরে বালজাক মারা যান তখন তাঁর বয়স একান্ন, তখনও "কমেদি য়ুমেন" শেষ হয়নি; কিন্তু ততদিনে তাঁর উপন্যাসের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ছিয়ানব্বই খানা। তার মধ্যে চরিত্র সংখ্যা প্রায় আড়াই হাজার।

বালজাকের আপন সৃষ্টির সে এক বিশাল পৃথিবী। ইতিহাস রাজনীতি ধর্ম দর্শন মানুষের রক্তমাংসের ক্ষুধায় মিলে-মিশে সেখানে একটা গোটা সভ্যতাই যেন আবারকরে জন্ম নিয়েছে। সে পৃথিবীর ইতিহাস স্বভাবতই তদানীন্তন ফ্রান্সের ইতিহাস—রাষ্ট্রবিপ্লব, নেপোলেওঁর সাম্রাজ্য বিস্তার আর নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্রের সংকট .সংঘর্ষ। রাজনীতিও তাই—রাজতান্ত্রিক রাজনীতি। বালজাকের সে পৃথিবীর ধর্ম উদার পন্থী ক্যাথলিকের, তাতে গোড়ামির অন্ধ আবেগ নেই। আর তার দর্শন বাস্তবভিত্তিক কেবল সঙ্গে কিঞ্চিৎ সূক্ষ্ম বিদ্রূপের রং মাখানো। সে পৃথিবীতে রক্ত মাংসের ক্ষুধা বার বার তীব্র তাড়নায় অস্থির হয়ে উঠেছে কিন্তু কামনার সে রোমান্সে সমকালীন অকালটিজম-এর প্রভাব কখনো দীর্ঘ ছায়া ফেলতে পারেনি।

'তাঁর বই পড়তে পড়তে কষ্টের শব্দ উচ্চারণ করবেনা এমন মানুষ কম", বলেছেন তাইন। তিনি লিখেছেন, "তাঁর রচনা রীতি অতি ভাবভারাক্রান্ত এক জটিল শিল্প-শৈলী। সেখানে চিন্তাগুলি বারংবার পরস্পরের সঙ্গে জট পাকিয়ে গেছে, নানা ভাবনার ভীড়ের মধ্যে তারা ক্রমাগত আড়ষ্ট হয়ে উঠেছে......তবু তারই মধ্যে থেকে প্রচণ্ড প্রাণ শক্তি নিয়ে আত্মপ্রকাশ করেছে অসংখ্য চরিত্র। জীবনে আমরা হামেশা যাদের মুখোমুখি হই, ওই সব চরিত্রের ঘৃণা হিংসা ধিকার বিকৃতি ও ক্ষুধা তাদের থেকে অনেক বেশী বাঙ্ময় ও বলিষ্ঠ। এই সব চরিত্রের অধিকাংশই নামে মানুষ, জাতে কীট পতঙ্গ। তারা কেউ বীভৎস উকুন, কেউ বিষাক্ত বোলতা, কেউ হিংস্র মাকড়। সভ্যতার আস্তাকুঁড়ে তাদের জন্ম, সেখানেই তারা বাঁচছে, বাড়ছে —খুঁড়ছে, ছিঁড়ছে, গিলছে, ঢিবি করছে। আর সেই সব—সমস্তর উর্ধ্বে স্বর্ণ, শক্তি, শিল্প, বিজ্ঞান ও ঐতিহ্যের ষড়যন্ত্রে উন্মেলিত হয়েছে আর এক বিষণ্ণ দুঃস্বপ্নের আশ্চর্য এক রূপকথার দেশ।"

বালজাকের সাহিত্য সম্পর্কে তাইনের এই উক্তি এক কথায় চরম সত্য ও পরম সুন্দর। কিন্তু সেই সত্য ও সুন্দর ভাষণ থেকে একটি বড় প্রয়োজনীয় কথা কেমন করে যেন বাদ পড়ে গেছে। সে অনুল্লেখিত কথাটি যোগ করে দিয়েছেন বোদলেয়ার: বালজাক সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন, "......in Balzac even the porters have genius." বালজাকের দরদী হৃদয়ের রচনায় একটা কুলির চরিত্রও অবহেলিত হয়নি। আপন যোগ্যতায় তারা যথাস্থানে সার্থক হয়ে উঠেছে।

'কমেদি য়ুমেন'-এর নামে প্রত্যেক লেখকেরই মাথা আপনা থেকে নত হয়ে আসে। জর্জ মুর লিখেছেন, "আমি যখন এই ধ্বনি-মধুর নামটি প্রথম শুনেছি, আমার চোখের সামনে এক রহস্যময় বেগুনী রংয়ের আকাশ আর তার নিচে বহু মানুষের কোলাহলে মুখর এক নগর ভেসে উঠেছে।"

জর্জ মুরের এই রহস্যময় বেগুনী রং আনাতোল ফ্রাঁসের কাছে দেখা দিয়েছে নরকের আগুন হয়ে। তিনি ভয়ে কেঁপে উঠেছেন। তাঁর ভাষার ভাবখানা এই যেন বালজাক একজন কাপালিক, তাঁর সাহিত্য নারকীয়। আনাতোল ফ্রাঁস আরো বলেছেন, "তিনি যে বিশাল নারকীয় জগৎ কল্পনা করেছিলেন আজ আমরা তা মর্মে মর্মে অনুভব করছি।...বালজাক শয়তানের রাজা। তাঁর সৃষ্টির রাজত্বে তিনি একেশ্বর। তাঁর সঙ্গে কারো তুলনা চলে না।"

আর সেই নরকের আগুনে কার্ল মার্ক্স পুড়তে দেখেছেন ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্র-

কাঠামোকে। মার্ক্স বলেছেন, ধনবৈষম্যের রাষ্ট্র ও পরাশ্রয়ী অভিজাত সমাজের অনিবার্য অবক্ষয় বালজাকের আগে এমন স্বচ্ছ চোখে আর কেউ দেখেনি। এ অবক্ষয়ের মূল কোথায়, হেতু কী তাঁর আগে এমন নিপুণ বিশ্লেষণ করেও কেউ দেখায়নি।

অ্যাঙ্গেলস বলেছেন, "আমি পেশাদার ঐতিহাসিক, অর্থনৈতিক পরিসংখ্যানবিদ প্রভৃতির বহু মূল্যবান রচনা অনেকবার করে পড়েছি। কিন্তু এঁদের কাছ থেকে আমি যা শিখেছি তার থেকে ঢের ঢের বেশী শিখেছি বালজাকের উপন্যাস পড়ে।"

বালজাক কিন্তু কাউকে কিছু দেখাতে চান নি, শেখাতে চান নি। তিনি দারুণ দহনে জ্বলে উঠে লেখার মধ্যে দিয়ে নিজের অক্ষম আক্রোশ মেটাতে চেয়েছেন কেবল।

তবু দেখেছে ও শিখেছে—শুধু উনবিংশ শতকের মণীষী মানুষরা নয়, এই বিংশ শতকের ছ' সাতের দশকের তরুণ বুদ্ধিরাও। আজকের সার্ত্র, ক্যেমু বেকেট গ্রোবগ্রিয়ে প্রভাবিত বুদ্ধিজীবী ফরাসী-তরুণদের মধ্যে এখন বালজাকের প্রবল প্রভাব। যে-যন্ত্রণার ভীষণ শিখার দহনে বালজাক পুড়ে মরেছেন সে যন্ত্রণার—ধনবৈষম্য, অন্তঃসারশূন্য আভিজাত্য—মানবীয় গুণ বিকাশের নানাবিধ বাধার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করতে আজ তারা বালজাকের পায়ে তাদের নেতৃত্ব অর্পণ করেছে। সমাজকে বাদ দিয়ে ব্যক্তি-অস্তিত্ব ভাবা যায় না, ব্যক্তি-অস্তিত্ব জীবিত রাখা যায় না। একটা ঘূণ-ধরা পচা সমাজের শরিকানার যন্ত্রণায় উন্মত্ত আজকের ফরাসী তরুণ বালজাকের কাছে সান্ত্বনা চায়, নেতৃত্ব চায়। কিন্তু সেকথা থাক। যা বলছিলাম:

বালজাক যখন জগৎ ও জীবনের প্রতি বিপন্ন-আক্রোশে নিজেকে ক্রমাগত দগ্ধ করছেন, ও সে দহন জ্বালায় অস্থির তিনি মর্মান্তিক রচনার পিরামিড তৈরি করছেন তখন তাঁর জীবনে আসেন আর এক রমণী। অভিজাত এক অতিবিখ্যাত পোলিশ পরিবারের গৃহিণী এই ধনী সুন্দরীর নাম মাদাম ইভা দ্য হানস্কা। বালজাকের জীবনে তিনি আর এক যন্ত্রণার তীব্র সুখের আগুন।

বালজাকের খ্যাতি তখন শুধু শহর পারীতে সীমাবদ্ধ নয়, সে খ্যাতি ফ্রান্সের চৌহদ্দিও ছাড়িয়ে গেছে, ছড়িয়ে পড়তে শুরু করেছে য়ুরোপের বিভিন্ন শহরে। কিন্তু সেদিন বালজাকের অতিবড় দুরাশার কল্পনাও অনুমান করতে পারেনি, তাঁর সে খ্যাতি নগর-সভ্যতা থেকে বহুদূরে মজুর-কৃষক-ক্রীতদাস-অধ্যুষিত গহন নীল

বনরাজি বেষ্টিত বিস্তীর্ণ শস্যক্ষেত্রের দেশ য়ুক্রেনে পর্যন্ত গিয়ে পৌঁচেছে,—নিঃসঙ্গতায় নির্বাসিত সেখানকার এক বিদুষী মহিলার অলস মুহূর্তগুলি ব্যাপ্ত করে তাঁর রহস্যময় নিবিড় ছায়া নিঃশব্দে সঞ্চারিত হয়েছে। বালজাকের অন্তরবিদারী রচনা-শৈলীতে মুগ্ধ সেই মহিলা, নারীর প্রতি বালজাকের নিষ্ঠুর বিদ্রূপ ও কৌতুকে ক্ষুব্ধ অপ্রসন্ন হয়ে এই অপরিচিত লেখককে স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে একখানি দীর্ঘ পত্র লেখেন। এই নিষ্কলঙ্ক পত্রখানি থেকেই মাদাম দ্য হানস্কার কলঙ্কিত জীবনের পথে যন্ত্রণার যাত্রা শুরু।

তখনও মাদাম বেরনি বেঁচে আছেন। তখনও তিনি বালজাকের ক্ষত-লাঞ্ছিত জীবনের কল্যাণময়ী সেবিকা; তাঁর যন্ত্রণার শান্তি, দুঃখের সান্ত্বনা। কিন্তু ততদিনে প্রৌঢ়া মাদাম বেরনি আর দুরন্ত-যৌবন বালজাকের শয্যাসঙ্গিনী নন। সে স্থান তাঁর অজ্ঞাতে অনেকে নিয়েছেন—অভিজাত সমাজের সে গৃহবনিতারা সংখ্যায় শুধু একাধিক নন, বহু। সে বহুর সঙ্গে আরও সংখ্যা, নিত্য নতুন সংখ্যা যুক্ত হচ্ছে। তেমনি দুই নতুনের বার্তা এনেছিল ১৮৩২-এর ২৮ ফেব্রুআরি। প্রথম পত্রখানা পড়েই বালজাক সেদিনের ডাকের অন্য সমস্ত চিঠিপত্র একপাশে ঠেলে সরিয়ে রাখলেন। মাদাম দ্য কাস্ত্রির পত্রখানা তাঁর হাতেঃ বালজাকের জন্যে তিনি তাঁর পালে দ্য কাস্তেলান-এ অপেক্ষা করবেন। বালজাকের অবশ্যি আসা চাই। বালজাকের গুণমুগ্ধ অভিজাত এই রমণীর প্রথম আহ্বান উপেক্ষা করবেন বালজাক সে পাত্র নন। অতএব ওই ২৮ ফেব্রুআরির অন্যান্য চিঠিপত্রের সঙ্গে মাদাম দ্য হানস্কার মোটা খামখানাও অপঠিত পড়ে থাকল; বালজাক ছুটে এলেন মাদাম দ্য কাস্ত্রির আমন্ত্রণ রক্ষা করতে। সেই প্রথমদিন থেকেই দুজনের মধ্যে অন্তরঙ্গ ঘনিষ্ঠতা গড়ে উঠতে থাকল আশাতীত দ্রুত গতিতে।

কিন্তু সে কুহকিনীর লক্ষ্য ছিল অন্যত্র। তিনি বালজাকের প্রকৃত প্রণয়িনী হতে আসেননি। তিনি বালজাকের প্রতিভার প্রেরণা জোগাতে কি তাঁর অস্থির কষ্টের জীবনে শান্তির সান্ত্বনা আনতে কখনো আগ্রহী ছিলেন না। বরং নিয়ত প্রলুব্ধ করেও তাঁর সুন্দর দেহের প্রতি বালজাকের লোভকে অত্যন্ত কৌশলে ঠেকিয়ে রেখেছেন। আসলে ওই বেটে মোটা বেঢপ মানুষটির শারীরসান্নিধ্য তাঁর পছন্দ ছিলনা। তিনি প্রশ্রয় দিতেন প্রণয়ের অভিনয় করতেন কেননা তাঁর এক দূর-লক্ষ্য বাসনা ছিলঃ ওই প্রতিভার নামের সঙ্গে নিজের নাম যুক্ত করে বিখ্যাত হবেন। ফলত বালজাক মাদাম কাস্ত্রির সান্নিধ্যে এসে কেবলই নিজের কষ্ট বাড়িয়েছেন, সান্ত্বনা কি শান্তি পাননি এতটুকু। অনেক দেরিতে হলেও মাদাম কাস্ত্রির এ

মিথ্যার ছলনা তিনি বুঝতে পেরেছিলেন ও হঠাৎ একদিন সব সম্পর্ক ছিন্নও করে ফেলেছিলেন।

কিন্তু 'লেত্রাঁজের' (জনৈকা অপরিচিতা) স্বাক্ষরিত পত্র থেকে যার শুরু তা তাঁর জীবন থাকতে শেষ হয়নি। সে নিষ্কলুষ পত্রখানাকে বেষ্টন করে ধীরে ধীরে প্রেমের যে আগুন জ্বলে উঠেছিল সে আগুনে বালজাক শেষমেশ নিজেকেই পূর্ণাহুতি দিয়েছিলেন।

না ছিল কী! ফ্রান্সের ফারনিচার, চীনের পোরসেলিন, পারস্যের কারপেট, ইংলণ্ডের সিলভার প্লেট; বিখ্যাত শিল্পীর নানাবিধ মূল্যবান চিত্র, সুনির্বাচিত বইয়ের বিরাট লাইব্রেরি। তার ওপরে রাজপ্রাসাদের মতন বাড়িতে বিলাসের সমস্ত সামগ্রী—গাড়ি, শ্লেজ, ঘোড়া, কয়েক হাজার ক্রীতদাস এবং বিস্তীর্ণ জমিদারী ব্যাপী কৃষক মজুর প্রজাপুঞ্জ। ছ'টি সন্তানের জননী। তাঁর পাঁচটিই শৈশবে মারা গেছে। এখন সবে ধন নীলমণি ছোট এক মেয়ে, কথা বলতে সেই মেয়ের সুইস গভর্নেস সমবয়সী মাদ্‌মোআজেল আঁরিয়েৎ বরেল আছেন, তা ছাড়া সময় কাটানোর জন্যে আছে আরও দুটি সঙ্গিনী। সর্বোপরি ফ্রান্সের বিখ্যাত প্রকাশক-সংস্থা নিয়মিত সদ্য প্রকাশিত গল্প উপন্যাস সাময়িক পত্র পত্রিকা পাঠায়। এত সত্ত্বেও অলস সময় পাষাণের বোঝার মতন চেপে থাকে। রুশো-পোলিশ ব্যারন ওয়েনসল্লাভ হানস্কির তিরিশ বছরের স্থির-যৌবনা বিদুষী স্ত্রী যেন কবরের জীবন যাপন করেন। পোলিশ অভিজাত পরিবারের উচ্চ শিক্ষিতা এ মহিলা একদা সুন্দরী বলে খ্যাত ছিলেন। সেই রূপের খ্যাতিই নিকটে টেনে এনেছিল দূরের ব্যারনকে। ফরাসী ইংরেজী জর্মন ভাষায় সমান সুদক্ষা সাহিত্য রসিকা এই মধুর আলাপচারিণীর সঙ্গে মিশে তিনি মুগ্ধ হয়েছিলেন, তাঁকে বিয়ে করেছিলেন। তখনও ইভলিন জানতেন না এই বিয়ে আসলে চির দিনের এক নির্বাসন দণ্ড। য়ুক্রেনের ভেহিলনিয়ার গ্রামে এক নিশ্চুপ প্রাসাদ-অলিন্দে দাঁড়িয়ে সমস্ত শীত কেবল দেখেন তুষার-বর্ষণ, আর শীতোত্তীর্ণ সমস্ত কালটা সবুজ শস্যক্ষেত্র ও নীল অরণ্য। দেখে দেখে দৃষ্টি ক্লান্ত হয়, তখন বই বা পত্রিকা নিয়ে বসেন। পড়তে পড়তে মন অবসন্ন হয়, তখন সঙ্গিনীদের সঙ্গে বই পত্রিকার বিষয় নিয়ে আলোচনায় মাতেন। আগামী ডাক আসা অবধি চুল-চেরা বিচার চলে, ক্ষমাহীন সমালোচনা। আত্মীয়-স্বজন কেউ কখনো বেড়াতে এলে তাঁরাও সে বৈঠকে যোগ দেন। স্বামী বসে বসে শোনেন।

ইভলিন থেকে তিনি পঁচিশ বছরের বড়। পঞ্চাশ পেরিয়ে তিনি যেন অতিবৃদ্ধ এখন। এই য়ুক্রেনের মতনই নিরুত্তাপ শীতল। শিকার ভাল লাগেনা। জুয়া পছন্দ করেন না। মদও খাননা বেশী। ভেহিলনিয়ার আশেপাশে ছড়ানো ছিটোনো যে কিছু সংখ্যক বর্ধিষ্ণু মানুষ আছে, যাদের সঙ্গে মেলামেশা করলেও করতে পারেন তাদের ধারে কাছেও যাননা। ক্ষেত-খামার জমিদারী দেখার স্পৃহাও সামান্য। বংশানুক্রমে এমন অগাধ ধনসম্পদের পাহাড় জমেছে যে আর বাড়ানোর আগ্রহ নেই। তাই তাঁরও দিন আলস্যের গভীরে নিস্তেজ; কিন্তু সেইটে তাঁর স্বভাবের সঙ্গে একাঙ্গ হয়ে মিশে গিয়েছে বলে কোন অভিযোগ ছিল না। কিন্তু ভিতরে ভিতরে অসহিষ্ণু অপ্রসন্ন ছিলেন ইভলিন। তাঁরই তাড়নায় তিন-চার বছরে একবার য়ুরোপ বেড়াতে বেরোন। চার ছ'মাস ঘুরে আসেন কি আরও বেশীদিন। ভ্রমণের ওই উজ্জ্বল রোদ ও বর্ণসমারোহের দিনগুলিতে যে নতুন প্রাণের সঞ্চয় ইভলিন বহন করে আনতেন ফিরে এসে তারই প্রেরণায় নিজেকে জীইয়ে রাখতেন আর একবার বেড়াতে বেরোনোর আগে পর্যন্ত।

মাদাম দ্য হানস্কার ম্রিয়মান সেই প্রাণের প্রদীপ ১৮৩১-এর এক শীতে উৎসাহের প্রবল শিখায় জলে উঠল।

বালজাক নামে আধুনিক ফ্রান্সের এক শক্তিমান তরুণ লেখকের তিন-তিনখানা বই-ই তিনি ও তাঁর তিনসঙ্গিনী কয়েক দিনের মধ্যে রুদ্ধশ্বাসে শেষ করেছেন। শেষ করে শেষে সেকি তাদের উত্তেজনা আর যন্ত্রণা! আলোচনা-বৈঠকে তর্কের তুফান বইতে লাগল। য়ুক্রেনের অলস অর্ধমৃত জীবনে প্রাণের জোয়ার বইয়ে দিয়েছেন বালজাক।

এই নতুন লেখকটির স্বচ্ছ গভীর অন্তর্দৃষ্টিতে মাদাম হানস্কা মুগ্ধ; কিন্তু তবু তাঁর ওপরে অসন্তোষেরও অবধি নেই তাঁর। তিনি সব প্রথমে পড়েছেন 'সেন দ্য লা ভি প্রিভে' ব্যক্তিগত জীবন থেকে নির্বাচিত দৃশ্যের এই বইখানা তাঁকে প্রায় পাগলা করে দিলে। নিঃসঙ্গ স্বপ্নভঙ্গ নারীর আত্মার কান্না, তার ভুল ও দুর্বলতা কী অসীম মমতায় উন্মোচিত করেছেন লেখক। এমন লেখা আজ পর্যন্ত কেউ লিখতে পারেনি। এ লেখার সঙ্গে কারো তুলনা হয়না। তুলনা নেই 'লা পো দ্য শ্যাগ্রাঁ' উপন্যাসখানিরও। প্রতিভার কী ভাস্বর স্বাক্ষর বইখানি! কিন্তু না, প্রতিভা হলেই কী তাঁর যা খুশী করবার অধিকার আছে! এমন সুন্দর তরুণ এক নায়ক কিনা পবিত্র মনের প্রিয়দর্শিনী তরুণী পলিনকে ত্যাগ করে এক সোসাইটি

ককেট কাউনটেসের প্রেমে মজে গেল! আর স্বয়ং লেখকই কিনা শেষমেশ মেতে উঠলেন 'ফিজিওলজি দ্যু মারিআজ' এর মতন বিশ্রী বই লিখতে! ছি ছি, কী ঘেন্না, এমন মহৎ ভাবনার লেখক কিনা নারীর যৌনজীবন নিয়ে কেচ্ছা কেত্তনের মহড়ায় মেতে উঠলেন! এ কী কুৎসিত নিন্দা ঘৃণা ছড়ালেন তিনি! নারী কী শুধু সেক্স, শুধু খেলনা—এত তুচ্ছ এত ঠুনকো?

মাদাম ইভা দ্য হানস্কার আর সহ্য হলনা। শেষমেশ তিনি বলেই ফেললেন—"যাই বল, এর একটা প্রতিকার করা দরকার। লেখককে বোঝানো দরকার: তাঁর উচিত 'সেন দ্য লা ভি প্রিভে'-র মতন মহৎ রচনায় নিবদ্ধ থাকা। এ পরামর্শ প্রত্যেক শিক্ষিত মহিলারই দেওয়া উচিত তাঁকে। কারো না কারোর তাঁকে ঠিক পথে চালানোর দায়িত্ব নেওয়া উচিত।"

—"বেশ আমরাই সে দায়িত্ব নেই না কেন, আমরাই একটা চিঠি লিখিনা তাকে?" দুজন সমস্বরে বলে উঠলেন। একজন বাধা দিলেন, "সে হয় নাকি? মসিঁয়ে হানস্কি কী ভাববেন তাহলে? মেয়েমানুষের চরিত্র নিয়ে যে অমন কেচ্ছা করতে পারে মাদাম হানস্কার চিঠি নিয়ে সে কী কেলেঙ্কারী করবে কে জানে!"

তবু শেষ পর্যন্ত নারীর কৌতূহলই জয়ী হল। মেয়েরা সকলে মিলে পরামর্শ করে দীর্ঘ একখানা পত্র লিখলেন। তার তলায় সম্মিলিত ছদ্মনাম লিখলেন 'দিঈস ইগনোতিস' (আননোন গডস—যাঁরা বালজাকের আত্মাকে কলুষমুক্ত রাখতে চান।) এই পত্রখানাই এসে পৌঁচেছিল বালজাকের হাতে সেই ২৮ ফেবরুআরি ১৮৩২।

আজকাল হামেশাই বালজাকের কাছে মোটা মোটা খামে পাঠিকাদের কাছ থেকে উচ্ছ্বাসের, আত্মসমর্পণের, চিঠি আসে। এগুলি এখন আর তাঁকে উত্তেজিত করেনা। পরম উদাসীনের মতন তিনি পত্রখানা পড়তে শুরু করেছিলেন। পড়তে পড়তে কিন্তু তাঁর ঔদাসিন্য ঘুচে গেল, অবশেষে বিস্ময়ে তিনি অস্থির হয়ে উঠলেন।

এতদিন তাঁর গুণমুগ্ধাদের যত চিঠি এসেছে সবই প্রায় এই পারী শহর থেকে। দূরের চিঠি যা দু'চারখানা এসেছে তাও ফ্রান্সেরই কোন শহর বা কাউন্টি থেকে। তাঁর রচনা যে ফ্রান্সের সীমা পেরিয়ে রাশিয়ায়—রাশিয়ার যুক্রেন পর্যন্ত পৌছতে পারে, সেখানেও তাঁর গুণগ্রাহিণী থাকতে পারে এ তাঁর কল্পনার অতীত। অবশ্য সেই প্রায় একই সময়ে ওয়াইমারে বসে গ্যোতেও যে তাঁর 'লা পো দ্য শ্যাগ্রাঁ' নিয়ে একেরমান-এর সঙ্গে উত্তেজিত সমালোচনায় মেতে উঠেছেন সে খবর তাঁর অজ্ঞাত। তিনি তখন "দিঈস ইগনোতিস" স্বাক্ষরিত পত্রখানি নিয়ে মগ্ন। যুক্রেনের মতন

জায়গায় বসে যিনি ফ্রান্সে সন্ত প্রকাশিত বই কেনেন নিঃসন্দেহে তিনি বিরাট ধনী। চিঠি পড়ে মনে হয় ফরাসী ভাষায় লেখিকার অসাধারণ দখল। আর ভাষার ছাঁদ ও স্বর থেকে ভাবতে ভাল লাগে লেখিকা কোন এক উচ্চ অভিজাত বংশের সুন্দরী। বালজাকের কল্পনার চোখে এক রাজকন্যার মূর্তি ভেসে উঠল। এমন মানুষের পত্রের উত্তর দিতে তিনি কোন দিনই দেরি করেন না। কিন্তু এ চিঠির জবাব দেবেন কোথায়? লেখিকা নাম প্রকাশ করেন নি। পত্রের কোথাও তার ক্ষীণতম ইঙ্গিতও নেই। বোঝাই যাচ্ছে এই নারী তাঁর কাছে দূরের নক্ষত্র হয়ে থাকতে চান। ধরা দিতে চান না। বালজাকের এ অনুমান সত্য করে প্রথম চিঠির অব্যবহিত পরেই আবার চিঠি এল, তাতে স্পষ্ট করেই লেখিকা লিখলেন: "...আপনার কাছে আমি অপরিচিতা। চিরদিনই অপরিচিতা থাকব। আপনি কখনোই জানতে পারবেন না, আমি কে?" ...তবে? কী করে তিনি প্রাপ্তি-স্বীকার করবেন, ধন্যবাদ জানাবেন? হঠাৎ মাথায় একটা বুদ্ধি এল বালজাকের। তখন তাঁর "সিন দ্য লা ভি প্রিভে"র দ্বিতীয় সংস্করণ ছাপা হচ্ছে। তিনি প্রেসকে লিখে দিলেন, এ সংস্করণের উৎসর্গ পত্রে লেখা থাকবে 'দিঈস ইগনোতিস' তলায় থাকবে তারিখ—২৮ ফেবরুআরি ১৮৩২।

মাদাম বেরনি তখনও বালজাকের দফতরের দায়িত্ব নিয়ে আছেন। তিনি বালজাকের সব লেখার প্রুফ দেখেন। ব্যবসা সংক্রান্ত চিঠিপত্র পড়েন, জবাব দেন। ব্যক্তিগত পত্রগুলিও চেষ্টা করেন দেখে শুনে বালজাকের হাতে দিতে। বালজাকের জীবনীকারদের বিশ্বাস 'দিঈস ইগনোতিস' স্বাক্ষরিত পত্রখানাও তিনি দেখেছিলেন, হয়ত ভেবেছিলেন, খুব উচ্ছ্বাসের চিঠি হলেও দূর য়ুক্রেনবাসিনীর এ চিঠি বালজাককে বিশেষ বিচলিত করবে না; কিন্তু টাইটেল পেজ-এর প্রুফ-এ 'দিঈস ইগনোতিস' এবং তার তলায় ২৮ ফেবরুআরি দেখে নিশ্চয় তিনি সচকিত হয়েছিলেন, ঈর্ষান্বিত হয়েছিলেন, অথবা বালজাকের চিরকালের শুভানুধ্যায়িনী এই রমণী ভেবেছিলেন, এই গোপনচারিণী একদিন বালজাকের সাহিত্য-সাধনায় বিঘ্ন ঘটাবে—যে জন্যেই হোক উৎসর্গ-পত্র থেকে মাদাম বেরনি ওটি বাতিল করে দেন এবং চিঠিখানাও আর পাওয়া যায় না। অতএব সে চিঠিতে মাদাম দ্য হানস্কা ও তাঁর তিন সঙ্গিনী মিলে কী লিখেছিলেন কেউ জানে না। মাদাম হানস্কা জানলেন না: তাঁর চিঠি যথা সময়ে যথাস্থানে পৌঁছে ছিল কিনা ও বালজাক তার কী স্বীকৃতি দিয়েছিলেন।

অবশ্য স্বীকৃতির বিন্দুমাত্র আশা মনে না রেখেই লিখেছিলেন দামাম দ্য হানস্কা। অবসর যাপনের একটা অভিনব উপায় আবিষ্কার করে তিনি আর তাঁর তিন সঙ্গিনী

মতে উঠেছিলেন। চারজনে পরামর্শ করে প্রথম চিঠির অব্যবহিত পরেই সামান্য সময়ের ব্যবধানে আরও তিনখানা চিঠি লিখলেন তাঁরা। আসলে লিখলেন মাদাম হানস্কাই ওঁরা কেবল সাক্ষী রইলেন। সে চিঠির তলায় এবার তিনি সাক্ষর করলেন 'লেত্রাঁজের'—জনৈকা অপরিচিতা।

তার একখানায় তিনি লিখলেন, "আপনার প্রতিভার দীপ্তিতে আমার চোখ ঝলসে গেছে। তবু আমি অনুরোধ করব সে প্রতিভায় যেন কোন কলঙ্কের স্পর্শ না লাগে; যেন না সে রাহুগ্রস্ত হয়। আর একখানাতে লিখেছিলেন, "আমি আপনার প্রতিভার গৌরব করি। আমি আপনার আত্মার প্রতি পরম শ্রদ্ধাশীল। আমি আপনার বোন হতে পারলে সুখী হতাম।"

বেশ বোঝা যায় 'দিঈস ইগনোতিস' স্বাক্ষরিত চিঠিখানার স্বরও 'লেত্রাঁজের স্বাক্ষরিত চিঠির মতনই শ্রদ্ধায় অবনত ও মমতায় স্নিগ্ধ ছিল। কিন্তু ক্রমশ তাতে কামনার উত্তাপ সঞ্চারিত হতে থাকে। ক্রমশ মাদাম হানস্কার নীল আকাশে বেগুনী রং ধরে, যেন কোথায় আগুন লেগেছে তার আরক্ত আভা।

ছয়

চিঠি লিখছি অথচ যাঁকে লিখছি তাঁর হাতে পৌচচ্ছে কিনা জানছি না, চিঠি পড়ে তিনি কী ভাবছেন, পছন্দ করছেন কি বিরক্ত হচ্ছেন, বুঝছি না—এমন অনিশ্চয়তার সংশয় নিয়ে কিছু আর বেশীদিন এ ধরণের একপেশে খেলায় মেতে থাকা যায় না, হোক্না সে খেলা যতই অভিনব আর অসম্ভব মজার।

অথচ চিঠির উত্তর পাওয়ায় বিঘ্ন আছে। বাইরের পুরুষের সঙ্গে ঘরের বউ-এর পত্র লেখালেখিতে কলঙ্ক রটনার ভয় থাকে। তার ওপরে স্বামী যদি হন কুলে-শীলে-ধনে অসম্ভব অভিজাত তবে সে ভয় আরো ভয়ানক। মর্যাদাহানির সে ভয় মাদাম হানস্কাকে কিছু দিন সংযত রাখল। কিন্তু মনের মধ্যে যদি একটা কৌতূহল ক্রমাগত উসখুস করে: এত যত্ন করে আর পরিশ্রম করে তিন চারটে চিঠি লিখলাম; চিঠিগুলির গতি কী হল জানলাম না।—সে কৌতূহল কেবলই যদি উসকানি দেয়: কেমন করে জানা যায়, ভাবো। তবে আর বেশীদিন কোন্ নারী সংযত থাকতে পারে!

প্রয়োজনই যে সব সময় আবিষ্কারের জননী তা নয়, কৌতূহলও সমান উর্বরা।

সেই দুরন্ত কৌতূহলের তাড়নায় মাদাম হানস্কাও একটা উপায় উদ্ভাবন করে ফেললেন। সঙ্গিনীদের সঙ্গে সলা করে বালজাককে একটা চিঠি পোস্ট করে দিলেন। লিখলেন: আপনাকে আমি চার-চারটে চিঠি দিয়েছি; সেগুলি আপনার হাতে পৌঁচেছে কিনা আমি জানি না। পৌঁছে থাকলে, জানিয়ে দয়া করে 'কোতিদিয়েন' পত্রিকায় একটা প্রাপ্তি সংবাদের বিজ্ঞাপন দিন। আমি আপনাকে চিঠি লিখেছি বলে বিরক্ত হয়েছেন কিনা, যদি আরও চিঠি লিখি বিরক্ত হবেন কিনা, অবশ্য জানাবেন। বিজ্ঞাপনের নিচে যেন উল্লেখ থাকে—*á. ĺ. e*···H. B.

১৮৩২-এর ৯ই ডিসেম্বর 'কোতিদিয়েন' কাগজের ব্যক্তিগত কলমে বিজ্ঞাপন বেরোল: মঁসিয়ে দ্য বি (বালজাক) তাঁকে লেখা সব পত্র যথাসময়ে পেয়েছেন। এবং এতদিন পরে তিনি আজ এ পত্রিকা মারফৎ সেসব পত্রের প্রাপ্তিসংবাদ জানানোর সুযোগ পেলেন। এটা তাঁর পক্ষে একটা পরিতাপের বিষয় যে, কোন্ ঠিকানায় পত্রের জবাব দিতে হবে তিনি জানেন না। *á. ĺ. e*···H. de. B

১৮৩৩-এর ৯ জানুআরি কাগজখানি য়ুক্রেনে পৌঁছলে মাদাম দ্য হানস্কা প্রবল সুখে জ্বলে উঠলেন, এবং তার আভিজাত্যের মর্যাদা অক্ষুণ্ণ রেখে অবৈধ পত্র বিনিময়ের মাধ্যম করলেন তাঁর শান্তশিষ্ট সুইস গভার্নেস আঁরিয়েৎ বরেলকে। এই নিভৃত পত্রালাপের সুযোগ পেয়ে দুজনেই আপন হৃদয়ের গোপন কথা সব উজাড় করে লিখতে শুরু করলেন। চার-পাঁচখানা পত্র বিনিময়ের পরেই বালজাক লিখলেন—ওগো অপরিচিতা, আমি তোমাকে ভালবাসি।······তোমাকে দেখার আগেই আমি তোমার অথৈ প্রেমে ডুবে গেছি।····তুমি যদি জানতে কী বিপুল আবেগ আমাকে টানছে তোমার দিকে···কতদিন ধরে তোমার জন্যে আকুল হয়ে অপেক্ষা করছি! আমি জানতাম না, এমন সর্বস্বপণ আত্মনিবেদনের শক্তি আমার আছে।···জেনে এই প্রথম আমি গভীর শান্তি পাচ্ছি।···আমার প্রিয়তমা জীবন-লক্ষ্মী।

প্রতি চিঠিতেই 'শুদ্ধপ্রেম', 'পরম সম্পদ', 'প্রিয়তমা জীবন-লক্ষ্মী' প্রভৃতি স্বর ছড়িয়ে থাকতে লাগল। সে সব মধুর স্বর ও সম্বোধন মাদাম হানস্কার মর্মে প্রবেশ করে এমনভাবে তাঁকে আকুল করে তুলল যে, তিনি তাঁর প্রেমিককে দেখবার জন্যে মনে মনে ভীষণ অস্থির হয়ে উঠলেন। সুযোগ এল সেই বছরেরই সেপ্টেম্বর মাসে। হানস্কি পরিবার য়ুরোপ ভ্রমণে বেরোলেন, বালজাকের কাছাকাছি হবে বলে ভ্রমণ তালিকায় ভিয়েনাও অন্তর্ভুক্ত হল। মাদাম হানস্কা লিখলেন, আমি ভিয়েনায় আসছি, তুমি ওখানে আমার সঙ্গে দেখা কর। বালজাকও এমন-ই একটি সুযোগের অপেক্ষা করছিলেন। তিনি ছুটে এলেন ভিয়েনায়। প্রেমিকের গুণে মন ভরেছিল

মাদাম হানস্কার কিন্তু রূপ দেখে বুঝি চোখ জুড়োল না বরং হৃদয় খানিকটা বিরূপ হল। যদিও বালজাক যেন সেসব বুঝেও গ্রাহ্য করলেন না, দুর্লভকে জয় করার জন্মগত প্রবল নেশা তাঁর, অত সহজে দমিত হন না তিনি। ঐশ্বর্যের অহংকারে, বুদ্ধির দীপ্তিতে, রূপের বিভায়, পরমাশ্চর্য তাঁর স্বপ্নের রাজকন্যাকে দেখে বালজাক অভিভূত হয়ে গেলেন। এবং তাঁর গুণে মুগ্ধ রূপসীর ওপরে তাঁর কুরূপের বিরূপ প্রভাব প্রতিভার জৌলুসে ম্লান করে দিতেও সক্ষম হলেন। অনুক্ষণ দাসদাসী সন্তান, সন্তানের গভার্নেস, সঙ্গিনী, স্বামী পরিবেষ্টিতা প্রণয়িনীকে একটি নিভৃত মুহূর্ত আবিষ্কার করতে প্ররোচিতও করতে পারলেন তিনি আর সেই দুর্লভ মুহূর্তে তাঁর সুদূরের নক্ষত্রকে ক্ষণকালের জন্যে বুকের ওপরেও অনুভব করতে পারলেন, তাঁর বিম্বাধরোষ্ঠে চুমুও খেতে পেলেন তিনি ; কিন্তু মাদাম হানস্কার মনের বিরূপতা যেন সবটুকু মুছল না। তাঁর যেন মনে হল এ মানুষটির সান্নিধ্য যতখানি মনোরম তার থেকে অনেক বেশী রমণীয় তার প্রেমপত্র। অবশ্য তিনি বালজাককে তাই বলে আহত করতে চান নি। তাঁর বঞ্চিত প্রেমের তৃষিত হৃদয় এমন অসামান্য প্রতিভার প্রাণে চিরদিনের আসন পেতে আন্তরিকভাবে আকুল হয়ে উঠেছিল। সে আকুলতা বালজাকের অ-প্রমিক সুলভ বেঢপ শরীর প্রতিনিবৃত্ত করতে পারেনি। ক্ষণিক মিলনের পরে দীর্ঘ বিচ্ছেদ সে আকাঙ্ক্ষাকে বরং পরে আরও বেশী তীব্র করে তুলেছিল। তবু তার তীব্রতা এত বেশী প্রবল ছিল না যে, তখনই তিনি কুল-মান-ধন পরিত্যাগ করে প্রেমিকের বুকে ঝাঁপিয়ে পড়বেন। তিনি কথা দিলেন, স্বামীর মৃত্যুর পরে তিনি তাঁর দেহ পেতে পারেন তার আগে তাঁর মন নিয়েই বালজাককে সুখী থাকতে হবে।

বালজাক সেই আশ্বাসেই তাঁর অস্থির জীবনের দিন গুণেছেন। য়ুক্রেনের আকাশের দিকে তাকিয়ে তিনি দূর নক্ষত্রের স্বপ্ন দেখতেন আর তার আলোর প্রার্থনায় পত্র ভরে তুলতেন। তবু বালজাকের মতন মানুষের পক্ষে সেই অলৌকিক স্বপ্নের আলস্যে মগ্ন থাকা কঠিন ছিল। যদিও তখন তাঁর খ্যাতি গোটা য়ুরোপে ব্যাপ্ত হয়েছে, তাঁর বইয়ের বিক্রি সমকালীন সব লেখককে ছাড়িয়ে গেছে তথাপি বেহিসেবী এই মানুষটির তাতে ঋণের বোঝা কমছে না, অপিচ ক্রমাগত বেড়ে চলেছে। অভিজাত সমাজের সঙ্গে সম্পর্ক রাখার দায় মেটাতে তিনি দৈনিক আঠারো ঘণ্টা অনলস পরিশ্রম করেও কুলিয়ে উঠতে পারেন না। ঋণের বোঝা বেড়েই চলে অধিকন্তু উত্তরোত্তর ভাল লেখার দায় বাড়ে। আর সেই সামর্থ্যের অতীত কঠোর শ্রমের ক্লান্তি জুড়োতে তিনি ছুটে যান তাঁর সহজলভ্য গুণমুগ্ধাদের

ফাছে। হানস্কার প্রেমে যখন তাঁর সমস্ত সত্তা মুগ্ধ আর্দ্র আচ্ছন্ন, তখন তিনি বারে বারে অনেক অঙ্কে শয্যা বিছিয়েছেন। ইতিমধ্যে কয়েকটি জারজ সন্তানের জনকও হয়ে পড়েছেন তিনি।

জনক হয়েছেন অবশ্যি অনেকগুলি অমর উপন্যাসেরও। তবু সেই ১৮৪১-এর ১০ নভেম্বর মঁসিয়ে গু হানস্কি মারা যাওয়ার আগে অবধি বালজাকের ওপর দিয়ে দুর্ভাগ্যের নির্মম ঝড়ও কম বয়ে যায় নি। একটা বছরের কথাই ধরা যাক। ১৮৩৬ সালের কথা। ১৮৩৫ সালে ফ্রান্সের সাহিত্য-জগতের এই দুর্দমনীয় সিসিফাস যখন খ্যাতির তুঙ্গ চূড়ায় ঠেলে তুলছেন তাঁর কঠোর শ্রমের ফসল, শেষ করেছেন 'লা দ্যুশেস দ্য লঁজে'; শতাধিক অনিদ্রার রাত জেগে সৃষ্টি করেছেন 'লা র‍্যশের্শ দ্য লাবসল্যু'; জুন থেকে জুলাইয়ের মধ্যে শেষ হয়েছে 'সেরাফিতা'; চল্লিশ দিনের মাথায় প্রকাশকের হাতে তুলে দিয়েছেন 'প্যের গোরিও'; ডিসেম্বরে 'লা ফাম দ্য ত্রাঁত্ অঁ' শেষ করেই হাত দিয়েছেন 'সেজার বিরোতো' আর 'ল্য লিস দাঁ লা ভালে' লেখায় এবং তার পরেও যখন কলম থামছে না, বিশ্রাম জানছে না শরীর-মন তখন অন্য দিকে তাঁর মাথার ওপরে সর্বনাশের মেঘ জমেছে ঘন হয়ে, চারদিক থেকে অন্ধকার করে ফেলেছে ভাগ্যের আকাশ।

প্রাকৃতিক দুর্যোগে যেমন কখনো কখনো দেখা যায়—চতুষ্পার্শ্ব থেকে এক যোগে প্রবল বাতাস উঠে একটা বিন্দুতে এসে আছড়ে পড়ে নির্মম তাণ্ডব শুরু করে দেয়, দুর্ভাগ্যের তেমনি এক প্রলয়ংকর ঝড় উঠল বালজাকের জীবনে। চারদিক থেকে তাঁর ওপরে সর্বনাশের হামলা এসে ঝাঁপিয়ে পড়ল। তাঁর একমাত্র প্রিয় বোনটির দারুণ অসুখ, তার ওপরে তার স্বামীর চলছে চরম আর্থিক সংকট। স্বভাবতই বালজাকের উচিত তাদের এখন কিছু সাহায্য করা। এদিকে বেকার ভাই ভাগ্যান্বেষণে দূর বিদেশে গিয়ে শুধু কপর্দকহীন হয়েই ফেরেনি সঙ্গে বিয়ে করে নিয়ে এসেছে তার থেকে পনর বছরের বড় এক রমণীকে। মা তাকে বালজাকের কাছে পাঠিয়েছেন একটা চাকরি জোগাড় করে দিতে; সর্বোপরি মা লিখেছেন, "এবার আমার পাওনা টাকাগুলি শোধ করে দাও—তোমার ত এখন অঢেল পয়সা, রাজ্য জোড়া নাম।" মায়ের কাছ থেকে অভাবিত আক্রমণ এলে বালজাক চিরকাল মাদাম বেরনির বুকে আশ্রয় নিয়েছেন। মাদাম বেরনি তাঁকে এক যোগে মায়ের স্নেহ প্রিয়ার মমতা বন্ধুর সহানুভূতি দিয়ে সান্ত্বনা দিয়েছেন, সাহায্য করেছেন। আজ সেই মাদাম বেরনিকেই সান্ত্বনা দিতে হচ্ছে বালজাককে। তা ছাড়া হালে একটি ছেলে মারা গেছে তাঁর, এক মেয়ের মাথা খারাপ হয়ে গেছে। মাদাম বেরনিকে

শুধু সান্ত্বনা নয়, তাঁর পাওনা হাজার চল্লিশ ফ্রাঁ তাঁকে এখন দিয়ে দিতে পারলে উপকার হয়! অথচ পাওনাদার কেবল তাঁর মা আর মাদাম বেরনিই নন, তাঁর চতুর্দিকে পাওনাদার। তাতে অবশ্য বালজাক ঘাবড়ান না। ওটা সহ্য করার অভ্যাস হয়ে গেছে তাঁর। সমস্যা জটিল হয়েছে বই লিখে দেবেন বলে অগ্রিম দাদন নেওয়ায়। যে সময়ের মধ্যে লিখে দেবার কথা সে সময়ের মধ্যে যতগুলি বই লিখবেন ভেবেছিলেন তার দ্বিগুণ লিখেও অর্ধেক প্রকাশকের দাবি মেটাতে পারেন নি। বন্ধুরা এ সর্বনাশা অভ্যাস ছাড়তে তাঁকে বার বার অনুরোধ করেছে, তিনি কান দেন নি। প্রকাশকের কাছ থেকে অগ্রিম টাকা নেওয়ার পেছনে এক প্রচণ্ড অহমিকা কাজ করত তাঁর। তাঁর প্রতিভার পায়ে প্রকাশকরা অবনত হয়েছে দেখলে তাঁর খুব গর্ব হত, তিনি তাঁর মধ্যে যেন একটা অমোঘ শক্তি অনুভব করতেন। তাই কোন প্রকাশক এসে তাঁর দরজায় দাঁড়ালে তিনি একখণ্ড কাগজে ভাবী উপন্যাসের একটা সম্ভাব্য নাম লিখে দিয়ে বলতেন, "দু'হাজার ফ্রাঁ অ্যাডভান্স কর, এ বই তোমাকে দেব।"

হ্যাঁ, এ কাণ্ড করার পেছনে একটা গূঢ় অহমিকা কাজ করত ঠিকই, অধিকন্তু একটা প্রবল চাপেরও সৃষ্টি হত—ঋণের চাপ, ঠিক সময়ে বই লিখে শেষ করার চাপ। তাঁর মানসিক গঠনটাও ধীরে ধীরে এমনই হয়ে উঠেছিল যে, ঋণের তাগাদা প্রকাশকের দাবি ইত্যাদি গরজের চাবুক না খেলে আঠারো ঘণ্টা কেবল কালো কফি খেয়ে একটানা লিখে যেতেও তিনি পারতেন না, আর এত করেও তবু হালে পানি পাননি তিনি। উড়নচণ্ডী ফুর্তিবাজ আভিজাত্যাভিলাষী মানুষটা প্রেমিকাদের কাছে নিজেকে পয়সাঅলা বলে প্রমাণ করতে পকেট ভর্তি টাকা কয়েক নিমেষে খরচ করে ফতুর হয়ে যেতেন। এ অবিমৃষ্যকারিতা চরমে উঠেছে বারবার। সেবার মাদাম হানস্কার সঙ্গে ভিয়েনায় গিয়ে দেখা করতে তিনি যে রাজকীয় আড়ম্বর করলেন তাতে তাঁর আর্থিক দুর্দশা আরো চরমে উঠল। দাদন দিয়ে বালজাকের হাত পা বেঁধে ফেলতে বদ্ধপরিকর প্রকাশকরা, ভিয়েনা যাবার সময় বালজাক যখন হাত পাতলেন মুঠো মুঠো টাকা দিয়েছে। পকেট ভরে সেই টাকা নিয়ে নিজের জুড়িগাড়িতে করে তিনি সামন্ত রাজার চাল আর মেজাজ নিয়ে গিয়েছেন মাদাম দ্য হানস্কার সঙ্গে দেখা করতে। সেখানে ভিয়েনার অভিজাত মানুষেরা তাঁদের প্রিয় লেখককে দেখে পাগল হয়ে উঠেছে। নিজের পরিবারের মাঝখানে তাঁকে ক্ষণকালের জন্যে ঘনিষ্ঠ ভাবে পাওয়ার আগ্রহে তাঁর হোটেলের দরজায় ধর্না দিয়েছে আর নিমন্ত্রণ করেছে তাঁদের বাড়ি বাড়ি। সে আপ্যায়ন অভ্যর্থনায় আত্মবিস্মৃত

বালজাক খ্যাতি আর হানস্কার সান্নিধ্যের নেশায় মাতাল হয়ে রাত জেগে লেখার প্রয়োজন ও দায় ভুলে গেছেন, তিনি আপন দম্ভে অন্ধ হয়ে রাত দুপুর পর্যন্ত লেখার বদলে গুনমুগ্ধদের নিয়ে কাটালেন, হানস্কার মন ভোলাতে মানভাঙ্গাতেও কেটে গেল অনেক সময়, আর সমস্ত শহর ব্যাপী তাঁর আভিজাত্যের জৌলুস ছড়াতে দু'হাতে খরচও করলেন যৎপরোনাস্তি। ফলে যখন ফ্রান্সে ফিরে এলেন পকেটে একটা পয়সা নেই, কোন প্রকাশককে দেবেন হাতে তেমন একটা বই তৈরি নেই। অতএব প্রকাশকের কাছে আবার গিয়ে হাত পাতবেন কোন মুখে! কিন্তু তাই বলে ত আর পকেট গড়ের মাঠ হয়ে থাকতে পারে না। বালজাক এসে হাজির হয়েছেন মঁসিয়ে ব্যুলোর কাছে। তখনকার কালের শাঁসালো প্রকাশক এই ব্যক্তিটি কয়েকটা পত্রিকারও মালিক ছিলেন। তাঁরই একটা সাময়িক কাগজে বালজাকের 'সেরাফিতা' উপন্যাসটা ধারাবাহিক বেরোচ্ছিল কিন্তু কিছু দিন হয়ে গেছে তিনি তার কিস্তি দেওয়া বন্ধ করেছেন, ইচ্ছা করে নয় অন্য লেখার চাপে বাধ্য হয়ে। তাই বলে মসিঁয়ে ব্যুলো যে তাঁকে ছেড়ে কথা কইবেন না, জানতেন বালজাক, কেননা ওই বাবদে বেশ মোটা অঙ্কের একটা অ্যাডভান্স তিনি নিয়ে বসে আছেন। তবু গুটি গুটি তাঁরই সামনে এসে দাঁড়ালেন।

ভিয়েনা থাকতেই একটা নূতন উপন্যাসের ছক কেটে ফেলেছিলেন বালজাক, ওখানে থাকতেই তার একটি কিস্তি লিখেও ফেলেছিলেন। বললেন, 'সেরাফিতা' বন্ধ হয়ে আছে থাক, পরে এক সময়ে এটা লিখে শেষ করে দেব, এখন এই 'ল্য লিস্ দাঁ লা ভালে' উপন্যাসটা ক্রমশ চালিয়ে যাও দিকিন আর এর বাবদ কিছু অ্যাডভান্স ছাড়।"

ছাড়লেন কিছু অ্যাডভান্স মঁসিয়ে ব্যুলো, বেশ একটা মোটা অঙ্কের টাকাই দিলেন। কিছু বিস্মিত হলেন বটে বালজাক কিন্তু তাঁর প্রতিষ্ঠা ও প্রতিপত্তির শক্তি দেখে অহমিকার অহংকারেও বুক ফুলে উঠল তাঁর। অবশ্য দু'দিন বাদেই তিনি টের পেলেন তাঁর প্রতিভার প্রভাবে নয় মনে মনে একটা দুষ্ট মতলব এঁটেই মঁসিয়ে ব্যুলো তাঁকে অ্যাডভান্স করেছেন। রাগে বালজাকের পিত্ত জলে উঠল। লোকটা কী নিমকহারাম! তাঁকে বিন্দুমাত্র আভাস না দিয়ে সে কিনা সেন্ট পিটারস্‌বুর্গের একটা কাগজে তাঁর অসমাপ্ত 'সেরাফিতা' উপন্যাসটাকে ধারাবাহিক বের করবার অনুমতি দিয়ে সে কাগজ থেকে একটা মোটা টাকা খেয়ে বসে আছে! দাঁড়াও দেখাচ্ছি মজা! বলে বালজাক দিলেন মঁসিয়ে ব্যুলোর নামে একটা মামলা ঠুকে। আর যায় কোথা! পত্রিকার মালিকের বিরুদ্ধে মামলা! সব প্রকাশকরা এক

গাট্টা হয়ে শুরু করল বালজাকের নামে কিচ্ছা ছাপতে। বন্ধুরা হা-হা করে ছুটে এলেন, একি করেছ, সর্বনাশ, এযে নিজের পায়ে নিজে কুড়ল মারা। শিগগির মামলা তুলে নাও। কিন্তু কে শোনে কার কথা। বালজাকের তখন জেদ চেপে গেছে। কাগজগুলো তাঁর লেখা ছাপা বন্ধ করে দিয়েছে। তার ওপরে চালাচ্ছে তাঁর নামে খিস্তি খেউড়। মামলা চালাতে মুঠোমুঠো টাকা খরচ হচ্ছে অথচ আয়ের পথ বন্ধ। তবু জেদ ভাঙছেনা বালজাকের; তিনি একটা পত্রিকা বের করে ফেললেন। তাঁর বিশ্বাস ছিল আজ তাঁর প্রতিষ্ঠা-প্রতিপত্তি এত দূর ছড়িয়ে পড়েছে যে কাগজ বের করামাত্র তা দেশময় হৈ-চৈ ফেলে দেবে। হাজার হাজার কপি বিক্রি হবে তাঁর কাগজ। কাগজ বের করা উপলক্ষে সেই অহমিকায় বেশ মোট টাকা খরচ করে বড় লোকদের নিমন্ত্রণ করে একটা রাজকীয় ভোজও দিলেন। ঝকঝকে অফিস, তকতকে কাগজ, বেয়ারা কর্মচারীতে গিসগিসে চারধার—রোশনাইয়ে ভরে উঠল ১৮৩৬ এর কয়েকটা দিন। তারপরেই ভোজবাজির মতন চুপসে গেল সেই রবরবে কারবার। বালজাকের নাম আছে ঠিকই, দেশজোড়া নাম; কিন্তু সেই নামই ত সব নয়। কাগজ চালাতে জানতে হয়। তার আদবকায়দা কলা-কৌশলই আলাদা। লোকের হাতে কী করে কাগজ পৌছে দিতে হবে, কেমন করে কাগজের প্রতি মানুষের দৃষ্টি সব সময় উদ্‌গ্রীব রাখতে হবে কিছু জানেননা বালজাক। ফলে বছর ঘুরতে না ঘুরতে গোদের ওপর বিষফোঁড়ার মতন ঋণের ওপরে আরও ঋণ চাপল বালজাকের। মামলা করে আর কাগজ করে তিনি যখন ফতুর, যখন নতুন ঋণের দায় আর পুরোনো ঋণের উৎপাতে তাঁর প্রাণ ওষ্ঠাগত তখন সরকারের এক সমন এসে হাজির তাঁর নামে। সেই সবে তখন আইন পাশ হয়েছে, প্রত্যেক শক্ত সমর্থ পুরুষকে সেনাবাহিনীর ন্যাশনাল গার্ডে কিছু দিন শিক্ষানবিসী করতে হবে। বালজাককেও যেতে হবে। সেই সমন পেয়ে বালজাক ত ক্ষেপে আগুন। তাঁর মতন বিখ্যাত লেখক কিনা যাবে লেফট-রাইট করতে, বন্দুক কাঁধে করে মার্চ করতে! কক্ষনো না। কিন্তু দেশের আইন কখনো খ্যাতির খাতির করে না। আদেশ অমান্য করার অপরাধে তাঁকে জেলে পুরলেন সরকার। চোর জোচ্চোর বদমাস গুণ্ডাদের সঙ্গে সপ্তাহখানেক কাটাতে হল তাঁকে। জেলে যাবার আগেই অবশ্য ব্যুলোর সঙ্গে তাঁর মামলার একটা মিটমাট হয়ে গিয়েছে কিন্তু তাই বলেও রক্ষে নেই তাঁর। জেল থেকে বাড়ি এসে দেখেন আদালতের এক নোটিশ ঝুলছে, চব্বিশ দিনের মধ্যে বই লিখে না দিতে পারলে তারপরের প্রতি দিনের জন্যে পঞ্চাশ ফ্রাঁ জরিমানা। অ্যাডভান্স নেওয়ার আক্কেল সেলামী দিতে বালজাক তক্ষুনি বসে গেলেন লিখতে।

সেই প্রচণ্ড চাপে তাঁর কলম দিয়ে বেরিয়ে এল তাঁর অন্যতম শ্রেষ্ঠ উপন্যাস 'ইল্যুজিওঁ পের্হ্যু'।

"আমি আমার সমস্ত শক্তি এক করে দিনে পনর ঘণ্টা করে খেটেছি। সূর্য ওঠার সঙ্গে সঙ্গে উঠেছি আর লাঞ্চ পর্যন্ত অনবরত লিখেছি। ব্লাক কফি ছাড়া আর কিছু খাইনি। তবে শেষ হয়েছে 'ইল্যুজিওঁ পের্হ্যু'। দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলেছেন বালজাক।

'ইল্যুজিওঁ পের্হ্যু' যদিও আপাত দৃষ্টিতে মনে হবে সমকালীন সমাজের বাস্তবচিত্র তবু তার মধ্যে বালজাক নিজের দ্বিধাবিভক্ত সত্তাকে ধরবার যে ঐকান্তিক যত্ন করেছেন বইখানির অমরত্বের মূলে আসলে সেই নিষ্ঠা। দুটি চরিত্রের মধ্যে তাঁর স্বভাবের দুটি অংশকে তিনি অত্যন্ত সততার সঙ্গে ফুটিয়ে তুলেছেন।

দুটি পৃথক চরিত্রে তিনি দেখিয়েছেন—একজন লেখক যদি তাঁর শিল্পের প্রতি বিশ্বস্ত থাকে এবং নিজেকে কখনো না প্রবঞ্চিত করে ত কতখানি সাফল্য ও শান্তি সে অর্জন করতে পারে। আর যদি সে প্রলোভনের কাছে আত্মসমর্পণ করে; শস্তায় জনপ্রিয়তা পেতে ও সচ্ছল হতে চেয়ে শিল্পের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করে ত তখনই বা তার কতখানি অধঃপতন ঘটে। 'ল্যুসিআঁ দ্য রুবাঁপ্রে' চরিত্রটি হল বালজাকের এই আত্মিক সর্বনাশের চেহারা আর 'দানিয়েল দারতে' আদর্শে পৌছতে তাঁর আত্মার আকুল আকুতির প্রতিচ্ছবি। বালজাক তাঁর এই দ্বৈত সত্তার যন্ত্রণায় সব সময় পীড়িত থাকতেন। তিনি খুব ভাল করে জানতেন, তাঁর শিল্পিমন তাঁর ভিতরে যা কিছু উৎকৃষ্ট তাকে উদ্ঘাটন করে সাহিত্যে রূপ দিতে চায় এবং তা করতে চেয়ে প্রয়োজন হলে সমাজ সংসারের বিরুদ্ধে সমস্ত শক্তি এক করে বিদ্রোহীর মতন রুখে দাঁড়ায়, কোন রকম আপসের কাছেই মাথা নত করতে চায়না। আবার এও তিনি খুব ভাল করেই জানতেন যে, তাঁর চরিত্রের আর একটা দিক কী অসম্ভব পল্‌কা। অভিজাত সুন্দরী স্ত্রীদের প্রতি তাঁর বড় লোভ, তিনি বড় উড়নচণ্ডী, ফতোবাবুর মতন তার চালচলন, হঠাৎ-নবাবের মতন দেমাক, তিনি কিছুতেই শস্তা বিলাস তুচ্ছ ব্যাসনের আকর্ষণ এড়াতে পারেন না। তাঁর মধ্যে সংযম নেই, বিবেকের বড় অভাব।

চরম বিপর্যয়ের সামনে দাঁড়িয়ে নিজেকে ইস্পাতের মতন কঠিন করে তুলতে বালজাক 'ইল্যুজিওঁ পেহ্যু'-তে আত্মসমালোচনায় প্রবৃত্ত হয়েছিলেন। নিজের স্বভাব-চরিত্রকে নিজের সামনে নগ্ন করে দেখতে চেয়েছেন তিনি, নিজেকে তিনি সাবধান করতে চেয়ে সমকালের সবাইকে এবং উত্তরকালের আমাদেরও সাবধান

করে গেছেন। আঙুল তুলে দেখিয়ে গেছেন ধন-বৈষম্যের রাষ্ট্রে অভিজাত সমাজের ষড়যন্ত্রে বিপন্ন বিপর্যস্ত সাধারণ মানুষ এবং অসাধারণ প্রতিভারা কী ভাবে বিভ্রান্ত বঞ্চিত ও শোষিত হয়ে মরে।

যখনই বালজাকের জীবনে নির্মম বিপদ ঘনিয়ে ওঠে, চূড়ান্ত হয়ে ওঠে দুরন্ত বিপর্যয়, তখনই যেন তাঁর মধ্যে একটা বিশুদ্ধ প্রেরণা জেগে ওঠে। অনমনীয় সাহসের সঙ্গে সেই চূড়ান্ত বিপর্যয়ের ভিতরেও স্থিতধী হয়ে যেতে পারেন তিনি, মগ্ন হয়ে যেতে পারেন সৃষ্টির গভীরে। ফলত এ সব সময়কার প্রত্যেকটি রচনাই তাঁর হয়ে উঠেছে বিশ্বসাহিত্যের এক একটি বিস্ময়। 'ইল্যুজিওঁ পের্দ্যু' তারই একখানি।

•

এই একটা বছরের যত আকস্মিক দুর্ঘটনা, বিপর্যয়, মামলা মোকদ্দমা, জেল, ইনসলভেনসি আর মোষের মতন পরিশ্রম—কোন কিছুই তিনি মাদাম হানস্কাকে লিখতে এতটুকু বাদ দেননি। রোজনামচার মতন করে তিনি সপ্তাহের পর সপ্তাহ তাঁর উৎকণ্ঠা অক্ষমতা নিঃসঙ্গতা বিষণ্ণতা ও ইত্যাকার সকল রকম যন্ত্রণা অকপটে লিখে গেছেন। লিখতে পেরেছেন কেননা তিনি তাঁকে সত্যি প্রাণভরে ভালবেসে ফেলেছিলেন। কিন্তু বালজাকের মতন দেহ-লোলুপ পুরুষ কেবল হৃদয়-বৃত্তি নিয়ে তৃপ্ত থাকতে পারেন না, তাই মাদাম হানস্কার অজ্ঞাতসারে তাঁর নারী-সাহচর্য অব্যাহতই থেকে গেছে। এ-ই সময়ে, যখন চরম দুর্যোগ আর পরম লাঞ্ছনায় বালজাকের জীবন ওষ্ঠাগত, তিনি প্রেম করেছেন কোঁতেসা গিদোবোনি ভিসকোঁতি-র সঙ্গে। এই বহুচারিণী সুন্দরী ছিলেন অস্ট্রিয়ান অ্যামবেসেডারের স্ত্রী। মাদাম হানস্কাই পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন এই মহিলার সঙ্গে বালজাকের। একজন প্রথিতযশা সাহিত্যিকের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হওয়ার গৌরবে পরিতৃপ্ত এই মহিলা তাঁর সব প্রণয়ীদের বাতিল করে বালজাকের সঙ্গে মেতে উঠেছিলেন। বালজাক তখন তাঁর পাওনাদারদের ফাঁকি দিতে আর একটা বাড়ি ভাড়া নিয়েছেন। মাদাম হানস্কাকে যখন তিনি লিখেছেন, "আমি পাওনাদারদের জ্বালায় অস্থির হয়ে নিঃসম্বল অবস্থায় একটা বস্তির খোপে আশ্রয় নিয়েছি ও ফলাহারী তপস্বীর ঈশ্বর চিন্তার মতন তোমার নাম জপ করছি আর পাগলের মতন লিখে চলেছি।" তখনও তিনি র্যু কাসিনি-র চারখানা ঘরের ভাড়া টানছেন অধিকন্তু বুলভার দে কাপুসিঁ্যা-এর এক ফ্ল্যাটে রাজকীয় বিলাসের মধ্যে বাস করছেন। অবশ্য এটা ঠিক যে মাঝে মধ্যে তখন তাঁর হাতে একটা পয়সাও থাকত না। কখনো কখনো নিজের দরজির থেকে, ডাক্তার থেকে এমন কি

মুদির কাছ থেকে অব্দি লাঞ্চ খাওয়ার টাকা ধার করতেন তিনি, কিন্তু লেখার টাকা হাতে এলেই কিনতে ছুটতেন নানা শৌখিন জিনিস ; শাটিনে সিল্কে কারপেটে সোফাসেটে ফুলদানিতে ঘর সাজাতেন মনের মতন করে।

তাঁর ভগ্নীতুল্য বান্ধবী জুলমা কারুদ-কে লেখা এ সময়কার একখানা চিঠিতে বালজাকের তখনকার মনের অবস্থা ও তার অন্তর্দ্বন্দ্ব স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠেছে। তিনি লিখেছেন, "কিছুদিন যাবৎ আমি এক অসাধারণ সুন্দরীর ব্যক্তিত্বে আচ্ছন্ন হয়ে আছি, আমি জানি না, আমি কেমন করে এর হাত থেকে নিষ্কৃতি পাব। আসলে আমি আমার প্যাশানের কাছে বড় অসহায়।"

দীর্ঘ পাঁচ বছর এই প্রেমান্ধ মহিলার কাছ থেকে বালজাক শুধু শারীরসান্নিধ্য নয় অকৃত্রিম মমতাও পেয়েছেন, পেয়েছেন প্রচুর আর্থিক সাহায্যও। ১৮৩৬-এর ১৯শে মে কোঁতেসা গিদোবোনি ভিসকোঁতি-র যে ছেলে হয় বালজাকই তাঁর পিতা। বিভিন্ন ক্ষেত্রে বালজাকের সন্তান সংখ্যা তখন তিনটি।

কু-কথা বাতাসের আগে ধায়, বাতাসের থেকে দ্রুত ছড়ায়। তা সে যত যত্ন করে ঢেকে রাখা হোক। বালজাকের এই সব কীর্তির কথা এলোমেলো হাওয়ায় ভর করে য়ুক্রেন পর্যন্ত পৌছতে বাকি থাকে না। মাদাম দ্য হানস্কা শুনে ক্ষুব্ধ হন, রাগ করে চিঠি লেখেন, ভয় দেখান, এমন করলে তিনি বালজাকের সঙ্গে আর সম্পর্ক রাখবেন না।

মাদাম হানস্কা বালজাককে বারবনিতার কাছে যেতে অনুমতি দিয়েছিলেন : "তুমি পুরুষ, তুমি শিল্পী, তুমি ব্রহ্মচারী হবে একথা কেন আমি বলব। কিন্তু কারো সঙ্গে যেন হৃদয় দেওয়া-নেওয়ার খেলা খেলো না।" তিনি তাঁকে সতর্ক করে দিয়েছিলেন।

কিন্তু বালজাক বেশ্যাগমনকে ভীষণ ঘৃণা করতেন। তিনি বলেছেন, বেশ্যারা ব্যক্তিত্বহীন। তাদের কাছে যারা যায় তারা নিয়ুরটিক। তারা হীনম্মন্যতায় ভোগে। তারা অভিজাত নারীর ব্যক্তিত্বকে ভয় পায়। কেবলমাত্র শরীর ভোগের প্রতি বালজাকের ঘৃণা ছিল অত্যন্ত সোচ্চার।

অবশ্য সে-সব কথা নয়, প্রেমিক তোষণপটু বালজাক তার সঙ্গিনীহীন একাকী জীবন ও দিনরাত্রি ভেদহীন কঠোর শ্রমের যন্ত্রণা এমন ইনিয়েবিনিয়ে লেখেন যে হানস্কার মনে নিদারুণ সন্দেহ সত্ত্বেও নিজেকে তিনি তাঁর কালের সেরা মানুষটির সম্পর্ক থেকে ছিন্ন করতে পারেন না। বরং দূরে বসে অলস বিবর্ণ দিনগুলির মধ্যে হাঁপিয়ে উঠতে উঠতে বালজাকের খ্যাতির দীপ্তিতে আরও বেশী আচ্ছন্ন আকৃষ্ট

হতে থাকেন। এত বড় এক সাহিত্যরথীর সঙ্গে নিজেকে জড়িয়ে রাখতে তাঁর বাসনা ক্রমাগতই তীব্র হতে থাকে। কিন্তু বাধা স্বামী। এ বৃদ্ধ স্বামী না মরলে তাঁর পক্ষে আভিজাত্যের সম্মান অক্ষুণ্ণ রেখে বালজাকের অঙ্কশায়িনী হওয়া অসম্ভব। তবে কী বালজাক তাঁর জন্যে ব্রহ্মচারী হয়ে থাকবেন? না। তাইত তিনি তাঁকে শারীরক্ষুধা মিটাতে পারীর বারবনিতাদের কাছে যেতে বলেছিলেন। কিন্তু বালজাক পুরুষ, তিনি পশু নন, কেবল পশুবৃত্তি চরিতার্থতাকে তিনি মনুষ্যত্বের অসম্মান মনে করেন। অর্থাৎ যেখানে হৃদয়ের আবেদন ও জয় করার কৃতিত্ব নেই সেখানে বালজাকও নেই। কৈশোর যৌবনের সন্ধিক্ষণে এই আবেদন এই কৃতিত্বের আস্বাদ প্রথম পেয়েছিলেন তিনি মাদাম বেরনির মধ্যে। সেখানে বুদ্ধির দীপ্তির চেয়ে মাতৃত্বের কমনীয় আস্বাদ ছিল বেশী। অবশেষে মাদাম হানস্কা দিলেন আর এক অলৌকিক সুখের স্পর্শ। প্ল্যাটনিক ভালবাসার সঙ্গে তীক্ষ্ণ বুদ্ধি আর রসজ্ঞমনের মিতালি দেখে আত্মবিস্মৃত হলেন বালজাক। অনেক দূরের তারা হলেও বালজাক তাই তাঁকে ভুলতে পারেন নি। আর যত সব নারী সবাই ক্ষণকালের সঙ্গিনী। মাদাম বেরনি আর মাদাম হানস্কাই কেবল তাঁর বুকে হয়ে রইলেন চিরন্তন।

সেই মাদাম বেরনি যখন মৃত্যু শয্যায়, কোঁতেসা গিদোবোনি ভিসকোঁতি-র সম্পত্তির জট ছাড়াতে বালজাক তখন ইতালি। মাদাম ভিসকোঁতি-রই যাবার কথা ছিল সঙ্গে; কিন্তু তিনি যেতে পারলেন না। বালজাকের ভালবাসার স্বাক্ষর সদ্যজাত শিশুপুত্র লিওনেস তখন তাঁর কোলে।

তবে কী বালজাক একলা চলে গেলেন? পারীর মানুষ তাই জানল বটে, কিন্তু বালজাকের বন্ধু জুল সাঁদো আর তাঁর দরজি ব্যুইসোঁ জানল পুরুষের ছদ্মবেশে সঙ্গে যাচ্ছে একটি সুন্দরী যুবতী। ব্যুইসোঁর জানার হেতু সে যুবতীর পুরুষের পোশাক তৈরি করে দিয়েছে। পারীর অভিজাত সমাজে অপরিচিত এই যুবতী বধূর নাম মাদাম কারোলিন মারবুত্তি। ইনি কোর্ট অব জাসটিস-এর একজন পদস্থ অফিসারের অসুখী স্ত্রী। বালজাকের মুগ্ধ পাঠিকাদের একজন। পত্রালাপের মাধ্যমে তাঁদের পরিচয়।

যেদিন বালজাক ইতালি রওনা হবেন তাঁর বন্ধু জুল সাঁদো এসেছিলেন বালজাককে গাড়িতে তুলে দিতে। দেখেন তার আগে আগে এক যুবতী তর্‌তর্‌ করে উঠে গেল ওপরে, সোজা বালজাকের শোবার ঘরে গিয়ে ঢুকল। একটু পরে যখন বেরিয়ে এল, সে আর যুবতী নয় কমনীয়-কান্তি এক তরুণ যুবক। পরনে গ্রে ফ্রক-কোট প্যান্ট, এক হাতে ঘোড়ার চাবুক আর এক হাতে ছোট একটি ট্রাঙ্ক।

বালজাক তার পেছনে পেছনে নেমে এলেন। গাড়িতে উঠলে জুল সাঁদো বন্ধুর দিকে তাকিয়ে তির্যক চোখে হাসলেন, হাত বাড়িয়ে দিয়ে চতুর একটু হাসলেন বালজাকও। গাড়ি দুলে উঠল। ছদ্মবেশিনী নায়িকাকে নিয়ে রোমান্টি নায়কের গাড়ি গড়িয়ে চলল ইতালির দিকে।

সাত

ছদ্মবেশিনী যুবতী অভিসারিকাকে নিয়ে বালজাকের প্রমোদ ভ্রমণের শুরুটা সুন্দরই হয়েছিল। এবং শেষ বেশ হতেও বাধা ছিল না কোন, যদি না বালজাক নিজেই তাতে বাদ সাধতেন। তাঁর সাহিত্যিক অহমিকাই বিপদ ডেকে আনল শেষ পর্যন্ত। তিনি ইতালি গেছেন ব্যক্তিগত কাজে, বান্ধবীর কাজের নামে আসলে কয়েকটা দিন দায়হীন অবসর যাপনের জন্যে। অনায়াসে তিনি ইতালির সাহিত্যিক মহল ও অভিজাত সমাজ এড়িয়ে থাকতে পারতেন—তাঁর প্রমোদ ভ্রমণের দিনগুলি নিভৃতেই ভোগ করতে পারতেন তিনি। তিনি নির্জন কোন পথের ধারে অখ্যাত কোন হোটেলে উঠতে পারতেন; কিন্তু না, সে নাকি তাঁর মতন বিখ্যাত সাহিত্যিকের মর্যাদার মস্ত ক্ষতি। অতএব ছোট বড় সব হোটেল পেরিয়ে তাঁর জুড়ি-গাড়ি এসে থামল তুর্যোনের প্রধান শড়কের ওপরে, তুর্যোনের বিখ্যাত হোটেলের দরজায়। রাজপ্রাসাদের মুখোমুখি হোটেল গু ল্যোরোপ-এ বিলাসবহুল দুখানি পাশাপাশি ঘর জাঁকিয়ে বসলেন তিনি। এতেও যে তাঁর অবসর যাপনের বিশেষ ক্ষতি হত তা নয়, ক'জনেই বা জানত বালজাক এখানে আছেন। বালজাক নিজেই জানিয়ে দিলেন। তুর্যোনের বিখ্যাত দৈনিককে বলে পাঠালেন তিনি তুর্যোনে বেড়াতে এসেছেন। তিনি হোটেল গু ল্যোরোপ-এ আছেন। পরের দিন মস্তবড় শিরোনামে সে খবর কাগজে বেরিয়ে গেল। আর সে খবর পড়ে গোটা তুর্যোনই যেন এসে ভেঙে পড়ল হোটেলের দরজায়; তারা তাদের প্রিয় লেখক বালজাককে দেখবে, দেখবে তাঁর বিখ্যাত ছড়িখানাকে—যার সোনায় বাঁধানো হাতলে খোদাই আছে "আই অ্যাম কনকারার অব অল ডিফিক্যালটিজ"। বালজাকের উপন্যাসের মতনই তাঁর ছড়িখানাও ততদিনে সারা য়ুরোপে বিখ্যাত হয়ে উঠেছে।

আসলে বালজাক এটাই চেয়েছিলেন। মেয়েমানুষের থেকে বড়, তিনি তাঁর খ্যাতির মদ চেখে চেখে ভোগ করতে চেয়েছিলেন। সে বাসনা তাঁর অপূর্ণ থাকল

না। শুধু দলে দলে মানুষ তাঁকে অভিবাদন জানাতে এল না, অভিজাত পরিবার থেকে নিমন্ত্রণও আসতে থাকল ভূরিভূরি। তাঁর লেখাকে যাঁরা ভালবাসেন তাঁরা তাঁর সব খেয়ালকেই সমান বরদাস্ত করবেন এ বিশ্বাসের অহংকারে বেপরোয়া বালজাক সেই যুবকবেশী যুবতীকে নিয়ে অভিজাত পরিবারগুলিতে নিমন্ত্রণ রাখতে যেতে লাগলেন। কিন্তু চতুর মহিলামহলে ব্যাপারটা ধরা পড়তে বেশী সময় লাগল না। এবং দেখতে দেখতে একটা হৈ-চৈ কাণ্ড বেধে গেল। একজন অজ্ঞাতনামা শয্যাসঙ্গিনীকে নিয়ে অভিজাত পরিবারে নিমন্ত্রণ রাখতে আসার জন্যে একটা বিক্ষোভের ঝড় উঠল চারদিকে। অবস্থা গুরুতর বুঝে বালজাক তাড়াতাড়ি পালালেন তুরেন থেকে। অবশ্য তার আগে মাদাম কোঁতেসার সম্পত্তির ঝামেলাটা মেটাতে কসুর করলেন না এবং সফলও হলেন।

ফেরার পথে এবার একটু সাবধান হলেন বালজাক। জেনিভা প্রভৃতি যে সব জায়গায় দু'এক রাত করে থাকলেন, খুব সাবধানে ভক্ত-চক্ষু এড়িয়েই থাকলেন। ইতালি বেড়ানোর শেষ সপ্তাহ ক'টা মোটামুটি সুখে ও নিরুদ্বেগেই কাটল। কিন্তু সে সুখ-স্বপ্ন পারীতে পা দেবার সঙ্গে সঙ্গে সূর্যের তাপে কুয়াসার মতন চিহ্নমাত্র না রেখে মিলিয়ে যেতে এতটুকু বিলম্ব হল না। নিজের ঘরের দরজার সামনে এসে দেখেন ঋণের মামলার ডজন খানেক সমন ঝুলছে। কিন্তু ওসব সমনকে কোন দিন তিনি গ্রাহ্যের মধ্যে আনেন নি, আজও পাত্তা দিলেন না। তিনি দরজা খুলে ঘরে ঢুকলেন। জামা কাপড় ছেড়ে স্নানের ঘরে এলেন। পথের ধকল ধুয়ে ফেলতে ঘণ্টাখানেক প্রাণভরে স্নান করলেন। শরীর মন যখন জুড়িয়ে বেশ শীতল হয়েছে তখন চাকর এসে খবর দিলে, তাঁর শাঁসাল প্রকাশক মঁসিয়ে ভেরদে-র অবস্থা সঙ্গিন। তার প্রায় দেউলিয়া হওয়ার দশা; হাত পাতলে বিমুখ হন না, এমন একটা নিশ্চিত ভরসা নষ্ট হয়ে গেল ভেবে এবং এখন ভেরদে তাঁর পাওনা আদায়ের জন্যে মামলা করবে জেনে একটা দীর্ঘনিশ্বাস পড়ল বটে বালজাকের তবু হতাশ করতে পারল না তাঁকে। বরং যেন মনে মনে আরও বেশী কঠিন হয়ে উঠলেন তিনি, আরও বেশী দৃঢ়সংকল্প হলেন। সেই কঠিন সংকল্পের মন নিয়ে লেখার টেবিলে আসতেই চোখ পড়ল ডাকের স্তূপাকার চিঠিপত্রের মধ্যে কালো বর্ডার টানা একখানি খামের ওপর। বুকটা অজান্তেই ভীষণ মুচড়ে উঠল। চিঠি এসে পড়ে আছে সেই ২৮ জুলাই থেকে। পড়ে এখন আর তিনি আত্মসংবরণ করতে পারলেন না। একটা নির্মম শোকের আঘাতে তাঁর সব সংকল্প দৃঢ়তা ভেঙে তছ্‌নছ্‌ হয়ে গেল। তিনি অসহায়ের মতন চেয়ারে বসে পড়লেন। টেবিলে

মাথা রেখে চোখ বুজলেন তিনি। প্রবল যন্ত্রণায় আর আত্মধিক্কারে তাঁর চোখ ফেটে জল নেমে এল : ছি-ছি একী করেছেন তিনি। যিনি তাঁর অর্থ সতীত্ব স্নেহ-মমতা শুভাকাঙ্ক্ষা, নারী হৃদয়ের সব—সমস্ত দিয়ে তাঁকে ভালবেসেছিলেন, অবহেলার আস্তাকুঁড় থেকে তুলে বুকের মধ্যে টেনে নিয়েছিলেন, যাঁর উৎসাহ ও প্রেরণা তাঁকে আজকের এই খ্যাতির জীবনে প্রতিষ্ঠিত করেছে, সেই পরম প্রিয়জনটি যখন মৃত্যু শয্যায়, যখন তিনি মারা গেলেন, যখন তাঁকে সমাধিস্থ করা হল, সেই সমস্ত সময়টা বেইমান নিমকহারাম তিনি কিনা একটা তুচ্ছ মেয়েমানুষ নিয়ে তুরোনে তুলকালাম করে বেড়াচ্ছেন!

অনুশোচনায় ক্ষোভে আহত জন্তুর মতন ছট্‌ফট্ করতে থাকলেন তিনি। এবং তার পরদিন ভোর না হতেই মাদাম বেরনির সমাধিভূমির উদ্দেশ রওনা হয়ে গেলেন। তাঁর সত্তার গভীর থেকে উঠে একটা স্বর যেন তাঁর মনের কানে বার বার উচ্চারণ করতে থাকল : তোমার জীবনের একটা মূল্যবান যুগ শেষ হয়ে গেল, বালজাক। ল্যর ছ বেরনির সঙ্গে তোমার যৌবনেরও সমাধি ঘটল।

সত্তার এই সতর্ক স্বর বালজাককে বড় কাতর করে ফেলল। পারীতে প্রিয়তোষিণী কোঁতেসা গিদোবোনি, য়ুক্রেনে প্রোষিত-প্রেমিকা হানস্কা : একজন কাছে থেকে সর্বাঙ্গ সমর্পণ দক্ষতায় মুগ্ধ রাখতে চাইছেন বালজাককে, আর একজন দূর থেকে সুভাষিত প্রেমপত্র লিখে। তবু মাদাম বেরনির মৃত্যুর আরশিতে নিজের যে চেহারা তিনি দেখতে পেয়েছেন তার ভয় থেকে যেন কিছুতে মুক্তি মিলছে না তাঁর। একটা নিদারুণ হাতাশা ও নিঃসঙ্গতাবোধ তাঁকে যেন ক্রমাগত আচ্ছন্ন আবৃত করে ফেলছিল। তাঁর কেবলই মনে হচ্ছিল—তিনি যেন মহা ভুল করেছেন, সারা জীবন আলেয়ার পেছনে ছুটে দুর্লভ যৌবনটাকে রেসের ঘোড়ার মতন খাটিয়ে আর কালো কফি খাইয়ে খাইয়ে নষ্ট করেছেন। এখন চুলে পাক ধরেছে, তালুতে টাক পড়তে শুরু করেছে, শরীরে চর্বি জমে দেহ থল্‌থলে হয়েছে, যৌবনের জৌলুস আর নেই। সেই পড়ন্ত যৌবনের দিকে তাকিয়ে শিউরে ওঠেন বালজাক, অকাল বার্ধক্যের ভয়ে বেপরোয়া হয়ে ওঠেন। এবং এই অকাল জরার কালো ছায়ার হাত থেকে পালাতে সাঁইত্রিশ বছরের বালজাক রিরংসায় ক্রমাগত প্রবলভাবে জ্বলতে থাকেন। ফলে গত দশ বছরে তাঁর প্রণয়িনীর সংখ্যা যত ছিল এই একটা বছরেই সে সংখ্যা দ্বিগুণ হয়ে উঠল। পলাতক যৌবনের অবশিষ্ট ক'টা দিনকে চূড়ান্তভাবে ভোগ করে নিতে বালজাক যেন হঠাৎ তৈলহীন প্রদীপের মতন দারুণ তেজে জ্বলতে থাকলেন।

বালজাক যে কী হতাশায় ও দুঃখে এমন করে উন্মত্ত হয়ে উঠেছেন বুঝতে পেরেছিলেন একমাত্র শ্রীমতী কোঁতেসা। মাদাম বেরনি ছাড়া বালজাককে বুঝি এমন করে আর কেউ ভালবাসেননি। এমন শুভাকাঙ্ক্ষী মাদাম বেরনি ছাড়া আর কেউ ছিল না তাঁর। বালজাককে এই সর্বনাশের নেশা থেকে বাঁচাতে আর একবার শ্রীমতী কোঁতেসা তাঁকে তাঁর সম্পত্তির বিজনেস এজেন্ট করে ইতালি পাঠালেন।

এবার আর কোন মেয়েছেলে নিয়ে নয় একাই বেরিয়ে পড়লেন বালজাক। যেন পালাবার জন্যে পা বাড়িয়েই ছিলেন, সুযোগ আসা মাত্র আর মুহূর্ত অপেক্ষা করলেন না। আল্‌প্‌স্ পেরিয়ে তিসিনো হয়ে সোজা মিলান এসে পৌছলেন। যেখানেই যান খবরের কাগজগুলিতে তাঁর নাম ছাপা হয় আর ভক্তের দল এসে ভেঙে পড়ে তাঁকে দেখতে। রাজা রানী রাজকুমার রাজকুমারী মিলিটারি অফিসার রাজকর্মচারী কে আগে অভ্যর্থনা করবে তার জন্যে কাড়াকাড়ি পড়ে যায়। বালজাকের সে আর এক জীবন। পারীর রাস্তায় নামতে পারেন না পাওনাদারদের ভয়ে আর এখানে রাস্তায় রেস্তোর঳ায় হোটেলে রাজপ্রাসাদে ধনীর বাড়িতে অবারিত দ্বার, অবাধ পরিক্রমা তাঁর। তাঁর একটি বাণীর জন্যে, তাঁর একটি স্বাক্ষরের জন্যে সে কী উদগ্রীব প্রতীক্ষা, সে কী সবিনয় অনুরোধ! সমস্ত পৃথিবী যেন এসে তাঁর পায়ের তলায় লুটিয়ে পড়েছে। বিধাতার মতন তিনি সকলের শ্রদ্ধা প্রীতি প্রশংসা গ্রহণ করতে থাকলেন। তিনি ভুলেই গেলেন তিন মাসের মধ্যে দুখানা বই লিখে দেবার শর্তে এক নতুন প্রকাশক থেকে পাঁচ হাজার ফ্রাঁ অ্যাডভান্স নিয়েছেন। তিন মাসের মধ্যে তিলেকের জন্যেও তিনি ভাবতে বসলেন না কী লিখবেন। লেখার জন্যে একটা মুহূর্ত তিনি ব্যয় করলেন না অথচ ইতালির রাজারাজড়াদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে চলতে সে-টাকা তিনমাসের মধ্যেই ফুঁকে দিয়ে ফতুর হয়ে গেলেন বালজাক। তিন মাস পরে কপর্দকহীন বালজাক পারীর পথে পা বাড়ালেন।

তাঁর জন্যে পারীতে কী অভ্যর্থনা অপেক্ষা করছে তিনি জানতেন। এবার আর সমন নয়, বডি ওয়ারেন্ট। তাঁকে পেলেই ঠেলে নিয়ে জেলে তুলবে পাওনাদার। তিনি রাতের অন্ধকারে গোপনে এসে উঠলেন তাঁর এক বন্ধুর বাড়িতে—"একটু লুকিয়ে থাকবার জায়গা দাও"। আজ আর তাঁর বিলাসবহুল আরামের সকল রকম ব্যবস্থায় ভরা ঘর চাই না। তিনি বললেন—"একটা গোয়াল একটা আস্তাবল হলেও চলবে। চাই কেবল কয়েক দিস্তে কাগজ, এক দোয়াত কালি, ডজনখানেক পাখের কলম। মাস তিন দিনরাত লিখতে পারলে সব ব্যাটার মাথা নুইয়ে দেব"। কিন্তু বন্ধু জায়গা দিলেন না। এত ঘা খেয়েও যার শিক্ষা হল না তাকে আর

কোনো সুযোগ দেওয়া মানে আরও আশকারা দেওয়া। সেখান থেকে গেলেন আর এক বন্ধুর কাছে, সেখানেও আশ্রয় মিলল না। আর এক বন্ধুর কাছে এলেন। অন্তরঙ্গ বন্ধুর সংখ্যা বালজাকের বেশী নয়। কিন্তু আজ সে স্বল্পকটি আশ্রয়ের দরজাও তাঁর কাছে বন্ধ।

আশ্চর্য এক ভাগ্য বালজাকের। বিপদ যখন চারধার থেকে রাক্ষসের পালের মতন হাঁ করে তাঁকে গিলতে আসে তখনই কোন সহৃদয় রাজকন্যা এসে তাঁকে উদ্ধার করেন, ঠিক আমাদের সেই ঠাকুরমার ঝুলির গল্প যেন। সকল দুয়ার থেকে হতাশ হয়ে ফিরে এলে শ্রীমতী কোঁতেসা বললেন, "আমার কাছে থাক। এক সুবারবন ডিসট্রিকট-এ অপ্রত্যাশিত আশ্রয় পেয়ে বেঁচে গেলেন বালজাক। শাপে বর হল। সূর্যের মুখ দেখতে পাবেন না বটে কিন্তু প্রণয়িনীর চাঁদমুখ যখন খুশী দেখতে পাবেন। অথচ কাজের মধ্যে ডুবে গিয়ে সে চাঁদমুখ দেখবার সময়টুকুও বুঝি হত না তাঁর। দু'মাসের মধ্যে তিনি লিখে ফেললেন 'লা ম্যেজোঁ নুসিংসেন' আর 'লা ফাম স্যুপেরিয়র।' 'কোঁৎ দ্রোলতিক'-এর শেষ পরিচ্ছেদ শেষ করলেন ও ছোট একটা খসড়া করে ফেললেন 'গাঁবারা'-র।

এমন বিদ্যুৎ গতিতে আরও কয়েকটা মাস চালিয়ে যেতে পারলে এক ডুবেই তিনি অনেকদূর এগিয়ে যেতে পারতেন। সগর্বে বুক ফুলিয়ে পাওনাদারদের সামনে বেরিয়ে আসতে পারতেন তিনি ; কিন্তু বাদ সাধল নারীর ঈর্ষা। সবার থেকে কেড়ে নিয়ে বালজাককে একলা ভোগ করছে কোঁতেসা এটা সহ্য হল না কারোলিন মারবুতির। রাগের আরও একটা কারণ দ্বিতীয়বার ইতালি ভ্রমণের সময় বালজাক তাকে সঙ্গে নেয় নি। এই অবিমৃষ্যকারী ঈর্ষাকাতর নারী বালজাকের আস্তানার ঠিকানা ফাঁস করে দিয়ে এল ডিকরিদার ভেরদেকে। ওয়ারেণ্ট নিয়ে ডিকরিদারের পুলিশ হাজির হতে দেরি করল না। বালজাক হাতে নাতে ধরা পড়ে গেলেন, তাঁকে এবার জেলে পুরবেই তারা। এবারও উদ্ধার করলেন তাঁকে শ্রীমতী কোঁতেসা। তিনি ধনী ছিলেন না কিন্তু বালজাককে বড় ভালবেসে ফেলেছিলেন। সেই ভালবাসার ঋণ শোধ করলেন ভেরদে-র পাওনা মিটিয়ে। খবরের কাগজঅলারা যেন ওৎপেতেই ছিল ; তারা ছেপে দিলে—কোঁতেসা গিদোবোনি ভিসকোঁতি টাকা দিয়ে বালজাককে কিনে নিয়েছেন আর কোন নারী নাগাল পাবে না তাঁর।

এত যে ঝড়ঝাপটা জীবনের ওপর দিয়ে যাচ্ছিল বালজাকের, এত যে ঝুটঝামেলার মধ্যে দিয়ে দিন কাটছিল তাঁর, তবু কোনদিন মাদাম হানস্কাকে চিঠি

লিখতে দেরি করেন নি তিনি। ও কাজটি নিত্যকৃত্যের মতন নিয়মিত করে যেতেন বালজাক। সেদিন কিন্তু চিঠি লিখতে বসে তিনি শিউরে উঠলেন : এ খবর য়ুক্রেনে গিয়ে পৌঁছে গেছে ইতিমধ্যে, কিংবা এখনই পৌঁছে যাবে। বালজাক চুলের মুঠো ধরে মাথাটাতে দু তিনবার ঝাঁকুনি দিলেন তারপর গড়গড় করে লিখে ফেললেন চিঠি :

"বড় নিঃসঙ্গ অসুখী জীবন কাটছে আমার। ঋণে ঋণে জর্জ্জরিত হয়ে আছি। সবাই চাইছে টেনে নিয়ে জেলে পুরতে। অতএব পালিয়ে পালিয়ে থাকতে হয়। কিন্তু পালিয়েও রক্ষে নেই। পাওনাদারকে যদিবা এড়াতে পারি বিশ্বাসঘাতককে ঠেকাতে পারি নে। তাই জেল এড়াতে যে-করে হোক পাওনাদারের টাকা মিটাতে হয়েছে। যে সহৃদয় বান্ধবী টাকা জুগিয়েছেন তাঁর কাছে নিশ্চয় আমি কৃতজ্ঞ থাকব। তার অর্থ নানা রকম হয়ে ছড়াবে চারধারে। আমার শত্রুর অভাব নেই। দুর্জনে নানা কথা রটায়—লক্ষীটি বিশ্বাস করো না।"

পত্র লেখেন আর ভাবেন। সারাজীবন তাঁকে কেবল মন জুগিয়েই চলতে হবে। পাবলিশার পাওনাদার প্রণয়িনী সকলের মনরেখে চলার নিয়তি তাঁর। এর থেকে তিনি বুঝি মুক্তি পাবেন না কোনদিন। অন্তঃসার শূন্য বুরজোআ জীবনের এই যন্ত্রণার চিত্র তাঁর এ সময়কার রচনা 'সেজার বিরোতো'। এ বইখানাকে বালজাকের সমালোচকরা বলেন বুরজোআ এপিক। এই উপন্যাসে তিনি একটি সরলবিশ্বাসী মানুষের কাহিনী বর্ণনা করেছেন। অত্যন্ত সরল বিশ্বাসবশতই মানুষটি নানারকম সর্বনাশা পরিকল্পনার সঙ্গে জড়িয়ে পড়ে। সাধারণভাবে সারা জীবনে বিশেষ করে গত কয়েক মাসে বালজাক যত রকমের লাঞ্ছনা অপমানের অভিজ্ঞতা অর্জন করেছিলেন তার সব সমস্ত পুনর্বিন্যাস করে উপস্থিত করেছেন এই বইতে। এমন এক নিষ্ঠুর বাস্তব জগতের ছবি এখানে তিনি তুলে ধরেছেন যা আঁকতে বালজাকের সমকালীন কি পূর্বকালীন কোন দুর্ধর্ষ লেখকও সাহস পান নি। এ বইতে আছে : ধার করতে মানুষ কী ভীষণ মরিয়া হয়ে ওঠে, দুঃসময় কী সাংঘাতিক বন্ধু বিচ্ছেদ ঘটায়, পাওনাদার পাওনা আদায় করতে কী ভয়ংকর নিষ্ঠুর হয়ে উঠতে পারে। তাছাড়া আছে আইনের মার, উকীলের প্যাচ, সর্বোপরি বুরজোআ সমাজের অর্থ নৈতিক ফাটকাবাজী—যার শিকার হয়ে সাধারণ মানুষ চরম লাঞ্ছনা ও দুর্ভোগ ভোগে। নারী ও তার কুহক ত থাকতেই হবে। তা আছেও।

১৮৩৬-১৮৩৭ এ দু'টা বছর বালজাকের জীবনের ওপর দিয়ে দুর্যোগের যে

এলোপাথাড়ি ঝড় বয়ে গেল তাতে তাঁর জীবন-তরী প্রায় ভরাডুবি হতে বসেছিল। পরিহাস-রসিক ভাগ্যবিধাতা তাঁকে বেশ খানিকটা নাকানি চুবোনি খাইয়ে ১৮৩৮ এর কূলে এনে ভিড়িয়ে দিলেন। তখন ঝড়ের মেঘ শান্ত। তার পিরামিড শীর্ষের ওপর দিয়ে উজ্জ্বল রুপোলি রেখা ফুটে উঠেছে অর্থাৎ এবার সুদিন।

সুদিনই সত্যি। শ্রীমতী কোঁতেসা জবরদস্ত পাওনাদারদের পাওনাগুলি সব মিটিয়ে দিয়েছেন। তদুপরি 'সেজার বিরোতো' একটা কাগজে ধারাবাহিক বেরোবে শুধু সেই বাবদে বালজাকের উপার্জন হয়েছে নগদ কুড়ি হাজার ফ্রাঁ। এমন দিনে যখন একটা পয়সা আজকের একটা টাকার সমান আর ইনকাম ট্যাক্স নামক কোন সরকারী পকেটমারও অজ্ঞাত—বালজাক নিঃসন্দেহে রাজালোক, অন্তত গত কয়েক বছরের তুলনায়। রাজা বালজাক অন্য অর্থেও, সমকালে বালজাকই গল্পের রাজা ফ্রান্সে। পকেট ভর্তি টাকা নিয়ে প্রকাশকরা উদ্‌গ্রীব হয়ে থাকে, বালজাক এসে হাত পাতলেই পকেট উজাড় করে দেবে। ঠিকানা জানা থাকলে বাড়ি বয়ে দিয়ে আসত। অফুরন্ত কর্মশক্তি ও বিশাল খনির মতন অভিজ্ঞতা নিয়ে এখন অনুমান করুন বালজাক বছরে ক'হাজার ফ্রাঁ রোজগার করতে পারেন। তাঁর জীবনীকার বলেন, ষাট হাজার ত অনায়াসে। রাজার হালে থেকে কর্মক্লান্ত অবসরে যৎপরোনাস্তি ফুর্তি-ফার্তা করেও অনায়াসে বালজাক তাঁর লক্ষ ফ্রাঁর ঋণ দু'বছরে শোধ করে দিতে পারতেন। দেশ জুড়ে এবং দেশের বাইরে তাঁর নাম। এ নাম মানুষের মনের মাটিতে অনেক দূর শিকড় গেড়ে বসে গেছে; এখন তাঁর বইয়ের নানা ধরণের সংস্করণ হচ্ছে, আরও হবে, সংকলন গ্রন্থ প্রস্তুতির পথে, যখন বেরোতে থাকবে, একটার পর একটা বেরোবে অতএব রাজার রথ রাজপথ ধরে চলতে আর বাধা কোথায়, কাকে ডরাবেন বালজাক। যাদের ভয়ে তিনি পালিয়ে ফিরতেন, তারা সবাই ত পদানত। অগণিত ভক্ত পথের দুপাশে, অলিন্দে, দেশে দেশে··· অথচ ১৮৩৮ থেকে সারা জীবনের এই রাজকীয় সম্ভাবনার মূলে কু-গ্রহের প্রভাবে কী কুড়োলটাই না মারলেন বালজাক।

দুটা বছর লিখে ধনপতি হবার ধৈর্য সইল না, তিনি রাতারাতি ধনকুবের হবেন! একটা অদৃশ্য কোন অনায়ত্ত শক্তি যেন বালজাকের ভাগ্য বিধাতা। আর সে বিধাতার বিধানও বড় বিচিত্র। যখনই তাঁর মাথার ওপরকার আকাশ নীল হয়ে আসে, সৌভাগ্যের আলোয় আরশির মতন ঝকঝকে হয়ে ওঠে দিগন্ত, অমনি কোথা থেকে কেমন করে আবার দুর্দৈবের কালো মেঘ জমতে থাকে। নৌকা যখন পাড়ে এসে ভিড়বার কথা, তখনই আবার উল্‌টো হাওয়ায় মধ্য-দরিয়ার

ঝড়-বাদলে আছড়ে পড়ে সে। এবার দুর্দৈব শুরু হল সারদিনিয়ার রুপোর খনি নিয়ে। কে একজন গল্প করে বলেছিলেন, রোমানদের পরিত্যক্ত রুপোর খনিতে এখনো সাতরাজার ধন লুকোনো আছে। আধুনিক যন্ত্রপাতি নিয়ে নামলে যে-কেউ রাতারাতি ক্রোড়পতি হয়ে যেতে পারে। এ গল্প শুনেছিলেন বালজাক ১৮৩৭ এর এপ্রিলে ইতালি থেকে ফেরার পথে। তারপরেই ত তাঁর জঙ্গী পাওনাদারদের দায় মিটান শ্রীমতী কোঁতেসা আর 'সেজার বিরোতো' ধারাবাহিক বেরোবে সে বাবদে পান বিশ হাজার ফ্রাঁ। সুতরাং রাতারাতি ক্রোড়পতি হতে আর বাধা কোথায়! না, বালজাকের বল্গাহীন কল্পনায় বাধা ছিল না কোন। বাধা পর্বত প্রমাণ হয়ে দেখা দিল যখন তিনি বাস্তবিক পা বাড়ালেন। বমি করে অসুস্থ হয়ে কর্সিকার ঘুরপথে দীর্ঘ সমুদ্র যাত্রার শেষে তিনি যখন সারদিনিয়ার আগঘিত্ররোর দ্বীপে এসে পৌছলেন তখনও রুপোর খনি বিশ মাইল দূরে। পথচিহ্নহীন সেই প্রান্তর অরণ্য পর্বত পার হয়ে যখন নুরা-র খনিতে পৌছলেন, দেখলেন এতদিনের সময় ও পরিশ্রম সব বৃথা গেছে। যে-ব্যক্তি তাঁকে খনির গল্প বলেছিলেন তিনি নিজেই রুপো সংগ্রহে লেগে গেছেন এবং সরকারের অনুমতি-পত্র তাঁরই মুঠোয়। ক্লান্ত অবসন্ন বিড়ম্বিত বালজাক ফিরে এলেন পারী।

সারদিনিয়ার স্বপ্ন দেখার আগে বালজাক একটি পাখির নীড়ের মতন বাড়ির স্বপ্ন দেখেছিলেন। এবং সে স্বপ্ন সত্য করতে পারীর শহরতলিতে তাঁর প্রেমিকার পল্লীর কাছে জমিও কিনেছিলেন।

সেই স্বপ্নের নীড় নির্মাণও শুরু হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু বাদ সাধল রৌপ্য-মরীচিকা। তারই হাতছানিতে দিশাহারা বালজাক নীড়ের স্বপ্ন ফেলে মরীচিকা ধরতে ছুটলেন। তার পরের খবর আগে বলেছি, বিধ্বস্ত হতাশ ও রুগ্ন হয়ে ফিরে এলেন বালজাক। কিন্তু হতোদ্যম হয়ে নয়। বালজাক আজ পর্যন্ত হতোদ্যম হন নি কখনো। পূর্ণোদ্যমে নীড়ের স্বপ্ন সত্য করতে লেগে গেলেন আবার; কিন্তু বিধাতার পরিহাস এখানেও তাঁকে ছায়ার মতন অনুসরণ করে এল। রৌপ্য-মরীচিকার পেছনে ছুটে তিন মাসে তিনি হাতের নগদ সব টাকা খরচ করে ফেলেছেন। আর বালজাকের সময় মানেই যেহেতু টাকা, তিন মাস সময় নষ্ট করা মানে কমসেকম ত্রিশ হাজার ফ্রাঁ নষ্ট করা—হাতের টাকা ও নিশ্চিত উপার্জনের টাকা এভাবে নষ্ট হলে তার ভাগ্যে যে দুর্ভোগ ঘটা উচিত বালজাকের ভাগ্যে তার ব্যতিক্রম ঘটল না। বাকিতে নগদে চেক-এ বিলে ধারে বাড়ির পেছনে আঠারো হাজার ফ্রাঁ খরচ করার পরে এক তুষার ঝড়ের রাতে দেয়াল ধসে পড়ল, কেন না

কনট্রাকটর পোক্ত করে ভিত গড়ে তোলে নি। মিস্ত্রি মজুর কনট্রাকটরের মতনই ফাঁকি দিয়েছে; তাই পৃথিবীর এক কোণে যেখানে পপলার বার্চ ম্যাগনোলিয়ার তরুণ চারা গাছে স্বর্গোদ্যান তৈরি হওয়ার কথা, চাষ হওয়ার কথা যেখানে লক্ষ ফ্রাঁর আনারস, দীর্ঘ তিন বছর পরেও তা স্তূপীকৃত আবর্জনার অনুর্বর পতিত জমি হয়ে রইল; কোন মতে খাড়া হয়ে থাকল টিলা-পাহাড়ের ওপরে পাখির নীড়েরই মতন একটি ডেরা। প্যারীর উন্মত্ত কোলাহল থেকে দূরে সেই নির্জনে আকাশের নীলাঞ্জন ছায়া মাখা শান্ত পরিবেশে বসে বালজাকের লেখার মুড্ স্বভাবতই খুব ভাল আসার কথা কিন্তু সে শান্তির নীড়েও শান্তি নেই। মাঝে মাঝে শ্যেন বিহঙ্গের মতন হঠাৎ এসে হাজির হয় পাওনাদার। বালজাকের এই একটা সুবিধে পাহাড়ের মাথায় থেকে নিচের বিস্তীর্ণ প্রান্তরে চোখ রাখতে পারেন এবং তাঁর নীড়ের দিকে কেউ এগোচ্ছে দেখলেই ঘরের মূল্যবান দ্রব্যসামগ্রী তাড়াতাড়ি সরিয়ে ফেলতে পারেন। সরাবেন আর কোথায়! নিকটেই ছিল শ্রীমতী কোঁতেসার গ্রীষ্মনিবাস—চাকরে আর মনিবে মিলে সেখানে সব সরিয়ে ফেলতে বেশীক্ষণ লাগত না। মাল ক্রোকের পরওয়ানা নিয়ে এসে পাওনাদারেরা ঘরের মধ্যে পেত কয়েক দিস্তে কাগজ কিছু পাখের কলম কালি চেয়ার টেবিল শোয়ার খাট। শূন্য ঘরে কোথাও আর কিছু নেই। অথচ তারা জানত বালজাকের মূল্যবান শৌখিন যা কিছু এখানেই আছে,—তবে কোথায় সেগুলি! কয়েকবার প্রতারিত হবার পর আসল খবরটা তারা টের পেল, পেয়েই ঠুকে দিল এক মামলা।

না, বালজাকের বিরুদ্ধে না, তাঁর প্রণয়িনী কোঁতেসার বিরুদ্ধেও না। তারা কোঁতেসার স্বামীর বিরুদ্ধেই ঠুকে দিল মামলা:

অভিযোগ মঁসিয়ে ছ্য বালজাকের যে সব মূল্যবান বস্তু পাওনাদারদের সিকিওরিটি বলে গণ্য সেগুলি মঁসিয়ে গিদোবোনি ভিসকোঁতি পাওনাদারদের ক্ষতিগ্রস্ত করবার উদ্দেশ্যে বালজাকের সঙ্গে স্বেচ্ছায় ষড়যন্ত্র করে নিজের বাড়িতে সরিয়ে রাখছেন।

আর যায় কোথা, শ্রীমতী কোঁতেসা ভীষণ ক্ষেপে গেলেন। যাওয়ারই কথা, কী না দিয়েছেন তিনি বালজাককে—সতীত্ব, অর্থ, মমতা, আর এ সব দিতে গিয়ে তিনি কুড়িয়েছেন নিন্দা আর অপযশ—কাগজঅলারা কুৎসা রটিয়েছে; কিছুই তিনি গ্রাহ্য করেন নি। তার প্রতিদান কিনা বালজাকের এই অবিমৃষ্যকারিতা! আজ তাঁর স্বামীর নামে মামলা! শ্রীমতী কোঁতেসা তার জুতো থেকে 'লে জারদা'-র ধুলো ঝেড়ে ফেলে স্রেফ কেটে পড়লেন, আর কোনদিন বালজাকের ছায়া

মাড়ান নি শ্রীমতী কোঁতেসা। মাদাম বেরনির পরে এই আর একজন একান্ত শুভানুধ্যায়িনী প্রেমিকাকে হারালেন বালজাক।

তবু ক্ষণকালের জন্যে বিষণ্ণ হয়ে থাকতে পারলেন না বালজাক; একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলবেন সে অবকাশ ছিল না তাঁর। তিন বছর ছিলেন তিনি তাঁর পাখির নীড়ের মতন বাড়ি 'লে জারদা'তে। আর সেখানে বসে তিনি দিনরাত উন্মাদের মতন কেবল কলম চালিয়েছেন তবু তিন বছর পরে তাঁর খেদোক্তি: "মন্দ থেকে আরও মন্দ হচ্ছে কেবল—আমার কাজ আমার ঋণ দুইয়েরই ওই এক দশা।" এই তিন বছরে, বছরে পাঁচখানা উপন্যাস লিখেও তিনি তাঁর ছ' অঙ্ক ঋণের কিছুই শোধ করে উঠতে পারলেন না। তাঁর তখন ৪০ বছর বয়স আর ঘাড়ের ওপরে একলক্ষ ফ্রাঁ ঋণের বোঝা। অনন্যোপায় বালজাকের মাথায় ঢুকল তিনি নাটক লিখবেন। স্টেজই হল একমাত্র জায়গা যেখানে শস্তা পয়সা, কুড়িয়ে তুলতে যা দেরি। নিত্য শো-য়ের শেষে মুঠো মুঠো টাকা আসবে হাতে। যেই চিন্তা সেই কাজ। কিন্তু নিয়তি কেন বাধ্যতে। দীর্ঘ দু'বছর থিয়েটার নিয়ে মেতে রইলেন। লিখে ফেললেন বেশ ক'খানা নাটক কিন্তু যা আশা করেছিলেন তার কিছু হল না। থিয়েটার দিল না তাঁকে কিছুই। ৪২ বছর বয়সে বালজাক আবার সর্বস্বান্ত নিরাশ্রয় ভিখিরী। ততদিনে তিনি শতাবধি বই লিখেছেন তাতে তাঁর সৃষ্ট চরিত্রের সংখ্যা দু'হাজারেরও বেশী এবং তার অধিকাংশই আপন বৈশিষ্ট্যে আজও অমর। অথচ বালজাকের মরদেহ তখন ক্ষুধা-কাতর মুমূর্ষু। তিনি ভাবছেন এমন একজন সহৃদয় ধনী বিধবা কেউ তাঁকে বিয়ে করতে রাজি হবেন কিনা, যিনি এখন তাঁর সব ঋণ শোধ করে দেবেন, বিনিময়ে বালজাক তাঁকে দেবেন তাঁর সমস্ত রচনার সব মুনাফা। অথবা চিন্তা করছেন, ব্রাজিলে গিয়ে বসবাস করবেন কিনা, তাঁর সাহিত্যের সমজদার ব্রাজিলের রাজা তাঁকে আশ্রয় দেবেন কিনা, দেবেন কিনা অবশিষ্ট জীবন নিশ্চিন্তে বসে লিখবার সুযোগ করে। মুক্তি! আজ তিনি মুক্তি চান—এই মর-তনু রক্ষার নিত্য তিক্ত সংগ্রামের দায় থেকে, পাওনাদারের লাঞ্ছনা থেকে, এই সদা-দাস্যের জীবন থেকে। অনন্যোপায় বালজাক অন্ধকার ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়ে অসহায় দুই হাত যুক্ত করে প্রার্থনা করেন কোনো ঐন্দ্রজালিক দেবীর অনুগ্রহের। এই সময়েই এই ভগ্নমনোরথ দৈবী অনুগ্রহের কাঙাল নিরুপায় বালজাকের হাতে এসে পৌছল ১৮৪২ সালের ৫ জানুআরিতে সেই কালো বর্ডার দেওয়া পত্রখানা। এক অভাবিত সংবাদ, "১০ নভেম্বর মঁসিয়ে দ্য হানস্কি পরলোকগমন করেছেন"। সাত বছর আগে কতিপয় দিনের দেখা অর্ধবিস্মৃত

একখানি রহস্যময় স্থিরযৌবনার মুখ মনে পড়ল বালজাকের। মনে পড়ল তাঁর প্রতিশ্রুতির কথা—"আমি স্বামী ত্যাগ করে তোমার ঘরে আসতে পারব না। তাঁর মৃত্যু পর্যন্ত তোমাকে অপেক্ষা করতে হবে।" এই প্রতিশ্রুতি কী মাদাম হানস্কা রক্ষা করবে! যদি করে! যদি করে! আশায় উৎসাহে উজ্জ্বল হয়ে উঠলেন বিষণ্ণ বিধ্বস্ত বালজাক। রাজকন্যা আর গোটা রাজত্ব তাঁর করতলগত হবে তখন—তখন বালজাক....তখন বালজাক...তখন যে বালজাক কী করবেন, এখনই যে তিনি কি করবেন ভেবে না পেয়ে চিঠিটা মুঠোয় করে অভিভূত হয়ে বসে রইলেন।

বালজাকের জীবনের আর এক অধ্যায়, শেষ অধ্যায় শুরু হল।

আট

বালজাকের জীবন যেন এক নিদারুণ কুটিল নদী। কখনও সে যেন এতটুকু সোজা পথে চলতে জানে না। পদে পদে কেবল বাঁক ফেরে সে, বাঁকে বাঁকে নতুন পথে অভিসারী হয়। ১৭৯৯ সালের ২০ মে তাঁর জন্ম। ওই বছরেরই জুন মাসে তাঁর জীবন-যাত্রা প্রথম বাঁক ঘুরল। মায়ের কোল থেকে দাইয়ের কোলে নির্বাসিত হলেন বালজাক। সেই থেকে ক্রমাগত এঁকে বেঁকে অনিশ্চিত ভবিষ্যতের দিকে পরম উদ্বেগের পথ বেয়ে চলেছে তাঁর জীবন। জীবনে তাঁর এমন একটা দিন আসেনি যেদিন তিনি একটা আরামের নিঃশ্বাস ছেড়ে বলতে পেরেছেন—আজ আমি নিশ্চিন্ত, আজ আমি সুখী। সুখ নেই বালজাকের কপালে। বালজাকের কপালে সুখ লেখেন নি বিধাতাপুরুষ। তাঁর জীবনে যত সুখ এসেছে সবই দুঃখের ছদ্মবেশ ; পরিণামে তাঁকে যন্ত্রণায় জেরবার করেছে কেবল।

এইবার হয়ত যথার্থ সুখ এল, "এবার হয়ত আমি সত্যি সত্যি সুখী হব।" দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে ভাবলেন বালজাক। কিন্তু আমরা জানি সুখী হওয়ার ভাগ্য বালজাকের নয়। সে আমরা গোড়া থেকেই দেখে আসছি। যদিও, সুখের দিকে সম্ভাবনার দিকে ১৮৪২-এর ৫ জানুআরির চিঠিখানা যে বালজাকের জীবনের মস্ত বড় বাঁক এবং তাঁর জীবনের শেষ বড় বাঁক তাতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু এ বাঁকের প্রান্তেও সুখের জীবন কুসুমাস্তীর্ণ নয়, বালজাক তা জানতেন। তিনি

জানতেন মাদাম ইভা দ্য হানস্কা জেনে গেছেন, লে জারদা-তে কোঁতেসা গিদো-বোনি ভিসকোঁতির বাড়ির গায়ে বালজাকের বাড়ি আর কোঁতেসার সঙ্গে বালজাকের গোপন প্রণয়। মাদাম মারবুতিকে নিয়ে বালজাকের ইতালি অভিসার-পর্ব ত সারা য়ুরোপের বৈঠকী গাল-গল্পের টক-ঝাল মিষ্টি ; সে যে য়ুক্রেন পর্যন্ত পৌছতে বাকি নেই তা কেউ না বলে দিলেও বালজাকের অজানা ছিল না। বস্তুত অস্থির ক্রোধে মাদাম হানস্কাই তীব্র তিরস্কারের ভাষায় তা জানিয়ে দিয়েছেন। আসলে আগুনকে যেমন অক্সিজেন ছাড়া জালিয়ে রাখা যায় না ভালবাসাও তেমনি : ভালবাসা ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্য চায়। নিকটতম ঘনিষ্ঠতার উত্তাপ না হলে সে বাঁচে না। অধিকন্তু ভালবাসা চায় আত্মসমর্পণ শরণাগতি। অথচ তাঁদের মধ্যে দীর্ঘ সাত বছরের অদর্শন। তদুপরি বালজাকের উদ্দাম যৌন-বিলাসের কেচ্ছা ইভার মন থেকে বালজাকের প্রতি তাঁর প্রগাঢ় মোহ অনেকখানি আবছা করে দিয়েছিল। বালজাকের প্রথম দায়িত্ব হল সেই আবছা হয়ে আসা প্রতিকৃতিতে নতুন করে রং চড়ানো।

কিন্তু তার জন্য তিনি আর ইনিয়ে বিনিয়ে কাঁদতে বসলেন না। ইভার তিরস্কারের চিঠি পড়ে তার জবাব দিতে বসে বালজাক উদ্ধত ভঙ্গীতে লিখলেন :

> "আমার ব্যাপারে নাকগলাতে বারণ করছি তোমাকে। আমি তোমার নিন্দা প্রশস্তি কোনটাই চাইনে। যার মাথার ওপরে দশ হাত জল, যে কোন মতে ভেসে ওঠার জন্যে প্রাণপণ লড়ছে তার রুদ্ধশ্বাস জীবনের যন্ত্রণা তুমি কী বুঝবে! তুমি ধনী। স্বামীর ঐশ্বর্যের ছায়ায় নিরাপদ সুখের জীবন কাটাচ্ছ। তুমি আমার মতন হতভাগ্যের দুঃখ বুঝবে না।"

আর এক চিঠির জবাবে আরও তীব্র হয়ে উঠেছিল বালজাকের অভিমান :

> "তুমি লিখেছ, আমি চপল লঘুচিত্ত! কিসে তুমি আমাকে চপল লঘুচিত্ত দেখলে? সেকি এজন্যে যে, দীর্ঘ বারো বছর ধরে ঘুম-বিশ্রাম-সুখ-আরাম সব—সমস্ত বিসর্জন দিয়ে আমি সাহিত্য-সৃষ্টির এক বিশাল কর্মকাণ্ডে মগ্ন আছি বলে? সে কি এজন্যে যে, দশ বছর তোমার মূর্তির পাশে আমার বুকে আর কারো জায়গা হয়নি বলে? নাকি, আমার মায়ের নির্মম অবহেলায় নিঃসম্বল আমি শূন্য হাতে জীবনের পথে যাত্রা শুরু করে ক্রমান্বয়ে ঋণে ডুবেছি আর সে ঋণ শোধ দিতে বারো বছর ধরে শুধু কালো কফি খেয়ে রাত জেগে চলেছি বলে? আমি দুঃসহ ঋণের বোঝা বহন করে চলেছি অথচ রিভলবারের গুলিতে আমার

মাথার খুলি উড়িয়ে দিইনি কি নদীর জলে ঝাঁপ দিয়ে পড়িনি, আমি চপল লঘুচিত্ত এ জন্যে ? বল, অনুগ্রহ করে বল, ঋণ পরিশোধ আর সাহিত্য-সৃষ্টির মধ্যে আমি আমার জীবনের আর সব—সমস্ত সুখ আরাম বিসর্জন দিয়েছি বলেই কি আমাকে তুমি চপলমতি লঘুচিত্ত বলে গাল পাড়ছ ?

"...চপলমতি ! লঘুচিত্ত !! সত্যি !!! নাপোলেওঁ যুদ্ধের প্রস্তুতি পর্বে যখন যুদ্ধ ক্ষেত্রের চারিদিকে অস্থির হয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে বেড়াতেন তখন তাঁকে দেখে তোমার মতন নৈষ্ঠিক বুর্জোআরাই কেবল বলতে পারে, "লোকটা কী অস্থির মতি, একটা জায়গায় একটুকাল সুস্থ হয়ে দাঁড়াতে পারে না। ওর কোন স্থির বুদ্ধি নেই।"

সাত বছর যাঁদের মধ্যে দেখা সাক্ষাৎ নেই তাঁদের মধ্যে চলেছে এইরকম পত্র লেখালেখি।

হ্যাঁ, ঝগড়া আর মন কষাকষি তাঁদের মধ্যে যারপর নাই তীব্র ও তিক্ত হয়ে উঠেছিল। সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যেতে পারত যে কোন মুহূর্তে। বালজাক ত একসময়ে প্রায় ঠিকই করে ফেলেছিলেন, দেখতে তার চেহারা যা-ই হোক প্রচুর অর্থের মালিক হলে বালজাক যে কোন একজন প্রৌঢ় বিধবাকে বিয়ে করতে রাজী। এ রকম একটা বিয়ে ঠিক করে দিতে বন্ধু বান্ধব অনেককেই তিনি চিঠি লিখে অনুরোধও করেছিলেন। একদিকে তেমন বিধবা ভাগ্যে জোটেনি বালজাকের তাই তখনও তিনি কুমার থেকে গেছেন, অন্যদিকে সমকালের শ্রেষ্ঠ লেখক বালজাকের নামের সঙ্গে নিজের নামটাকে জড়িয়ে রেখে মাদাম ইভা দ্য হানস্কার অমর হওয়ার লোভ বালজাকের চরিত্রহীনতার হাজার কিসসাও অবদমিত করতে পারেনি বলে, তাঁদের সম্পর্ক পরম তিক্ত হয়েও একেবারে ছিন্ন হয়ে যায়নি, ছিন্ন করে দিতে পারেন নি মাদাম ইভা। তাঁর কালের শ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিক তাঁর কাছে এমন নত জানু হয়ে প্রেম নিবেদন করছে, এ এক অসীম আত্মশ্লাঘার বস্তু হয়ে উঠেছিল তাঁর কাছে। আর বালজাকের চিঠি, সে ত নিঃসন্দেহে আর এক সম্পদ। ইভার এইখানেই ছিল মৌল দুর্বলতা। সর্বোপরি বিয়ে করতে চাক কিংবা অন্য যে কারণই মনের গভীরে থাক আভিজাত্যের প্রতি পরম লোভী বালজাক কখনও এমন বুদ্ধিমতী ধনী অভিজাত বিদুষী সুন্দরীর সঙ্গে বিচ্ছেদ ঘটাতে চান নি।

কিন্তু সম্পর্ক রাখার একমাত্র সূত্র পত্র লেখা বালজাকের পক্ষে এক নিদারুণ

বেদনার ব্যাপার হয়ে উঠেছিল। য়ুক্রেনের অলস নিরুত্তাপ জীবনে হানস্কার একমাত্র উত্তেজনা ও আনন্দ ছিল বালজাকের পত্র পাওয়া, বালজাককে পত্র লেখা। কোন কোন সপ্তাহে তিনি দু'খানারও বেশী পত্র লিখে ফেলতেন। কিন্তু বালজাকের পক্ষে তার প্রত্যেকটি পত্রের জবাব দেওয়া ছিল এক কঠিন সমস্যা। অথচ ইভার দাবি তাঁর প্রত্যেকটি পত্রের জবাব দিতে হবে।

"সারাদিন তোমার কোন কাজ নেই, কাজেই তুমি ক্রমাগত পত্র লিখে যেতে পার", টেবিলে ঘুষি মেরে চেঁচিয়ে উঠতেন বালজাক, "আর আমি! তোমাকে আমার পত্র লিখতে হলে? অবসর বলে আমার কি একটা মুহূর্তও আছে? দিনে পনর ঘণ্টা লিখে যাচ্ছি। লেখার ফাঁকে ফাঁকে প্রুফ সংশোধন চলছে। তারপর স্নান আছে খাওয়া আছে—যত কম হোক কিছু সময় তার জন্যে দিতেই হয়। শেষে থাকে একটু ঘুমোনোর কাজ। শরীরটাকে লেখার যোগ্য রাখতে ঘুমোতে অবশ্যই হয়, তা যত কম সময়ই হোক, যেমন ঘুমোতে হয় তেমনি আবার নতুন রচনা সম্পর্কে চিন্তা ভাবনাও করতে হয়—সর্বোপরি পাওনা আদায় আর পাওনাদারের চোখে ধুলো দিয়ে পালানোর মত একটা অপরিহার্য ব্যাপার ত আছেই, থাকছেই। এখন তোমাকে যদি আমার চিঠি লিখতে হয় এ সব মূল্যবান ও অনিবার্য কাজগুলি থেকে নিংড়ে বার করতে হয় সেই সময়টুকু।"

বালজাক যে শুধু রাগের মাথায় টেবিলে ঘুষি মেরে এ সব কথা সরবে ভাবতেন তাই নয়, হানস্কাকে সে-সব কথা লিখতেনও। একবার লিখেছিলেন:

> "...তুমি টাকার বিছানায় শুয়ে আছ। তুমি আমার অর্থ কষ্টের জ্বালা বুঝবে না। তোমাকে একটা দীর্ঘ পত্র লেখা মানে আমার কয়েক শ' ফ্রাঁ লোকসান। ওই পাতা ক'টা যদি আমি কোন কাগজের জন্যে কি পাবলিশারের জন্যে লিখি আমার শূন্য হাতে কয়েক শ' ফ্রাঁ আসে।"

"তাই লেখ", ইভাও তেমনি, কাটা কাটা কথার কাটা কাটা জবাব দিয়েছেন, "বেশ তাই লেখ। তুমি আমাকে চিঠি লিখো না। আমিও তোমাকে চিঠি লিখব না। তোমার পত্রের উত্তর দেওয়া ছাড়া, না, স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে আর একটাও পত্র লিখব না আমি।"

"বটে", পত্র পেয়ে গর্জে ওঠে বালজাক, "ছোট, কত ছোট তুমি, বুঝলাম এবার। আজকাল এ জন্যেই তোমার পত্রের সংখ্যা কমে আসছে। আমার পত্র লিখতে দেরি হয় বলে তুমিও তাই চুপ করে থাক। তোমার পত্রও অনেক বিলম্বে পাই আমি। কিন্তু তুমি কী জান, স্ট্যাম্প কেনার পয়সাও কখনো কখনো আমার

থাকে না? আমি কখনো তোমাকে এসব কথা বলতে চাই নি। তুমি আমাকে বলিয়ে ছাড়ছ। আমাকে তুমি অনন্যোপায় করে তুলছ, হ্যাঁ, শোন, আমি ডুবে যাচ্ছি ঋণে ঋণে, ক্রমাগত গভীর থেকে গভীরে তলিয়ে যাচ্ছি আমি। আজ আমি নিঃস্ব পথের ভিখিরীর তুল্য; কিন্তু এমন দিন আমার সবদিন ছিল না, একদিন আমার সব ক'টা পকেট ভর্তি থাকত টাকায়।"

আসলে দীর্ঘ অদর্শনে ক্রমশ উভয়ের প্রতি উভয়ের আকর্ষণ শিথিল হয়ে আসছিল, ঠাণ্ডা হয়ে আসছিল হৃদয়ের উত্তাপ। গোড়ায় দু'জনেই ভেবেছিলেন—ম'সিয়ে হ্ হানস্কির যে বয়স আর যে স্বাস্থ্য তাতে দু'তিন বছরের বেশী বাঁচবেন না তিনি। কিন্তু শত্রুর মুখে ছাই দিয়ে তিনি আরও আটটা বছর বেঁচে থাকলেন। অদর্শন ও বিচ্ছেদের এই দীর্ঘ ব্যবধানই তাঁদের ভালবাসার মূলে ঈর্ষা ও বিদ্বেষের বিষ ছড়াতে থাকল।

শ্রীমতী ইভার দাবি, "যতদিন না তুমি আমাকে পাচ্ছ, তুমি কেরানীর মতন মিতব্যয়ী আর সন্ন্যাসীর মতন সৎ থাকবে।" কিন্তু বালজাকের মতন তীব্র জীবনধর্মী মানুষের পক্ষে তা কেন সম্ভব হবে! তাই বলে এ ব্যাপারে বালজাকের কোন ঢাকঢাক-গুড়গুড় নেই। তিনি মাদাম হানস্কাকে পরিষ্কার জানিয়ে দিয়েছেন:

> "পুরুষ নিশ্চয় মেয়েমানুষ নয়, মেয়ে মানুষ কী? অতএব তুমি অবশ্যই চিন্তা করতে পার না যে, একটা পুরুষ ১৮৩৪ থেকে ১৮৪২ টানা ন'টা বছর একেবারে নারীবর্জিত থাকবে। আর চিকিৎসাবিজ্ঞানের এ কথাটাও নিশ্চয় তোমার জানা না থাকার কথা নয় যে, একটা পুরুষ যদি এতটা বছর যৌন সম্পর্ক-রহিত থাকে ত সে নির্ঘাৎ পুরুষত্বহীন হয়ে যায় কিংবা নিউরটিক জড় হতে বাধ্য হয়। তাই জেনেই হয়ত তুমি আমাকে বলেছিলে বারবনিতার কাছে যেতে। আমার সব যৌন-সম্পর্ক ত সে স্তরেরই। তুমি নিশ্চয় অবুঝ হবে না, দিনরাত কঠোর পরিশ্রম করে ক্লান্ত তদুপরি ঋণ-জর্জরিত একটা মানুষের কখনো-সখনো আত্মবিস্মৃতির দরকার......অথচ তুমি ক্রমাগত আমার দোষ ধরে যাচ্ছো, আমাকে শাস্তি দিচ্ছ কেবল, আমাদের বিচ্ছেদ যন্ত্রণার ওপরে সে আরও মর্মান্তিক।"

এভাবে দু'জনের মধ্যে ভুল বোঝাবুঝির বিকর্ষণ গভীর থেকে অথৈ ও দূর থেকে দুস্তর হতে হতে যখন ব্যবধান প্রায় অলজ্ঘ্য হয়ে উঠেছে তখন বালজাক

পেলেন সেই কালো বর্ডারের পত্র। ১৮৪১-এর ১০ নভেম্বর মঁসিয়ে দ্য হানস্কির দেহ রক্ষার সংবাদ। চরম দুঃসময়ে পত্রখানা এসেছিল বালজাকের হাতে। ডুবন্ত মানুষের হাতে তৃণগাছির মতন চিঠিখানাকে মুঠোয় করে ধরে অভিভূত হয়ে গিয়েছিলেন বালজাক। তার বিহ্বলতা কাটতে অনেকক্ষণ লেগেছিল।

বালজাকের তখন বয়স তেতাল্লিশ, আর যে কালবিলম্ব চলবে না, সে যে ভয়ানক মারাত্মক হবে তাঁর পক্ষে, মর্মে মর্মে বুঝেছিলেন বালজাক। তাঁর চাই শান্তি, নিরুদ্বেগ নিশ্চিন্ত অবসর। তা না পেলে যে মহৎ ব্রতে তিনি জীবন উৎসর্গ করেছেন তা সাঙ্গ করে যাবেন কী করে! তাই তিনি স্থির করলেন যেমন করে হোক ইভার ভাঙা মন জোড়া লাগাতে হবে, নতুন করে জয় করতে হবে তাঁর পুরাতন প্রেমিকাকে। আর তা করতে পারলেই তাঁর স্বপ্নের সাফল্য।

কিন্তু সে সাফল্য যে সহজলভ্য নয় বালজাকের বেশী সে আর কে জানত। যত বড় সাহিত্যিকই হোন না কেন বালজাক, তাঁর খ্যাতি হোক না বিশ্ববিস্তৃত, তবু তাঁর নামের আগেকার দ্য শব্দটি যে জাল, তিনি যে অভিজাত বংশের ছেলে নন, তাঁর ঠাকুর্দা যে একজন নিচ বংশজাত দরিদ্র কৃষক, হানস্কি পরিবার তা ভুলবেন কেমন করে, ফ্রান্সের আর সকলের মতন এ সংবাদ ত তাঁদেরও জানা।

তাই বালজাক চেষ্টা করলেন, ১. রাজার কাছ থেকে একটা খেতাব আদায় করতে। ২. ফরাসী আকাদমির সভ্য হতে; হতে পারলে মস্ত সম্মান, সঙ্গে বছরে দু'হাজার ফ্রাঁ বৃত্তি। ৩. অথবা অভিধান-কমিশনের সদস্য পদ পেতে; এতেও আছে রাজকীয় সম্মান, তদুপরি সম্মান-দক্ষিণা বছরে ছ'হাজার ফ্রাঁ। এ পদটি সবচেয়ে লোভনীয় এ জন্যে যে, এটি সারা জীবনের সদস্য-পদ, একবার সদস্য হতে পারলে আর নাম খারিজের ভয় নেই। কিন্তু সম্মানের এই শিখরচূড়া যেমন বন্ধুর তেমনি পিচ্ছিল। তবু জেদী মানুষ, একবার যখন মাথায় এসেছে কল্পনাটা তিন দরজাতেই গিয়ে ঢু মারলেন বালজাক। একমাত্র সাহিত্য-খ্যাতি ছাড়া অর্থ আভিজাত্য কিংবা সুপারিশ মদত যোগাতে আর কিছুই ছিল না তাঁর। অধিকন্তু দুর্নাম ছিল—তিনি অথৈ ঋণে ডুবন্ত, মাঝে মাঝেই পারী থেকে পালিয়ে অন্যত্র লুকিয়ে থাকতে হয়। তাঁর চরিত্র-দোষের গল্পে অভিজাত সমাজের বৈঠকখানা সর্বদা সরগরম, কাগজে কাগজেও তাই নিয়ে কেচ্ছা-কেত্তন কম হয়নি। অতএব……

…তবু যে-কোন একটা পদ কি খেতাব মুঠোয় আনতে প্রাণের দায়ে প্রাণপণ চেষ্টা করলেন বালজাক। কিন্তু যে-ফল প্রাংশু মানুষেরও নাগালের

বাইরে, বামন হয়ে তাই লাফ দিয়ে ধরতে চেয়ে বারবার ব্যর্থ বালজাক উপহসিতই হলেন শুধু। তখন আবার করে ফিরে এলেন রঙ্গ মঞ্চে। গেল বারের ব্যর্থতার অভিজ্ঞতা এবার কাজে লাগাবেন। রঙ্গমঞ্চে অসামান্য প্রতিভার চিহ্ন রেখে রাজকীয় খ্যাতি আদায় করে নেবেন, মনে মনে তাঁর সেই বাসনা।

তিনি কয়েক রাত জেগে 'লে রেসুরস দ্য ক্যানোলা' নাটকখানা লিখে ফেললেন। সঙ্গে সঙ্গে মহড়ায় ফেলা হল। একদিকে মহড়া চলছে আর একদিকে চলছে উদ্‌বোধন রজনীর জন্যে প্রবল প্রস্তুতি-পর্ব। বালজাক নিজে সেই প্রস্তুতি পর্বের ভার নিয়েছেন। বালজাকের পণ, তিনি উদ্‌বোধন রজনীকে বর্ণে সমারোহে আর ঔজ্জ্বল্যে এমন এক সুরে তুলে ধরবেন পারী শহর জন্মে যা কখনো দেখেনি। তিনি পারীর তামাম বুদ্ধিজীবীর চোখ ধাঁধিয়ে দেবেন, প্রথম দিনেই কানা করে দেবেন পূর্ববর্তী সমস্ত নাটক। পরিকল্পনা দ্রুত এগিয়ে চলল। সর্বোচ্চমূল্যের আসন-গুলি অলংকৃত করবেন নিমন্ত্রিত রাজকীয় অতিথিবৃন্দ—অ্যামব্যাস্যাডার, নাইট, পার্লামেন্টের স্টেট অফিসাররা। তারপরের আসনগুলিতে থাকবেন প্রতিপত্তিসম্পন্ন শিল্পপতি ও ব্যবসায়ীরা অবশেষে অভিজাত সম্প্রদায়ের ধনী পুরুষ ও তাঁদের সুন্দরী স্ত্রী কন্যারা। শেষমেশ যদি স্থান সংকুলান হয় বালজাকের যাঁরা ভক্ত তাঁদের কাছে উচ্চমূল্যে কিছু টিকিট বিক্রি করা হবে।

হাঁকডাকে গুরু ও গম্ভীর সে আয়োজন-উদ্যোগের খবর ছড়িয়ে পড়তে দেরি হল না। বালজাকের প্রচারযন্ত্র চমৎকার কাজ করছিল। আগাম টিকিট সংগ্রহের জন্যে বক্স অফিসে দীর্ঘ লাইন পড়ল। কিন্তু যার তার কাছে ত টিকিট বিক্রি চলবে না, শত্রু যারা নাটক দেখতে এসে টিটকিরি দেবে, বিড়াল ডাকবে, সিটি মারবে, বেছে বেছে তাদের বাদ দিতে হবে। সে কাজের দায় নিয়েছেন বালজাক স্বয়ং। তিনি যার চোখের দিকে তাকান তাকেই মনে করেন শত্রুপক্ষ, তার চোখের তারায় ঠোঁটের কোণে যেন বিদ্রূপের কৌতূহল দেখতে পান। ফলে ঠগ বাছতে গাঁ উজাড় হয়ে গেল। বিশ পঞ্চাশ খানার বেশী আগাম টিকিট বিক্রি হল না। ঘোষণা করে দেওয়া হল—হাউস ফুল। আর টিকিট নেই। বালজাক অভিজাত সমাজের মধ্যে গেস্ট কার্ড বিলি করতে থাকলেন। সেখানেও বাচবিচার আছে বই কী, সেখানেও ত আছে বালজাকের খ্যাতিতে ঈর্ষাকাতর নিন্দুক।

ফলে উদ্‌বোধন রজনীতে যখন অভিনয় আরম্ভ হতে আর ঘণ্টা খানেক বাকি দেখা গেল আধখানা হলই ফাঁকা। নিমন্ত্রিত যাঁরা এসেছেন এবং আসতে এখনও

বাকি সাকুল্যে তাঁরা আধখানা হলের বেশী নয়। এত এত আসন খালি থাকবে, অথচ কত মানুষকে ফিরিয়ে দেওয়া হল! আবার ঘোষণা করা হল সামান্য সংখ্যক আসন খালি আছে। অবিলম্বে টিকিট সংগ্রহ করুন। কিন্তু তখন আর লাইন নেই, উৎসুক নাট্যরসিকদের উৎসাহে ভাটা পড়ে গেছে ততক্ষণে। বক্স অফিসে সামান্য কয়েক জনের ভীড় দেখে চুল ছিঁড়তে শুরু করলেন বালজাক, আঃ, অনেকগুলি টাকা শুধু বুদ্ধির দোষে চোট্ হয়ে গেল।

কিন্তু আপসোসের সেই শেষ নয়, কেবল শুরু। প্রথমদিন নিমন্ত্রিত দর্শকরা কিছু বিশেষ বললেন না বটে কিন্তু পরবর্তী কয়েকটা রজনীতে আর হলে কান পাতা গেল না। পয়সা খরচ করে দর্শকরা এল যেন কেবল হৈ-চৈ করতে, চেঁচাতে, সিটি দিতে, বেড়াল ডাকতে। কেউ কেউ ছড়া কাটতে থাকল:

ফন্দীবাজ বালজাক,
করতে চাও বাজীমাৎ”

ব্যর্থ, হতাশ ও লাঞ্ছিত বালজাক গেলবারের মতন এবারেও স্টেজের পেছন দোর দিয়ে নিঃশব্দে বাড়ি ফিরলেন। এবং সে ব্যর্থতার শোধ তুলতে ডজনখানেক মোম একসঙ্গে জেলে মনোনিবেশ করলেন উপন্যাস রচনায়—দেখি উপন্যাস পড়তে পড়তে তোমরা উত্তেজনায় লাফিয়ে ওঠ, যন্ত্রণায় কেঁদে ফেল কিংবা সিটি দাও, বেড়াল ডাক, ছড়াকাট?

এই এক আশ্চর্য ব্যাপার বার বার দেখা গেছে বালজাকের মধ্যে। অন্যত্র ব্যর্থ লাঞ্ছিত হয়ে যখনই বালজাক গল্প উপন্যাস রচনায় মনঃসংযোগ করেছেন তখনই তাঁর হাত দিয়ে বেরিয়ে এসেছে অসামান্য সব রচনা। এবারেও তার ব্যতিক্রম ঘটল না। ১৮৪১ থেকে ১৮৪৩ দু'বছর আর কোন দিকে চোখ ফেরালেন না বালজাক; ফলে তাঁর জীবনের আরও ক'টি শ্রেষ্ঠ ফসল ফলল এ সময়ে, যেমন 'লা ফোস মেইত্রেস,' 'মেমোঅ্যার দ্য দ্যো জ্যোন মারিয়ে,' 'আলব্যের সাদারুস,' 'আঁ দেবু দাঁ লা ভি,' 'ওনোরিন', 'লা স্যুজ দ্য দোপার্ৎস'।

ভাগ্যিস মানুষগুলি সেদিন পয়সা খরচ করে গিয়ে বেড়াল ডেকেছিল, ছড়া কেটেছিল, শিস দিয়ে ছিল; যে কাজ যার সাজে না সেকাজ করতে যাওয়ার হঠকারিতাকে নিন্দা করেছিল; ভাগ্যিস ওই বাজে নাটকখানা মঞ্চসফল হয় নি; তাই ত বিশ্বের সাহিত্য-রসিকরা আরও কয়েকখানি অনবদ্য উপন্যাস উপহার পেলেন।

কিন্তু বিশ্বসাহিত্য-রসিকদের জন্যে সেদিন বালজাকের থোড়াই ভাবনা ছিল।

তাঁর সমস্ত চিন্তা দেহমন-আত্মা শুদ্ধু মগ্ন ছিল মাদাম ইভা ত্ব হানস্কার হৃদয় জয়ে, কেমন করে তাঁর মন ভোলানো যাবে সেই ধ্যানে।

> "ত্থাখো," মাদাম হানস্কাকে উপহসিত নাট্যকার বালজাক লিখলেন, "ত্থাখো, আর যেখানেই না কেন আমি ব্যর্থ হই, গল্প উপন্যাস রচনায় আমি শিরোমণি ছেলে, আমাকে পার হয়ে যাবে এমন প্রতিভা আজও জন্মায় নি।"

অথচ যাঁকে উদ্দেশ করে এমন কাতর চিঠি তাঁর মধ্যে তখনও প্রত্যক্ষ কোন চাঞ্চল্য নেই। সুমেরু শিখরে জ্যোতির্ময় নক্ষত্রের মতন স্থির অপলক জ্বলছেন তিনি—একবার তাঁকে দেখবার, তাঁর সান্নিধ্যে আসবার অনুমতি পর্যন্ত দিচ্ছেন না। বিয়ে করবেন না এমন কথা উচ্চারণ করছেন না; কিন্তু সে শুভদিন কবে কত দূরে তাও বলছেন না। লিখতে লিখতে অবসন্ন বালজাক মাঝে মাঝে মধ্যরাতে ফুঁপিয়ে কেঁদে ওঠেন, একী নিষ্ঠুর নীরবতা তোমার, একী নির্মম ঔদাসীন্য, ওগো এ তোমার কেমন পরীক্ষা!

কিন্তু পরীক্ষা যত কঠিন, কৃচ্ছ্রসাধনা যেন ততোধিক কঠোর। সব অবসন্নতা ঝেড়ে ফেলে বালজাক সোজা হয়ে বসেন। ঢকঢক্ করে একবারে অনেকখানি কালো কফি গিলে ফেলে আবার রচনার মধ্যে ডুবে যান। মন্ত্রের মতন করে আবৃত্তি করেন—হে সুদুর্লভা, তোমাকে আমি জয় করবই।

নয়

দূর আকাশের এক নক্ষত্র, রহস্যময় এক আলোর বিন্দু, অধরা, অলভ্যা সে অপলক তাকিয়ে আছে মাটির এক মানুষের দিকে। মাদাম হানস্কা আর মঁসিয়ে বালজাক। দুই আশ্চর্য মানুষ। একজন স্থির অবিচল নির্নিমেষ দৃষ্টি আর একজন ঊর্ধ্বমুখ আর্দ্র আঁখি নতজানু।

বিনীত প্রার্থনার চিঠি লিখছেন:

> "ওগো সুন্দর! আমি কী আমার ইভার কাছে এক্ষুনি অসম্ভব কিছু দাবি করছি। আমি শুধু জানতে চাই, তুমি শুধু বল: কবে সেই শুভদিন আসবে, একবছর, দেড় বছর, দু' বছর, কবে আমরা সুখী হব। আমি

কেবল চাই তুমি বল, 'আমরা', বল আমরা মিলিত হব অমুক এক সময়ে, আমার অপেক্ষার দিনগুলির এক জায়গায় একটা দাঁড়ি টেনে দাও। আমি অনিশ্চিত প্রতীক্ষায় অস্থির কাতর।"

এত অনুনয় সত্ত্বেও মাদাম হানস্কা নীরব কেন, কেন চাপা ঠোঁট নড়ছে না তাঁর, কেন রহস্যময় দৃষ্টি নিষ্পলক। জানতে হলে তাঁর ভাইকে লেখা মাদাম হানস্কার একখানা পুরোনো চিঠি পড়তে হয়।

মাদাম হানস্কা তাঁর স্বামী জীবিত থাকতেই বালজাককে তাঁর প্রণয়ী বলে স্বীকার করে নিয়েছিলেন ; কিন্তু সেই প্রণয়ের স্বীকৃতি ছিল ততটুকুই যতটুকু হলে তাঁর দাম্পত্য জীবনের শুচিতা নষ্ট হবে না, সমাজে তাঁর নামে কলঙ্ক রটবে না। স্বামী জীবিত থাকতে মাদাম হানস্কাকে তাঁর দ্বিধাগ্রস্ত মনের মুখোমুখি হতে হয়নি। বালজাকের সঙ্গে তাঁর প্রণয় পরিণয়ে পরিণত হবে এমন নিশ্চিত কোন সম্ভাবনা তখনও স্পষ্ট ছিল না। কাজেই মাদাম হানস্কা স্বামীর আড়ালে নিরাপদেই ছিলেন। বিপদ ঘটল স্বামীর মৃত্যুর পর। এখন তাঁকে সিদ্ধান্তে আসতে হবে : তিনি পারিবারিক ঐতিহ্যের গৌরব ও অর্থ নিয়ে অখ্যাত থাকবেন অথবা স্ব-কালের শ্রেষ্ঠ প্রতিভার প্রণয়িনী রূপে বিশ্ববিখ্যাত হবেন।

এই সমস্যার সামনে যে একদিন তাঁকে দাঁড়াতে হবে তা তিনি অনেকদিন আগে থেকেই অনুভব করেছিলেন ; স্বামীর জীবিত কালেই এ ভাবনায় তাঁর অবসরের অনেক সময় কেটেছে। তিনি যে কেবল একাএকাই এ-ভাবনা ভেবেছেন তা নয়, কোন কোন ঘনিষ্ঠ শুভানুধ্যায়ীকে এ ভাবনার শরিকও করেছেন। সেই শুভানুধ্যায়ীদের একজন তাঁর ভাই। ভাইকে যে চিঠিখানা লিখেছিলেন এখানে তারই সারমর্ম তুলে দিচ্ছি। এ পত্রেই সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে মাদাম হানস্কার অন্তর্দ্বন্দ্ব, অন্তর্দ্বন্দ্বের স্বরূপ, এবং তাঁর দ্বিধা ও ভয়।

> "...আমার স্বামীর মৃত্যুর পরে তোমার ভবিষ্যৎ ভগ্নিপতি কে হবে সন্দেহ করে তুমি খুব বিচলিত হয়েছ ; কিন্তু আমি তোমায় এ কথা জানাতে পেরে আরাম বোধ করছি যে, আমি তেমন কোন সিদ্ধান্তে আসি নি এখনো, আর তেমন কোন সিদ্ধান্তে আসতে বাধ্য হব এমন অনিবার্য কারণও দেখছি না এখন অবধি, অবশ্য তোমার কাছে স্বীকার করতে কুণ্ঠা নেই, আমি বালজাককে ভালবাসি। তুমি যতখানি অনুমান করেছ হয়ত তার চেয়ে অনেক বেশীই ভালবাসি। আমার নিঃসঙ্গ জীবনে বালজাকের চিঠিগুলি এক মহৎ ঘটনা, এক মূল্যবান সম্পদ। আমি তাঁর চিঠির



ইভান্ত হান্সকা (৩৫)
(শিল্পী দাফ্ফাঁ্যাজের-এর আঁকা তৈল চিত্র)

জন্যে কী ব্যাকুল হয়ে অপেক্ষা করি তুমি বুঝবে না। আমি সে চিঠিগুলি যখন পড়ি তখন আর আমাতে আমি থাকি না, সে আমাকে এক অলৌকিক রহস্যে আচ্ছন্ন আবৃত করে ফেলে। আমার জন্যে তাঁর যে বিস্ময় ও ভালবাসা সে আমার এক অসীম অহংকার। বালজাকের জীবনে যত নারী এসেছে আমি যে তাদের সবাইকে ছাড়িয়ে তাঁর আত্মার আকাশে অনির্বাণ এক নক্ষত্র হয়ে উঠেছি, সে সুখের কোন তুলনা নেই। আমার এত সুখ এত অহংকারের মূলে মানুষটির প্রতিভা। এমন প্রতিভা এর আগে সৃষ্টি করতে পারে নি ফ্রান্স। আমি যখন এ কথা ভাবি, মানুষটির আর কোন দোষ আমার চোখে পড়তে চায় না। আমি অন্ধ হয়ে থাকি। এমন প্রতিভার ঐকান্তিক ভালবাসা পেলে কে না আচ্ছন্ন আবিষ্ট হয়! মনে হয় আমি তাঁর উপযুক্ত নয়, অতিশয় অকিঞ্চিৎকর তাঁর কাছে। অনুপযুক্ত অকিঞ্চিৎকর হয়েও এত ভালবাসা পাওয়ার ভাগ্য যে কী গৌরবের, পুরুষ হয়ে তুমি নারী-মনের সে আবেগকে ধরতে পারবে না।

"ভালবাসায় এমন আচ্ছন্ন অন্ধ হয়েও তবু, আমি যখনই তাঁর সঙ্গে একলা হয়েছি এমন কতকগুলি দোষ আমার চোখে পড়েছে যার জন্যে আমি কষ্ট বোধ না করে পারি নি, মনে হয়েছে, যে দোষ আমি দেখছি অন্য মানুষও সে দোষ দেখছে এবং দেখে মানুষটিকে ছোট করছে, তুচ্ছ করছে। এ সব সময়ে আমার ভীষণ কান্না পেয়েছে, ইচ্ছা হয়েছে আচ্ছা করে বকে দিই মানুষটিকে, আর অন্য মানুষদের চোখ ফুটিয়ে দিই তাঁর মহৎ প্রতিভার দিকে যাতে না দোষগুলি আর চোখে পড়ে।

"মঁসিয়ে ছ হানস্কি মারা গেলে আমার ভাগ্যে কী ঘটবে এক্ষুনি আমি তা ভাবতে চাইনে। তবে আশা করি আমি আমার পারিবারিক কর্তব্য ঠিক করে যেতে পারব, এত দিন যেমন করে আসছি। এ শিক্ষা আমি বাবার কাছে পেয়েছি, এ শিক্ষা আমার রক্তে।

"এ আমার পরম ভাগ্য যে এখনও সিদ্ধান্তে আসার নির্মম সময় আসে নি। আস্‌লে কী করব জানি না। কেবল কখনো কখনো আমি বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ভুলে গিয়ে সেই মানুষটিকে শুধু ভাবি, যে আমার জন্যে সর্বস্ব ত্যাগ করতে প্রস্তুত অথচ যাকে আমার দেওয়ার মতন কিছুই হয়ত নেই।"

ওপরে যে পত্রের মর্ম তুলে দেওয়া হল তার থেকেই স্পষ্ট এখন মাদাম হানস্কার দ্বিধা কোথায়, অনিশ্চয়তার যন্ত্রণায় কেন তিনি এমন করে ভোগাচ্ছেন বালজাককে।

এ ত গেল মাদাম হানস্কার অন্তরের দিক থেকে তুজনের মিলনে বাধা। বাগড়া দিতে তা ছাড়াও কতকগুলি নিষ্ঠুর বাহু উদ্যত ছিল।

সেই নিষ্ঠুর বাহুগুলি বাড়িয়ে দিয়েছে তাঁর আত্মীয় স্বজন, স্বার্থান্বেষীরা। জারের আইনও কম বড় বাধা নয়।

মঁসিয়ে হানস্কির জীবদ্দশায় মাদাম হানস্কা স্বামীর ছত্রচ্ছায়ায় নিরাপদ ছিলেন। তাঁর মৃত্যুর পরে সকলে এক জোট হল। পার্শ্ববর্তী জমিদার মঁসিয়ে হানস্কির আত্মীয় স্বজনরা ত বটেই, এমন কি সেণ্ট পেতেরস্‌বুর্গে ও পারীতে যাঁরা ছিলেন তাঁরাও এসে হাত মেলালেন এই ষড়যন্ত্রে। এঁরা সকলেই জানতেন, বালজাকের সঙ্গে মাদাম হানস্কার একটা গোপন প্রণয়-সম্পর্ক অনেক দূর অবধি শিকড় ছড়িয়েছে। এ সম্পর্ক পরিণয়ে পরিণত হলে মঁসিয়ে হানস্কির অতুল ঐশ্বর্য যা উত্তরাধিকারসূত্রে মাদাম হানস্কারই প্রাপ্য, পাছে একজন ফরাসীর—প্রকারান্তরে ফরাসী সরকারের হাতে চলে যায়! তাঁরা প্রাণপণে বাধা দিতে উদ্যত হলেন।

এক আত্মীয় ত একটা মামলাই ঠুকে দিলেন। তাঁর আরজি, মাদাম হানস্কাই মঁসিয়ে হানস্কির সম্পত্তির একমাত্র উত্তরাধিকারিণী নন, আমিও তার একজন অংশীদার। ছোট আদালতে ভদ্রলোক মামলায় জিতেও গেলেন। মাদাম হানস্কা তখন আপিল করলেন উর্ধ্বতন আদালতে। সেণ্ট পেতেরস্‌বুর্গে এলেন। প্রয়োজন হয় ত তিনি জারের দরবারেও দৌড়োদৌড়ি করবেন।

মাদাম হানস্কা যখন এই মামলা মোকদ্দমা নিয়ে অস্থির, তখন ভীমরুলের ঝাঁকের মতন এসে চারধার থেকে ছেঁকে ধরেছে তাঁকে তাঁর নিজের এবং স্বামীর পরিবারের আত্মীয় স্বজন বন্ধু বান্ধব, বিশেষ করে ওই সব পরিবারের মহিলারা। তাঁদের পণ—বালজাকের চরিত্র নিয়ে কেচ্ছা খেউর ছড়িয়ে বালজাকের প্রতি মাদাম হানস্কার মন বিষিয়ে তুলবেন।

এমন যখন মাদাম হানস্কার অবস্থা, তখন বালজাক চিঠির পর চিঠি লিখছেন। "তোমাকে একটু দেখব। ক্ষণকালের জন্যে হলেও তোমায় দেখবার সুযোগ আমাকে একবার দাও। তুমি অনুমতি দাও আমি সেণ্ট পেতেরস্‌বুর্গে আসি।"

এই নাছোড়বান্দা দাবির কাছে মাঝে মাঝেই আত্মসমর্পণ করতে চেয়েছেন মাদাম হানস্কা কিন্তু যখনই মনে হয়েছে এই প্রেম-পাগলা মানুষটির সংযম বড় কম, কাণ্ডজ্ঞান আরও কম তখনই তিনি সন্ত্রস্ত হয়ে উঠেছেন। বালজাক যে গোপনে

আসতে পারবেন, নিভৃতে তাঁর সঙ্গে দেখা করে চলে যেতে পারবেন তেমন সম্ভাবনাও নেই। এই বিখ্যাত মানুষটি যেখানে পা রাখবেন সেখানে রাজ্যের মানুষ এসে ভিড় করবে। তাদের কালের শ্রেষ্ঠ লেখককে একবার দু চোখ ভরে দেখতে চাইবে না এমন মানুষ কেউ নেই। মাদাম ইভা তা জানতেন বলে তাঁর আতঙ্ক ছিল এত বেশী। তবু যদি মানুষটি সংযমী, মিতভাষী, সামাজিক হতেন, ভারসাম্য রক্ষা করতে জানতেন! কিন্তু এসব সামাজিক শিক্ষা কোথায় পাবেন ওই চাষার বংশধর—ইভার যন্ত্রণা ত সেইখানে। মোটা বেঢপ বেঁটে মানুষটির মধ্যে কোথাও এতটুকু আভিজাত্যের চিহ্ন নেই। অথচ কলমে তাঁর কী ঐশ্বর্য, কী জাদু! ইভা শিউরে ওঠেন। এঁকে না পারা যায় দুবাহু বাড়িয়ে বুকে নিতে, না পারা যায় নির্মম হয়ে দূরে সরিয়ে দিতে। ইভা ঠোঁটে ঠোঁট, দাঁতে দাঁত চেপে যন্ত্রণার ধূসর সময় পার হন। বালজাকের পণ তখনও অটুট। "তোমাকে আমি চাই, তুমি আমার সাধনার ধন, স্বপ্নের রানী। যন্ত্রণার শান্তি, আমার পরমায়ু।"

বালজাকের নিষ্ঠা আর ধৈর্য অবশেষে সাফল্যের কূলে এসে ভিড়ল। ইভা অনেক সাবধান করে, অনেক সতর্ক তিরস্কার উচ্চারণ করে জানালেন, "হাঁ তুমি সেণ্ট পেতেরস্‌বুর্গে আসতে পার আমার সঙ্গে দেখা করতে।

মঁসিয়ে হানস্কির মৃত্যুর দেড় বছর পরে ১৮৪৩-এর জুলাই মাসে প্রিয়া-সন্দর্শনের সনদ পেলেন বালজাক।"

বালজাকের সে আর এক সাফল্যের রোমাঞ্চকর ইতিহাস।

দশ

এক মুগ্ধ পাঠিকার বুকের উত্তাপ বহন করে ১৮৩২ সালে একখানা দীর্ঘ চিঠি এসেছিল। সেই থেকে সূচনা। সুদূর যুক্রেনের রূপসী বিদেশিনী তাঁর মনের মাধুরী মিশিয়ে বালজাককে তাঁর কালের অতুলনীয় কথাশিল্পী বলে অভিনন্দিত করেছিলেন। কিন্তু শুধু প্রশংসা, মুগ্ধ পাঠিকার প্রাণের অর্ঘ্যই শুধু ছিল না; চিঠিতে বালজাকের রচনার স্থূল রুচির অংশগুলির ওপরে ছিল তীব্র কটাক্ষ, সংশোধনের জন্যে ছিল গম্ভীর উপদেশ, সনির্বন্ধ অনুরোধ

দিগ্বলয়ে অদৃশ্য এই বিদেশিনী আস্তে আস্তে বালজাকের মনের আকাশে উজ্জ্বলতম নক্ষত্র হয়ে উঠলেন।

সেই ভালবাসার নক্ষত্রের দিকে অতন্দ্র দৃষ্টি রেখে বালজাক তাঁর ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ ভাগ্যের সমুদ্রে পাড়ি জমান, লক্ষ্য ওই নক্ষত্রের বন্দর।

এত কাল পরে বুঝি সেই ভালবাসার আলো পথচিহ্ন-হীন সমুদ্রে বালজাককে পথ চিনিয়ে তার আপন বুকের ভূমিতে পৌঁছে দিল।

সেণ্ট পেতেরসবুর্গে মাদাম হানস্কার সঙ্গে দেখা করবার অনুমতি পেলেন বালজাক।

মাদাম হানস্কা রাশিয়ার কুবের পরিবারগুলির অন্যতম এক পরিবারের রূপসী বিধবা। এখন বালজাককে তাঁর মর্যাদার সমান হতে হবে। তিনি ভিখিরীর বেশে প্রেম ভিক্ষে করতে যাচ্ছেন না। তাঁর প্রতিভার ঐশ্বর্য, তাঁর জীবন যাপনের স্টাইল বহন করে যাবেন সেণ্ট পেতেরসবুর্গে। তিনি অনুগ্রহের ভালবাসা নয়, যোগ্যের ভালবাসা আদায় করবেন।

সেই সঙ্কল্প নিয়ে প্রণয়িনীর কাছে, সেণ্ট পেতেরসবুর্গে যেতে হলে টাকা চাই, অনেক টাকা। লক্ষাধিক ফ্রাঁ ঋণের দায়ে আবদ্ধ বালজাক টাকার স্বপ্ন দেখছেন। কম করেও পনের কুড়ি হাজার ফ্রাঁ তাঁর পকেটে থাকা চাই।

টাকার জন্যে হন্যে কুকুরের মতন ছুটে বেড়ান নি জীবনের এমন একটা দিনের কথাও বালজাক চিন্তা করতে পারেন না, তথাপি ভাগ্যই হোক অথবা অমিত দুরাশা, তিনি কোনদিন তাঁর সংকলন গ্রন্থের স্বত্ব বিক্রি করে দিতে রাজী হন নি। আজ প্রতিভার ভাস্বর মধ্যাহ্নে এসে স্বত্ব বিক্রয়ের প্রশ্ন আর নেই, আজ রয়েলটির প্রশ্ন, কে সবচেয়ে বেশী টাকা অ্যাডভান্স রয়েলটি দেবে, দিতে পারে তাঁকে, এই

জিজ্ঞাসা তাঁর মুখে। এগিয়ে এলেন ফুবশে-র বিখ্যাত প্রকাশক-সংস্থা ফার্ন অ্যাণ্ড হেৎসেল। ১৮৪২-এর ১৪ এপ্রিল চুক্তি সম্পাদিত হল। রয়েলটি বাবদ বালজাক অগ্রিম পনর হাজার ফ্রাঁ পেলেন। এবং চুক্তি অনুসারে আরও মোটা টাকা পাওনা থাকলো প্রকাশকের কাছে।

এই সংকলন গ্রন্থেরই সেই অমর নাম "কমেদি য়ুমেন" হিউমেন কমেডি।

প্রথম বালজাক এর নামকরণ করতে চেয়েছিলেন "কলেকটেড ওয়ার্কস"। পাবলিশারই আপত্তি তুললেন, অত্যন্ত গতানুগতিক নাম হয়ে যাচ্ছে। এতে করে আগ্রহী পাঠকের মন ভোলানো শক্ত হবে। বৃহৎ বইয়ের একটা মহৎ নাম চাই। বালজাকের শ্রেষ্ঠ উপন্যাসগুলিই এ সংকলনে খণ্ডে খণ্ডে বেরোচ্ছে অতএব শ্রেষ্ঠত্বের চিহ্ন কেন থাকবে না তার নামে।

নামটি বালজাকের নয়, আবিষ্কার তাঁর বিশিষ্ট বন্ধু দ্য বেলোআই-এর। সদ্য ইতালি থেকে ফিরেছেন। সেখানে ইতালির সাহিত্য অধ্যয়ন কালে "দিভাইনা কমেদিআ" পড়েছেন মৌল ভাষায়। দান্তের স্বপ্ন তখনও তাঁর বুক ভরে আছে। সেই স্বপ্ন থেকে দ্য বেলোআই উদ্ধার করলেন এই অমর নাম 'লা কমেদি য়ুমেন'। য়ুরেকা বলে আনন্দে চিৎকার করে উঠলেন বালজাক, খুশীতে বুক ভরে গেল প্রকাশকেরও।

এখন সমস্যা দেখা দিল এ হেন মহান সৃষ্টির ভূমিকা লিখবেন কে? বালজাক রাজী নন, কেন না তাঁর হাতে অধিকতর লোভনীয় অন্য রচনা অসম্পূর্ণ পড়ে আছে। তখন যোগ্য ব্যক্তি খুঁজে খুঁজে মিলল ফেলিক্স দাভ্যাঁ-কে। কিন্তু তিনি রাজী হলেন না। অবশেষে বালজাকের অন্যতম অনুরাগী প্রাজ্ঞ সমালোচক জরজ স্যান্ড্-কে অনুরোধ করা হল। তিনিও বিনীতভাবে অক্ষমতা প্রকাশ করলেন, এ সাহিত্য-বারিধি মন্থন করে মুক্তো তুলে এনে ভূমিকায় পাঠকের হাতে তুলে দিতে তাঁর সাধ্য নেই। এ পারেন স্বয়ং লেখক। স্রষ্টাই শুধু তাঁর সৃষ্টির মৌল প্রেরণাকে ভূমিকার মাধ্যমে পাঠক-মনে সঞ্চারিত করে দিয়ে তাঁর সাহিত্য পাঠে পাঠকের মন প্রস্তুত করে দিতে পারেন।

প্রকাশক হেৎসেল তখন বালজাককেই একখানা পত্র লিখে ঐকান্তিক অনুরোধ জানালেন,

> "বহু বিদ্বৎজনের সঙ্গে কথা বলে আমি এই সিদ্ধান্তে এসেছি, আপনিই একমাত্র ব্যক্তি যিনি এ সংকলনের ভূমিকা লিখতে পারেন। আপনার মনের মধ্যেই রয়েছে আপনার সৃষ্ট ব্রহ্মাণ্ড। তাকে আপনি যত

পুঙ্খানুপুঙ্খ জানেন এমন-আর কেউ না। অতএব আপনিই কলম ধরুন।……লেখায় যতখানি সরল ও বিষয়ানুগ হতে পারা যায় চেষ্টা করবেন। আপনি যে সাফল্য চেয়েছিলেন সে সাফল্য অর্জন করেছেন, লেখায় এ আন্তরিক তৃপ্তিটুকু যেন প্রকাশ থাকে। খুব শান্ত নম্রভাবে পাঠকের সঙ্গে কথা বলুন। মনে করবেন যেন আপনি এক প্রবীণ পরিণত চিন্তার মানুষ, আপনার অতীত দিনগুলির বিশাল পটভূমির দিকে স্নেহের চোখে তাকিয়ে আছেন। আপনার চরিত্র-রা যেমন ভাবে কথা বলে, আপনার ভূমিকার ভাষা হবে সেই রকম, এবং তা পারলেই এক অমূল্য রচনা বেরিয়ে আসবে আপনার কলম থেকে। আপনাকে এই অনুরোধ পাঠানোর জন্যে এই ক্ষুদ্র প্রকাশককে ক্ষমা করবেন। মনে করবেন, আপনার মহৎ হৃদয়ের কাছে এ আমার এক বিনীত আবেদন।”

বালজাককে দিয়ে ভূমিকাটি লিখিয়ে নেওয়ার এই কৌশল কাজে লাগল। প্রকাশকের অতি বিনীত আবেদনের চিঠিখানি বালজাককে উৎসাহিত করল। বালজাকের কল্পনা উদ্দীপ্ত হয়ে উঠল। তারই ফলশ্রুতি 'কমেদি যুমেন'-এর বিখ্যাত ভূমিকাটি।

বালজাক মাদাম হানস্কাকে বলেছিলেন, "এই যে ছাপার হরফে ষোল পাতার ছোট্ট ভূমিকাটি দেখছ, একটা গোটা উপন্যাস লেখার চেয়ে অনেক বেশী শ্রম চিন্তা নিষ্ঠা ব্যয় হয়েছে এর পেছনে।"

মাদাম হানস্কাকে তিনি অমিত অহংকার বশে অতিশয়োক্তি করেন নি। এক অনন্যনিষ্ঠ অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে এই ভূমিকায় মানুষের মৌল গঠনটাকে তিনি ব্যাখ্যা করেছেন। "প্রকৃতির কোলে থেকে পশু পাখিরা তাদের স্ব স্ব পরিবেশের প্রভাব অনুযায়ী আপন বৈশিষ্ট্যে বিশেষ প্রাণী হয়ে বেড়ে ওঠে। ঠিক সেই ভাবে মানুষেরাও। মানুষেরা যে যেমন সামাজিক পরিবেশে বাস করে ও শিক্ষা পায় সে তেমনই হয়ে ওঠে, তদনুরূপ স্বভাব অর্জন করে, তার প্রভাব কখনো এড়াতে পারে না মানুষ।" বালজাক ভূমিকার আর এক জায়গায় লিখেছেন "তিন চার হাজার চরিত্র সমাবেশ করে যদি কেউ মানুষের হৃদয়ের ইতিহাস উন্মোচন করতে বসে ত সমাজের প্রতিটি স্তরের প্রতিনিধি হিসেবে একটি করে অন্তত চরিত্র রাখতে হবে যার মধ্যে দিয়ে সংশ্লিষ্ট শ্রেণীর কামনা বাসনা সুখ দুঃখ অর্থনীতি ছবির মতন ফুটে উঠবে। আর এই সামাজিক ছবিটি চরিত্রের হৃদয় সমেত তুলে ধরতে হলে শিল্পীর সৃজন-ক্ষমতাকে এমন নিষ্ঠার সঙ্গে নিযুক্ত করতে হবে, যাতে করে সেই মহান

ইতিহাসের চরিত্র এবং ঘটনা ওতপ্রোত হয়ে গিয়ে তা পূর্ণাঙ্গ গল্প হয়ে উঠবে, প্রতি অধ্যায় হবে এক একখানি উপন্যাস, প্রতিটি উপন্যাস হবে এক একটি 'ঈপক'। আর সমস্ত উপন্যাস মিলিয়ে মানবেতিহাসের একটি যুগ। যে যুগের প্রভাব আগামী অনেক যুগকে পথ দেখাবে।"

"মানুষের ব্যক্তি-প্রকৃতিতে অনন্ত বৈষম্য, অতএব শিল্পীর কাজ কেবল পর্যবেক্ষণ" এ কথা বলে বালজাক তাঁর বক্তব্যের মৌলে এসে পৌছেছেন। দেখার সুযোগই হল সব মহৎ ঔপন্যাসিকের সৌভাগ্য। সৃজনশীল শিল্পী হতে হলে প্রত্যক্ষ বাস্তবজীবনে মানুষকে অনুশীলন করতে হবে।......এখানে বালজাক প্রকাশ্যে ঘোষণা করেছেন 'রিয়্যালিজম'ই হচ্ছে ঔপন্যাসিকের সব বড় দায়। একথা বলে বালজাক তক্ষুনি আবার বলেছেন, "সে উপন্যাস মূল্যহীন যে কোন সত্যদ্বারা বিধৃত হয় না ; শুধু তাই না, সত্যদ্বারা বিধৃত হয়ে তাকে উন্নততর জীবন ও জগতের কথা শোনাতে হবে।"

বালজাক কথঞ্চিত শোনাতে পেরেছেন। তাঁর প্রতিভার সৃষ্টি সম্পূর্ণ না হতেই অকালে মৃত্যু এসে তাঁকে গ্রাস করেছে। নয়ত তাঁর হাতে সভ্যতার ভাস্কর্য এক পরিপূর্ণ মানুষের ব্যক্তিত্বের সর্বাঙ্গীণ স্বরূপ হয়ে উঠতে পারত। আজ সে এক অসম্পূর্ণ মূর্তি মাত্র, তবু কী ভাস্বর!

যাক্ টাকা কড়ি কুড়িয়ে বাড়িয়ে তা মন্দ হল না। তাঁর প্রতিভার গৌরবের যোগ্য চালেই তিনি সেন্ট পেতেরসবুর্গের অভিজাত মানুষের মধ্যে বিচরণ করতে পারবেন।

বালজাকের বুকের ভিতরে এতকালের সেই পরম আশার নিবুনিবু বাতিটা অনুকূল বাতাসে আবার উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে।

প্রেম এবার প্রাণের সাথে হাতে হাত মেলাবে। আর বিচ্ছেদ নয়। না, বিচ্ছেদ আর সহ্য হচ্ছে না। প্রতীক্ষার শেষ হোক, শেষ কর রহস্যময়ী তোমার রহস্যের খেলা। অবগুণ্ঠন খোল। প্রিয় মুখখানি চার্চের উজ্জ্বল মোমের আলোতে অলৌকিক হয়ে উঠুক, আমি দেখি।

কিন্তু এ বড় কঠিন প্রেম—মাদাম হানস্কার প্রেম ফুলের মালা নয়, যেন তরবারি।

আসলে মাদাম হানস্কারও দোষ নয়, এ যেন ওঁদের নিয়তি। একটা তৃতীয় শক্তি দুটি হৃদয়ের আকুল আকাঙ্ক্ষাকে নিয়ে যেন লোফালুফি খেলছে। দুই বিপরীত পরিস্থিতিতে পড়ে কেউ কাউকে বুঝছে না, কি কেবলই ভুল বোঝাবুঝি

চলছে। মাদাম হানস্কা দুরদুর বুকে ভাবছেন, এই অলোকসামান্য প্রতিভা যখন সেণ্ট পেতেরসবুর্গে আসবেন, অগণিত মুগ্ধ ভক্ত এসে ভীড় করবে তাঁকে ঘিরে, আমাদের নিভৃত মিলন—তার কী হবে?

এগার

অনেকের ধারণা মাদাম হানস্কা যেন ইচ্ছে করেই একটা অনপনেয় ব্যবধান প্রথমাবধিই জিইয়ে রাখতে চেয়েছেন। যেন একটা বিদ্বেষই ছিল তাঁর মনের মধ্যে। বিদ্বেষটা যেন নিজের প্রতিই ছিল, নিচুজাতের এই কুৎসিত মানুষটাকে কেন ভালবাসলাম, হোক অসামান্য কথা-শিল্পী, তাই বলে ভালবাসতে হবে? মাদাম হানস্কা নাকি নিজেকে এ ভাবে ধিক্কৃত করতেন আর সে ধিক্কারই বিদ্বেষ হয়ে উঠেছিল বালজাকের প্রতি। কিন্তু এ প্রচলিত ধারণাটা সত্যি ছিল না। সত্য বটে, বালজাক যদি হতেন কোন অভিজাত বংশসম্ভূত সুদর্শন পুরুষ তাহলে মাদাম হানস্কার মনে বিন্দুমাত্র দ্বিধা থাকত না; হয়ত তিনি তাঁকে বিয়ে করতে স্বামীর মৃত্যু পর্যন্তও অপেক্ষা করতেন না। কিন্তু এগুলি সবই হয়ত-র ব্যাপার, আসল ব্যাপার পারিবারিক এবং রাষ্ট্রীয় বাধা। তাঁর মেয়ে, একমাত্র সন্তানও এক মস্ত বাধা বই কি।

ভালবাসার মধ্যে সংশয় থাকে, দ্বিধা থাকে, ইচ্ছা এবং অনীহার টানা পড়েন জেরবার করে দেয় জীবন; পরকীয়া প্রেমের এই ত নিয়তি। বালজাক এবং মাদাম দ্য হানস্কা এই কুটিল নিয়তিরই শিকার। তবু এত দুঃখ তাঁদের জীবনে আসত না, এত সংশয় সন্দেহে পীড়িত হতেন না তাঁরা যদি না আত্মীয় স্বজন রাষ্ট্র এবং শেষ পর্যন্ত কন্যার কল্যাণ ভাবনা মাদাম হানস্কার দ্বিধাপীড়িত ভালবাসার বোঝা হয়ে উঠত।

মাদাম হানস্কার আন্টি শ্রীমতী রোসালি ছিলেন মাদাম হানস্কার সঙ্গে বালজাকের প্রণয় পরিণতির সব থেকে বড় বাধা। বলতে গেলে তিনিই সমগ্র পরিবারকে এর বিরুদ্ধে সচেতন ও সংঘবদ্ধ করেছিলেন। বালজাককে শ্রীমতী রোসালি দু'চক্ষে দেখতে পেতেন না বরং বলা ভাল ঘৃণা করতেন। বালজাকের কোন প্রতিভা আছে বলেই তিনি স্বীকার করতেন না। তাঁর চোখে বালজাক একটা হীন পরিবারের উচ্চাভিলাষী বদমাস লোক। একটি ধনী রূপসী বিধবার মাথা খাওয়ার চেষ্টাকে তিনি প্রাণপণে ঠেকানোর জন্যে উঠেপড়ে লেগেছিলেন।

কিন্তু মাদাম হানস্কার দৃঢ়তার কাছে শ্রীমতী রোসালির চেষ্টা নস্যাৎ হয়ে যেতে দেরি হয় নি। যদিও ভয় তাঁর বুকের মধ্যে ঢিপঢিপ করত সর্বদা।

পরিবারের বাধা যা-হোক করে ঠেকাতে পারবেন মাদাম হানস্কা কিন্তু রাষ্ট্রের বাধা, তার কী হবে? জারের রাশিয়ায় কঠোর আইন ছিল, দেশের সম্পদ বিদেশে যেতে দেওয়া হবে না। কোন কৌশলেই না। আর মাদাম ত্য হানস্কার সম্পদ অগাধ, ওই সম্পদ ফরাসী সরকারের হাতে পড়ুক এ যে জার কিছুতে চাইবেন না, মাদাম হানস্কা তা জানতেন। অতএব বালজাককে বিয়ে করা মানে কপর্দকহীন ভিখিরী হয়ে যাওয়া। প্রেমের হাত ধরে পথে এসে নামতে তিনি শিউরে উঠলেন কি? তাই কী কন্যার শুভ চিন্তা তাঁকে পেয়ে বসল?

আসলে প্রত্যেকটা সমস্যাই মনুমেণ্টের মতন বিরাট আর উঁচু। ভেঙ্গে ফেলা বা পার হয়ে আসা দুই-ই শক্ত। একটা অসামাজিক বিয়ের চুক্তিতে তিনি যদি হুট্ করে সই করে বসেন, মেয়েকে তাঁর বংশমর্যাদার উপযুক্ত একটি সৎপাত্রের হাতে তুলে দেওয়া তাঁর পক্ষে নিঃসন্দেহে কঠিন হবে—কঠিন করে তুলবে তাঁর পরিবারের শত্রুরাই। নিজের প্রেমের কাছে কন্যার সুখ সৌভাগ্য তিনি বলি দেবেন কি? সে কী প্রেমের চেয়ে বড় নয়? দ্বিধায় পীড়িত মাদাম হানস্কা তবু বালজাকের নতজানু প্রেম প্রত্যাখ্যান করতে পারেন না। তাঁর বুকের মধ্যে প্রেমার্ত এক বুভুক্ষু রমণী হাহাকার করে ওঠে। তাই চিঠি লেখেন শেষ পর্যন্ত, "বিলবোকে, তুমি এস। তোমার পক্ষে যদি অসম্ভব না হয় তুমি সেণ্ট পেতেরসবুর্গে এসে দেখা কর আমার সঙ্গে।"

মাদাম হানস্কা জানেন না দুর্দমনীয় প্রেমিক বালজাকের পক্ষে কিছুই অসম্ভব নয়।

'কমেদি য়ুমেন' সংকলন বেরোবে সে বাবদ পনর হাজার ফ্রাঁ অগ্রিম রয়েলটি পেয়েছেন বালজাক কিন্তু ও টাকায় তাঁর রাজকীয় প্রেমাভিসারের কতটুকু খরচ মিটবে! তিনি সমাপ্ত অসমাপ্ত যত পাণ্ডুলিপি ছিল সব কুড়িয়ে এনে প্রকাশকদের টেবিলে রাখলেন, অগ্রিম রয়েলটি বলে যে যা দিল তাই তিনি পকেটস্থ করলেন। এমন কি 'দুটো নাটকের পরিকল্পনা মাথায় আছে সেণ্ট পেতেরসবুর্গ থেকে ফিরে এসে লিখে দেব' বলেও কিছু টাকা খসালেন এক প্রকাশক থেকে। এমনি করে সব পকেট ক'টা টাকায় ভর্তি করে পাওনাদারদের চোখে ধুলো দিয়ে বেরিয়ে পড়লেন বালজাক। দীর্ঘ সমুদ্র-যাত্রার শেষে নেভার তীরে এসে নামলেন ১৮৪৩-এর ১৭ জুলাই। সম্রাজ্ঞী ক্যাথেরিন থেকে আজ অবধি বিশ্বজোড়া নামের এতবড় ফরাসী

লেখক রাশিয়ার মাটিতে পা রাখেন নি। সব চোখ তাঁর ওপরে উৎসুক হয়ে উঠবে। অভিজাত সমাজ অধীর হয়ে ঘিরে ধরবে তাঁকে। স্বাভাবিক। তেমনি স্বাভাবিক হানস্কার দিকে সাধারণের আগ্রহের উদগ্র চোখ—রাশিয়ার কতিপয় শ্রেষ্ঠ ধনী অভিজাত পরিবারের তিনি একজন, স্বয়ং জার পর্যন্ত যাঁকে রাজকীয় ভোজ সভায় নিমন্ত্রণ করে পাঠান। এই দুই বিখ্যাত মানুষ একত্র হওয়ার মানে কী তা কাউকে বুঝিয়ে বলতে হবে না। তারা নিজেরাই মানে করে নেবে—তারা ধরে নেবে এঁদের বিয়ে হতে যাচ্ছে। কিন্তু রাশিয়ার মানুষের মনে এ বিশ্বাস মাদাম হানস্কা এখনই রোপণ করতে চান না।

তাই বালজাককে রাজধানীর মানুষদের কাছ থেকে অত্যন্ত সন্তর্পণে আড়াল করে রেখেছিলেন ইভা। তাঁদের নিভৃত সাক্ষাৎকারের স্থান নির্দিষ্ট হয়েছিল ইভার নিজের বাড়ি মেজোঁ ক্যুতাইজফ-এ।

প্রাসাদোপম বাড়ির এক মনোরম ঘরে দীর্ঘ আট বছর পরে দুই তৃষিত চাতক এসে মুখোমুখি বসলেন।

মাদাম হানস্কা আট বছর পরে দেখছেন: আরও শক্ত-সমর্থ দেখাচ্ছে বালজাককে। যদিও চুলে কিছু পাক ধরেছে, বার্ধক্যের চিহ্ন নেই চঞ্চল চোখের তারায়, কথা বলার দৃপ্ত ভঙ্গীতে। কল্পনাপ্রবণ ভাবুক প্রকৃতির মানুষের তারুণ্য দীর্ঘস্থায়ী হয়। আসলে পুরুষের জীবনে আটটা বছর কিছু নয়।

মাদাম হানস্কার বর্ণনায় সেদিনের বালজাক সম্পর্কে আর কিছু জানা যায় নি। নারী-মন স্বভাবতই চাপা।

কিন্তু বালজাকের উচ্ছ্বসিত চিঠি অনেক কথাই বলেছে সেদিনের। আটটা বছর মেয়েদের জীবনে বড় দীর্ঘ সময়, তবু বালজাকের চিঠিকে যদি বিশ্বাস করি ত বলতে হয় মাদাম ইভা দ্য হানস্কাকে এত সুন্দর আর কখনো মনে হয় নি বালজাকের। ইভার সেই রূপ দেখে বালজাকের বাসনায় নাকি আগুন ধরে গিয়েছিল।

মাদাম হানস্কা ভেবেছিলেন দীর্ঘ আট বছর পরে তাঁকে দেখে বালজাকের প্রেমের ক্ষুধা মিইয়ে যাবে, তাঁর মতন বুড়িকে আর বালজাকের ভাল লাগবে না। কিন্তু ঘটল উলটো ব্যাপার। বালজাক আকুল হয়ে আবেদন করলেন "বল, কবে আমাদের বিয়ে হবে।" এমন কি শুভ কাজটা যাতে সহজে সম্পন্ন হতে পারে সে জন্যে প্রয়োজনীয় কাগজপত্রও বালজাক তৈরি করে নিয়ে গিয়েছিল সঙ্গে, পকেট থেকে বের করে সেগুলিও দেখালেন ইভাকে।

ইভা কাগজগুলি ঠেলে রেখে বালজাককে কাছে টেনে নিলেন, "বিয়ে না হওয়া অবধি এভাবেই থাকব আমরা।"

"কিন্তু কত দিন?"

বালজাকের ব্যাকুল জিজ্ঞাসার উত্তরে অনিশ্চিত গলায় ইভা বললেন, মেয়ের যতক্ষণ না একটি সৎপাত্র জুটছে আমাদের বিয়ের প্রশ্ন ওঠে না। অবশ্য সৎপাত্র একটি হাতের মুঠোয়ই ছিল তখন। সুদর্শন সে ধনী তরুণটির নাম জর্জ।

ইভার আলিঙ্গনের মধ্যে বালজাক অভিভূত হয়ে রইলেন। তার খুশীর অবধি নেই। এতদিন পরে ইভাকে তিনি বুকের মধ্যে পেয়েছেন। তদুপরি একটা নির্দিষ্ট সময়ের নাগালও পাওয়া গেছে—এক বছর বড় জোর দু'বছর আর অপেক্ষা করতে হবে, ইতিমধ্যে মেয়ের বিয়ে হয়ে যাবে যখন, তখন ইভা তাঁর—একান্ত-ভাবে তাঁর।

বালজাক তিনমাস ছিলেন রাশিয়ায়। এ তিনমাস ইভার সতর্ক চোখের পাহারায় নিভৃতে লোকচক্ষুর আড়ালেই থাকতে পেরেছিলেন তিনি। ইভাও তাঁকে এমন একটা সময় বেছে নিয়ে সেণ্ট পেতেরসবুর্গে আমন্ত্রণ করেছিলেন যখন রাজধানীর সম্রান্ত মানুষরা নগর ছেড়ে আপন আপন গ্রামে গ্রীষ্ম-যাপনের জন্যে চলে যান। অভিজাত সম্রান্ত পরিবারগুলিই বালজাকের প্রিয় পাঠক এখানে। তাঁরাই যদি না থাকলেন বালজাককে ঘিরে আর কারা হৈ-চৈ করবে!

তবু একেবারেই যে আড়ালে অলক্ষিতে থাকতে পেরেছিলেন বালজাক তা নয়। তখনও যে সব সম্রান্ত পরিবার যাই-যাই করেও রাজধানীতে থেকে গিয়েছিলেন তাঁদের কেউ কেউ খবর পেয়ে গিয়েছিলেন, বালজাক সেণ্ট পেতেরসবুর্গে এসেছেন।

স্বয়ং রাজকুমারী রাস্যোমোয়াস্কা ইভাকে চিঠি লিখেছিলেন, "আমি স্বয়ং সম্রাটের কাছে শুনলাম, নারীর মন বুঝতে পটু আর সে বিষয়ে লিখতে পাকা একজন বিশিষ্ট মানুষ সদ্য এসেছেন রাজধানীতে।......"

আর একজন সম্রান্ত রমণী লিখেছিলেন, "......এই মাননীয় মানুষটিকে কেমন করে যোগ্য সম্মান ও সমাদর দেখানো যায় বলত? ঈশ্বর না করুন, রাশিয়া সম্পর্কে তিনি যেন না কোন খারাপ ধারণা নিয়ে যান......"

বালজাককে নিয়ে এ রকম উৎসাহের চিঠি ও কিছু কিছু কৌতূহলী মানুষ ইভার দরজায় মাঝে মাঝে হানা দিয়েছে কিন্তু ইভার চতুর হস্তক্ষেপে তারা সব ইভার দোর গোড়া থেকেই বাতিল হয়ে গেছে বালজাকের নাগাল পায় নি কেউ। কেবল একবার তাঁকে কাউণ্ট বেঙ্কেনদর্ফ-এর অতিথি হতে হয়েছিল। কাউণ্ট

বেঙ্কেনদর্ফ-এর অতিথি হিসেবে তখন ক্রাসনোয়েসেলোতে সৈন্য বাহিনীর কুচকাওয়াজে উপস্থিত থাকবার জন্যে আমন্ত্রিত হয়েছিলেন তিনি। বালজাক সেখানে রুশ সম্রাট প্রথম নিকোলাসকে খুব ঘনিষ্ঠ ভাবে দেখবার সুযোগ পেয়েছিলেন। তা ছাড়া আর কোন নিমন্ত্রণের সুযোগ তিনি গ্রহণ করেন নি কি ইভাই সব নিমন্ত্রণ নাকচ করে দিয়েছেন। তাই রাশিয়ায় বালজাক তাঁর সবটুকু অবসর নিয়ে ইভার সান্নিধ্যের উত্তাপ ভোগ করবার সুযোগ পেয়েছিলেন। ইভার মেজো ক্যাতাইজফ-এর কাছাকাছি একটা বিলাসবহুল হোটেলে থাকতেন তিনি। আর নির্দিষ্ট সময়ে দেখা করতে যেতেন ইভার সঙ্গে। অনেকক্ষণ, কখনো কখনো সারাক্ষণ কাটত সেখানে তাঁর। অবশ্য দু'জনে একলা হবার সময় পেতেন খুব কম। অধিকাংশ সময়ই কাছে থাকত আন্না আর জর্জ তবু গল্পগুজবে হাসি ঠাট্টায় সময় সুন্দরই কাটত। বালজাক খুব সরস বৈঠকী গল্প বলতে পারতেন, তা ছাড়া তিনি একটা অভিজ্ঞতার খনি তাই যে কোন পরিবেশকে অনায়াসে ক্ষণকালের মধ্যে রমণীয় করে তুলতে পারতেন। আর এ কারণেই আন্না আর জর্জের কাছে বালজাক আদরের মানুষ হয়ে উঠতে পেরেছিলেন। আন্না আর জর্জ যখন থাকত না দু'জনের সেই একলা অবসর প্রাণের কথার মৃদু কলগুঞ্জনে মুখর হয়ে উঠত। তখন স্বর্গ হাতে পেতেন বালজাক। ইভা সেই দুর্লভ সব মুহূর্তে হৃদয়ের সব শূন্য ভরে দিতেন বালজাকের। কেননা তখন একটা ছাড়া সবই দিয়েছেন ইভা তাঁকে। সেই একটাও পেতে কম মিনতি করেন নি বালজাক তবু বালজাককে ততখানি প্রশ্রয় দিতে তখনই ভরসা পান নি ইভা পাছে তাতে করে মেয়ের কোন ক্ষতি ঘটে, রাশিয়া যে এখন তার শত্রুপুরী।

সেদিনের সে নিভৃত মিলন যে ইভার কত সুখের কত তৃপ্তির হয়েছিল তার স্বীকৃতি পাওয়া গেছে ইভার ডায়েরিতে: "......আহা কত মধুর ছিল সে মুহূর্তগুলি কিন্তু কত দ্রুতই না ফুরিয়ে যেত। তবু সেই ক্ষণিকের মিলনে বুক দুলে উঠত সুখে, অক্ষয় যৌবনের সান্নিধ্যের উত্তাপে রক্ত জলে উঠত আমার।......উজ্জ্বল মোহময় শিশুর মতন নিষ্পাপ নির্মল সে প্রেম প্রাণের কাকলিতে মুখর হয়ে উঠত। আশায় বিশ্বাসে ভরে উঠত বুক। ভালবাসার উত্তাল আবেগে স্পন্দিত হতে থাকত অস্তিত্ব ......সমকালের শ্রেষ্ঠ মানুষটিকে আমার প্রেমিক করে পেয়েছি, আহা, আমার কী ভাগ্য!"

কিন্তু বালজাকের প্রেমিকা হওয়া যত সহজ তার স্ত্রী হওয়া ততোধিক কঠিন। এইখানেই যত দ্বিধা দ্বন্দ্ব যন্ত্রণা ইভার মনে। বারে বারে তাই বিয়ের প্রস্তাবে শঙ্কিত হয়ে উঠেছেন ইভা। ইচ্ছা সত্ত্বেও তাই বালজাককে হৃদয় দান করতে পেরেও সর্বাঙ্গ

সমর্পণ করতে পারেন নি। পাছে সেই চরম পাওয়ার দাবিতে দস্যু হয়ে ওঠেন বালজাক, সেই মুহূর্তে চরম পাওয়ার অধিকারে দুর্দান্ত হয়ে তখনই তাঁকে বন্দী করে ফেলতে চান।

বালজাক কিন্তু ইভার শরীরের উত্তাপে বিগলিত চিত্ত ব্যাকুল উন্মাদ প্রেমিক তখন। যতটুকু পাচ্ছেন, রেখে ঢেকে যতটুকু সমর্পণ করছেন ইভা তাতেই আকণ্ঠ ভরে উঠছে তাঁর তৃষিত বুক। তৃপ্তিতে শীতল হয়ে যাচ্ছে উত্তপ্ত স্নায়ু।

সেই সুখে রাশিয়ায় থাকতে থাকতেই বালজাক একখানা ছোট উপন্যাস লিখে ফেললেন। নাম 'য়ুন ফী ছিভ'। সেই উপন্যাস তিনি নিজে পড়ে শুনিয়েছেন আন্না, জর্জ ও ইভাকে। তিনজনে মগ্ন হয়ে শুনেছে সেই কাহিনী। উপন্যাসখানিতে বালজাক দেখিয়েছেন, ভালবাসায় আচ্ছন্ন আবৃত হয়ে গেলে নারী সব ভুলে কেমন করে ডুবে যায় তার অমৃতময় স্বপ্নে আর ভালবাসায় তৃপ্ত পুরুষ উৎসাহে জলে উঠে পরম প্রেরণায় কী ভাবে ঝাঁপিয়ে পড়ে দুঃসাধ্যের কর্মে, কেমন করে সন্নিষ্ঠ মগ্ন হয়ে যায় তার মধ্যে।

বস্তুত ইভার সান্নিধ্যে বালজাক সেদিন এতই উদ্দীপ্ত হয়ে উঠেছিলেন যে তিনি উচ্ছ্বসিত হয়ে বলেছেন, "কয়েকটা সম্পূর্ণ রাত জেগে উপন্যাসখানা শেষ করেছি আমি ; কিন্তু তার জন্যে এক কাপ কফিও আমাকে খেতে হয়নি। ইভা তোমার সান্নিধ্যই কফির কাজ করেছে আমার শরীরে, মনে।"

. তিন মাসে ট্যাঁকের সব টাকা খরচ করে এসেছেন বালজাক তবে এবার একেবারে শূন্য পকেটে নয় ইভার বুকের উত্তাপ আর তাঁর প্রতিশ্রুতিটা বালজাকের সব শূন্য পূর্ণ করেছিল।

প্রত্যেকবার যেমন হয়, এবারও তিনি রাশিয়া থেকে ফিরে এসে লাঞ্ছনার এক ঘোর আবর্তে পড়ে গেলেন। নাকানিচুবোনির অবধি থাকল না তাঁর। বালজাক তাঁর মাকে বলতেন 'শাইলক'। তাঁর শাইলক মা একলাই তাঁকে তাগাদার চোটে চোখে শর্ষেফুল দেখিয়ে ছাড়ছেন। তার ওপরে তখন পারীতে অভিনয় হচ্ছে তাঁর 'পামেলা জিঁরো'। বড় আশা ছিল বালজাকের, এ নাটকটা থেকে তিনি অনেক টাকা পাবেন। কিন্তু চিরকালই মঞ্চ তাঁর সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে, এবারও করল। কোথায় একটা মোটা টাকা পাবেন বইটা থেকে, সে টাকায় বিশ্রাম ভোগ করতে পারবেন কিছুদিন, তা না উলটে মার খেলেন পত্রিকাগুলির হাতে। কিছুদিন ভালই চলছিল বইটা ; কিন্তু যেন শনির দশা, প্রেসগুলির বিরুদ্ধে একদা বালজাক জেহাদ ঘোষণা করেছিলেন, তারই শোধ নিতে এমন একটা ভাল বইয়েরও এমন বিরূপ সমালোচনা

করল কাগজগুলি যে, মঞ্চের মালিক অভিনয় বন্ধ করে দিতে বাধ্য হলেন। বিপদ একলা আসে না, নর্দার্ন রেলের একটা মোটা শেয়ার কিনেছিলেন বালজাক ; বিপদের দিনে সে শেয়ার বেচেও কিছু টাকা আমদানী হওয়ার কথা, স্টক একস্‌চেঞ্জে সে শেয়ারের দর মাটির সমান হয়ে গেল। শেষ সম্বল ছিল লে জারদার বাগান-বাড়িটা—সেটাও গিয়ে নিলামে উঠল। অতএব আবার বালজাককে উপুড় হয়ে পড়তে হল কাগজের ওপরে, রাতকে দিন করতে হল।

বালজাকের যত বিপদ, পৃথিবীর সাহিত্য-রসিকদের তত সৌভাগ্য। লাঞ্ছনার আগুনে বালজাক যত জ্বলেন, তত উজ্জ্বল শিল্প সৃষ্টি হয় তাঁর হাতে। এবারও দুর্ভাগ্যের মার খেয়ে তাঁর হাত দিয়ে বেরোল কয়েকখানা উৎকৃষ্ট রচনা কিন্তু 'লে পেইজাঁ' (গ্রামীণ) আর শেষ করে উঠতে পারলেন না। তিনি বইটা শুরু করেছিলেন অনেকদিন আগে থেকেই ; 'লা প্রেস'-এ ধারাবাহিক ছাপা হচ্ছিল বইটা। ওই কাগজে ধারাবাহিক বেরোনোর জন্যে তাঁর পাওয়ার কথা চৌদ্দ হাজার ফ্রাঁ আর পুস্তকাকারে বেরোলে তখন 'লা প্রেস' তাঁকে দেবে আরও বারো হাজার ফ্রাঁ ; কিন্তু বালজাকের মতন লৌহমানবের শরীরেও জং ধরে। মানুষের প্রাণশক্তি যতই দুর্ধর্ষ হোক তারও সহন ও বহন ক্ষমতার একটা সীমা আছে। সে সীমা ছাড়িয়ে এসে বালজাকের হাত অবশ হয়ে এল।

প্রথমে বোঝা যায় না। মহীরুহের গুঁড়িটা বিরাট ও কঠিন, তার বিস্তীর্ণ ডালে ডালে প্রকীর্ণ পত্র-পল্লব ফুলে ফলে তার ঐশ্বর্যের ঘাটতি চোখে পড়ছে না। কিন্তু কেউ জানছে না মূলের ভিতর থেকে ঢুকে তার শাঁসটাকে কুরে কুরে খাচ্ছে সর্বনাশের পোকা। হলুদ পাতায়, জীর্ণ ফলে একদিন তা প্রকাশ পেলে মানুষ চমকে ওঠে।

১৮৪৪-এর এপ্রিলে লৌহমানবের শরীরে অবসাদ দেখা দিল।

বালজাক লিখছেন :

"আমার শরীর আর আমার ইচ্ছার কাছে নতি স্বীকার করতে চাইছে না। ক্লান্ত অবসন্ন শরীর ঘুমিয়ে পড়তে চাইছে। সমস্ত শরীর আচ্ছন্ন করে ঘুম আসছে আমার। কালো কফিতে আর কাজ হচ্ছে না। মগ ভর্তি কফি ঢালছি গলায়। শরীরে এতটুকু প্রতিক্রিয়া হচ্ছে না। এখন জল খাওয়ার সামিল হচ্ছে কফি খাওয়া। আমি এখনও রাত তিনটায় জেগে উঠি কিন্তু ঘুম ছাড়ে না চোখ। অবসাদে শরীর আবার ঘুমে এলিয়ে পড়ে। আটটায় প্রাতঃরাশ করি। আর তখনই আপ্‌সে চোখ বুজে আসে, চেয়ারের ওপরেই এলিয়ে পড়ি তখন।"

মাঝে মাঝে মুখের পেশীতে খিঁচুনি হয়, শরীরের এখানে ওখানে স্ফীতি দেখা দেয়, মাথা ধরে, চোখের পাতা কাঁপতে থাকে থরথর করে। বালজাকের আশঙ্কা, তিনি 'লে পেইজাঁ'র দ্বিতীয় খণ্ড বুঝি আর লিখে উঠতে পারবেন না।

"আমি এক ভয়াবহ স্নায়বিক যন্ত্রণার অবস্থায় এসে পৌছেছি। মাত্রাতিরিক্ত কফি খেয়ে খেয়ে পেটে একটা শক্ত ব্যামো ধরে গেছে। এখন আমার দরকার পরিপূর্ণ বিশ্রাম। পেটের মধ্যেকার এই বিকট যন্ত্রণা আজ তিনদিন ধরে কুরে খাচ্ছে আমাকে। প্রথম মনে হয়েছিল ও কিছু না, দু এক ঘণ্টার মধ্যে সেরে যাবে কিন্তু না……আমি বড় চিন্তিত হয়ে পড়েছি। গত দু বছরে আমি মাত্র চারটে বই লিখতে পেরেছি, কী অসহায় অবস্থা ভাব। আর দিন কুড়ি পরে আমি অকর্মণ্য হবে যাব। একটা গাড়িতে চেপে এখান থেকে চলে যাওয়া ছাড়া তখন আমার কোন গত্যন্তর থাকবে না।"

কয়েকদিন পরে বালজাক আবার লিখছেন :

"দেবদূতের সঙ্গে লড়াই করে জ্যাকব যেমন অবসন্ন হয়ে পড়েছিল, সেই হাল হয়েছে আমার। 'কমেদি য়ুমেন'-এর আরও ছ'টা খণ্ড লিখতে হবে। সমগ্র ফ্রান্সের চোখ কান খাড়া হয়ে আছে, কবে বেরোবে বই, কবে! বুক সেলারদের ট্র্যাভেলিং এজেন্টরা ক্রমাগত এসে তাড়া দিচ্ছে, গাদা গাদা চিঠি আসছে চারধার থেকে : 'লা প্রেস'-এর গ্রাহক সংখ্যা বেড়ে গেছে আরও পাঁচ হাজার। 'লে পেইজাঁ' ধারাবাহিক বেরোচ্ছে সেখানে কিন্তু দ্বিতীয় খণ্ড……আমি কী দ্বিতীয় খণ্ড লিখে উঠতে পারব? হায়, একটা শূন্য থলি বলে মনে হচ্ছে নিজেকে।"

এ যে শুধু বালজাকের দেহের ক্লান্তি তা নয়। বিপুল অবসাদে তার মনটাও আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছে। বিশ্রাম চাই, একটু নিশ্চিন্ত বিশ্রাম—মন হাহাকার করে ওঠে। আর সে সর্বযন্ত্রণাহর বিশ্রাম নিয়ে আসতে পারেন একমাত্র ইভা, এ চিন্তা বালজাকের মনে আকুল প্রার্থনা হয়।

তিনি বলেন, "মানুষের জীবনে কখনো কখনো এমন সময় আসে যখন সে সব বিচার বুদ্ধি হারিয়ে ফেলে—আর অত দূর ঊর্ধ্বে যদি কারো দৃষ্টি বিদ্ধ হয়ে থাকে ত তাকে অবশ্যি বিচার-বিবেচনা হারাতে হয়। আমার অবস্থা এসে সে পর্যায়েই পৌছেছে। এক দুর্লভাকে লাভ করতে আমার সমগ্র জীবনের লক্ষ্য এসে এক

বিন্দুতে কেন্দ্রীভূত হয়েছে, ফলত মনে হচ্ছে আমি যেন ভিতরে বাইরে একেবারে চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে গেছি।"

এ বড় মর্মান্তিক স্বীকার উক্তি বালজাকের। তিনি তাঁর লেখায় এতটুকু মনঃসংযোগ করতে পারতেন না, মন থেকে থেকে বিবাগী হয়ে দূর আকাশের নক্ষত্রের দিকে উধাও হয়ে যেত। তাঁর সৃষ্ট চরিত্রগুলির ভাগ্য তৈরি করার বদলে তিনি নিজের জীবনকে একটি নির্দিষ্ট আকার দেওয়ার স্বপ্নে মগ্ন হয়ে যেতেন।

সে মধুর স্বপ্ন মাদাম হানস্কাকে লেখা চিঠিতে নানা রঙে চিত্রিত হয়ে ফুটে উঠল:

"দেখো ১৮৪৬ সালের মধ্যে আমি 'আমাদের জন্যে' পারী শহরের বুকের ওপরে কী সুরম্য একখানা বাড়ি করে ফেলি। আর তত দিনে দেখো, আমার একটা আধলাও ঋণ থাকবে না। আমার 'কমেদি যুমেন' বাবদ তখন আমার পকেটে পাঁচ লক্ষ ফ্রাঁ এসে গেছে। না, 'কমেদি যুমেন' বাবদ সেই আমার শেষ পাওনা নয়, তারপরেও আমার যে পাওনা থাকবে তার পরিমাণও কমসেকম ওই পাঁচ লক্ষ ফ্রাঁ। অতএব ওগো সুন্দরী, আমি নিঃসন্দেহে তোমার যোগ্যতম পাত্র। আমি যদি দীর্ঘায়ু হই ত দেখো কয়েক মিলিয়ান ফ্রাঁর মালিক আমরা। তুমি আমাকে লিখেছিলে, তোমাকে বিয়ে করলে আমি নাকি তেমন গরীব ঘরের মেয়েকে বিয়ে করছি না। আমিও তেমনি লিখছি, আমাকে বিয়ে করলেও তুমি তেমন কোন হা-ঘরের ছেলেকে বিয়ে করছ না। আসলে আমাদের দু'জনের দাম্পত্য জীবন হবে পরম প্রীতির। স্বাভাবিক। কারণ দুটি ভালবাসার জন যখন মিলিত হয় তার অন্যথা হওয়ার উপায় নেই। কিন্তু আমি ভাবছি, কে আগে মরব। যে আগে মরব সেই সুখী। কেননা এক জনের মৃত্যুর পরেও যে জীবিত থাকবে তার ত প্রিয়বিরহ-কাতর দীর্ঘশ্বাসের জীবন কেবল।"

১৮৪৬-এর স্বপ্ন যখন দেখছেন বালজাক ১৮৪৪-এ—তখন হঠাৎ এক আশার প্রদীপ জলে উঠল বালজাকের মনে—এবার বোধ হয় সেই সুবর্ণ সুযোগ এল, এত কালের স্বপ্ন বুঝি এবার পূর্ণ হবে। সেবার রাশিয়া রওনা হবার সময়েই মাদাম হানস্কা জানিয়েছিলেন, তাঁর মেয়ে আন্নার জন্যে পাত্র ঠিক হয়ে আছে। এক অতি উচ্চ অভিজাত পরিবারের সেই সুদর্শন ধনী যুবক জর্জকে তিনি সেখানে দেখেও এসেছেন। মেয়ে আর সেই পাত্রকে নিয়ে মাদাম হানস্কা চলে আসছেন এখন

ড্রেসডেন। য়ুক্রেনের দিগন্ত বিস্তৃত শস্য ক্ষেত্রের তুষার নির্জনতা থেকে তিনি নিষ্কৃতি পেয়ে যাচ্ছেন শেষ বারের মতন।

বালজাক ধরে বসলেন, অনুমতি দাও, তোমার সঙ্গে দেখা করতে আমি ড্রেসডেনে আসছি। কিন্তু অনুমতি দিলেন না মাদাম হানস্কা, বালজাকের সঙ্গে তাঁর ভাগ্যকে চরম ভাবে জড়িয়ে ফেলতে তখনও কী দ্বিধা তাঁর, কিংবা মেয়ের বিয়েটা নির্বিঘ্নে হয়ে যাক, চাইছেন? তিনি স্পষ্ট করে কিছু না লিখে এক মস্ত দায় ঘাড়ে চাপিয়ে দিলেন বালজাকের।

আন্নার সুইস গভর্নেস আঁরিয়েৎ বোরেল-এর কথা ভুলে যাওয়ার কথা নয় পাঠকের, এর নামের আড়ালে থেকেই গোপন প্রণয়ের যত পত্র বালজাকের সঙ্গে বিনিময় করতেন মাদাম হানস্কা।

এই অনূঢ়া সুইস রমণীর মনের মধ্যে একটা প্রবল অন্তর্দ্বন্দ্ব চলছিল অনেকদিন থেকে—মনিবের স্ত্রীকে অসতী হওয়ার সুযোগ করে দিচ্ছে এই পাপ বোধই সর্বদা তাকে পীড়িত করত। মঁসিয়ে হানস্কির মৃত্যুর পরে সে পাপ বোধ থেকে মাদাম হানস্কার প্রতি তার মনের অন্তিমে লালিত ঘৃণা স্পষ্ট হয়ে উঠল। যদিও অতিশয় নম্র বিনীত এই রমণী কখনো উচ্চ কণ্ঠে সরবে তার ঘৃণা ঘোষণা করে নি কিন্তু, দোষী বুঝত কোথায় দোষ তার। অতএব মাদাম হানস্কা চেয়েছিলেন তাঁর গোপন প্রণয়-ইতিহাসের সাক্ষী এই মেয়েটা তাঁর চোখের সামনে থেকে দূর হয়ে যাক। নাকি আঁরিয়েৎ বোরেল নিজে থেকেই চলে এল। আর কার জন্যে থাকবে! অসতী স্ত্রীর অসহায় স্বামীর প্রতি সহানুভূতিবশত তাঁকে সেবা দিয়ে মমতা দিয়ে সুখী রাখার আগ্রহে মাদাম হানস্কার প্রতি অসন্তোষ সত্ত্বেও সে থেকে গিয়েছিল সেখানে। যাঁর জন্যে থাকা সেই যখন আর নেই, এবং আন্নারও বিয়ে হয়ে যাচ্ছে শীগ্‌গিরই, অতএব ওই পরিবারের মাটি থেকে বন্ধনের শিকড় ছিঁড়ে গেল আঁরিয়েৎ বোরেল-এর। তারপর এই পরিণত বয়সে আর যাবে কোথায়! আর কোথাও গিয়ে কী শান্তি পাবে। পাপ রয়েছে তার মনে, ব্যভিচারে সাহায্য করেছে সে। আমি পাপের প্রায়শ্চিত্ত করব সারাজীবন, এই পণ করে আঁরিয়েৎ বোরেল চাইল সন্ন্যাসিনী হতে।

তাঁর মেয়ের গভর্নেস-এর সেই শেষ অনুরোধ পূর্ণ করতে মাদাম হানস্কা চিঠি লিখে পাঠালেন বালজাককে। চিঠি হাতে আঁরিয়েৎ এসে হাজির হল বালজাকের কাছে।

প্রেয়সীর দূতী নিঃসন্দেহে তাঁর প্রিয় পাত্রী। তা ছাড়া এই নম্র বিনীত রমণীকে এমনিতেই খুব ভাল লেগেছিল বালজাকের। অতএব তার জন্যে নিজের

অনেকখানি মূল্যবান সময় অপচয় করে কিছুদিনের চেষ্টায় তাকে সন্ন্যাস-আশ্রমে দীক্ষা নেওয়ার সুযোগ করে দিলেন বালজাক। রোমান ক্যাথলিক চার্চের অন্তঃপুরে এভাবে মিলিয়ে গেল বালজাকের 'লেত্রাঁজের' উপন্যাসের প্রথম পরিচ্ছেদের নরম চরিত্রটি।

পরম উল্লাসে সে খবরটি জানিয়ে বালজাক মাদাম হানস্কাকে লিখলেন 'তোমার আদেশ পালন করেছি, এবার আমার প্রার্থনা পূর্ণ কর। "কবে ড্রেসডেন আসব জানাও।"

১৮৪৪-এর সে প্রার্থনা ১৮৪৫-এর বসন্তে মঞ্জুর করলেন মাদাম হানস্কা। চিঠি পেয়ে তক্ষুনি টেবিলের কাগজপত্র পাণ্ডুলিপি ড্রয়ারে গুঁজে বেরিয়ে পড়লেন বালজাক। রইল পড়ে সহস্র সহস্র উন্মুখ পাঠক, অগ্রিম দাদন দেওয়া প্রকাশকদের উৎকণ্ঠিত প্রতীক্ষা। পাওনাদারদের তাগাদা কোনদিন গ্রাহ্য করেন নি, আজও তাদের প্রতি পৃষ্ঠপ্রদর্শন করে তাঁর প্রেয়সী সন্দর্শনে যাত্রা করলেন। ড্রেসডেন। না শুধু ড্রেসডেন না, মাদাম হানস্কার মেয়ে আর তার ভাবী বরকে নিয়ে বালজাক য়ুরোপের বহু জায়গা ঘুরলেন। এবং অত্যন্ত সচেতন ভাবে ভক্ত পাঠকদের চোখ এড়িয়ে অনুক্ষণ সংলগ্ন হয় থাকলেন তাঁর প্রিয়ার পরিবারের সঙ্গে। এ সময়ে নিপুণ কৌশলে মাদাম হানস্কাকে বালজাক পারীতেও এনে রাখলেন কিছুদিন। জারের কঠোর দৃষ্টি ছিল—তাঁর অভিজাত প্রজারা যাতে বিপ্লবের উর্বর ক্ষেত্র ফ্রান্সের মাটিতে পাড়া না দেয়, জারের সে কঠোর দৃষ্টির চোখে ধুলো দিতে বালজাক মা মেয়ে আর ভাবী জামাইয়ের নাম সুকৌশলে এমন ভাবে বদলে দিলেন যে, কেবল জার নয় ফ্রান্সের ঘনিষ্ঠ মহলও জানল না বালজাকের প্রেমিকা পারীতে বেড়াতে এসেছেন।

পরম সুখেই কাটল বালজাকের কয়েকটা মাস। কিন্তু মাদাম দ্য হানস্কা সর্বদা সতর্ক ছিলেন তাই বালজাকের অন্তিম ইচ্ছা—মাদাম হানস্কার সঙ্গে নিভৃত মিলন সে যাত্রায় আর ঘটল না। সেই আপসোসের দীর্ঘশ্বাস বুকে চেপে বালজাক অপেক্ষা করতে থাকলেন সেই দিবসটির—মেয়ের বিয়ে হয়ে গেলে আর বাধা নেই—বালজাকের বউ হবেন মাদাম দ্য হানস্কা।

বারো

বিয়ে হবে। মাদাম ইভা হু হানস্কা তাঁর বউ হবে অতঃপর হবে ইভা হু বালজাক—অবশেষে এই স্থির বিশ্বাসে বিচলিত মনকে নোঙর করতে পেরে বালজাক তাঁর ভাবী বধূর জন্যে একটা মনের মতন নীড় রচনায় সমস্ত মন সমর্পণ করলেন। এমন যে মহান সৃষ্টির জীবন-পণ প্রতিশ্রুতি 'কমিদি য়ুমেন' শেষ করা—তাতেও তাঁর অমনোযোগের অবধি থাকল না।

কিন্তু স্বপ্ন-বিলাসী বালজাকের বেহিসেবী কাণ্ডকারখানা এই পরম বাস্তব পরিকল্পার মধ্যেও উদ্ভট হয়ে উঠতে বাধলো না। তিনি চিরকালই ঘোড়ার আগে গাড়ি জুড়ে শেষ পর্যন্ত ন যযৌ ন তস্থৌ অবস্থায় ছটফট করেছেন। এবারেও সেই হালই হল বালজাকের। বাড়ির দেখা নেই, কোথায় বাড়ি বানানোর জমি কিনবেন ঠিক নেই, তিনি বাড়ি সাজানোর চোখ জুড়োনো মন-ভোলানো দামী দামী জিনিস-পত্র কিনতে লাগলেন। যেন আকাশে স্বপ্নের বাড়িখানা মনের মতন করে সাজাবেন এই বাসনা। যখন যে খেয়াল মাথায় চাপে বালজাকের যেন সিন্‌দ্‌বাদের ভূতের মতনই আষ্টেপৃষ্ঠে চেপে বসে। তাঁকে কপর্দকহীন না করে যেন সে ভূত আর তাঁর কাঁধ থেকে নামতে চায় না। এবারেও অন্যথা কিছু ঘটল না।

ইভা বালজাকের হাতে এক লক্ষ ফ্রাঁ তুলে দিয়েছিলেন: ও-টাকা যেমন খুশী খরচ করে নূতন বাড়ি সাজাবে তার প্রিয় বিলবোকে। ওই নামে ডেকে বাল-জাককে আদর জানাতেন ইভা। যেমন খুশী খরচ করায় অনুমতি দিয়েও ইভা টাকা দেওয়ার সময় বারবার বারণ করেছেন: "টাকাটা হাতে পেয়ে যেন উড়নচণ্ডী হয়ে উঠো না, ভেবে সমঝে খরচ করো।" কিন্তু স্বভাব যাবে কোথায়! মাথার মধ্যে সব সময় ফাটকার ঝোঁক যাঁর, কেবল স্পেকুলেশনের কল্পনা, টাকা হাতে পেলে নিষেধ আদেশ মনে থাকার কথা নাকি তাঁর। টাকা পেয়েই তিনি এক নির্মীয়মাণ জাহাজের শেয়ার কিনে ফেললেন দশ হাজার ফ্রাঁর। কে লোভ দেখিয়েছে চল্লিশ পার্সেণ্ট ডিভিডেণ্ড পাওয়া যাবে ওই শেয়ার থেকে। কিন্তু ওই পর্যন্তই। ডিভিডেণ্ড দূরে থাক শেয়ারের টাকাটাও আর ফিরে পান নি বালজাক। দশ হাজার ফ্রাঁ এ ভাবে জাহাজের নামে জলে দিয়ে তিনি নব্বুই হাজার ফ্রাঁ নিয়ে নামলেন আর এক কারবারে। এবার শুরু হল নিলামের বাজার আর সেকেণ্ড হাণ্ড মার্কেটে ঘোরাঘুরি। কোথায় কোন্ রানী মহারানী কোথায় কোন রাজা মহারাজা ব্যারণ কাউণ্ট কমেন-

ভার করে খুব ভাল লেগেছিল বলে কী সব শৌখিন জিনিস কিনেছিলেন পরে যে-কোন কারণে হোক বেচে দিয়েছেন, বালজাক পুরোনো আমলের সেইসব কিউরিও কিনছেন আর জড় করছেন। আর মনের মধ্যে একটা আশা লাফে লাফে বড় হয়েছে, বেজায় বড়—তিনি এই সব অসামান্য সংগ্রহ বিক্রি করে লাখ ফ্রাঁকে পাঁচ লাখ করবেন। সে আশায় কাগজে কাগজে বিজ্ঞাপনও দিলেন, কিছু খদ্দের যে এল না তাও নয়। বড় বড় খদ্দেরই এল কিন্তু পঞ্চাশ টাকার জিনিস পাঁচ শ' টাকা হাঁকলে হাজার টাকার মাল পাঁচ হাজার চাইলে কিনবে কেন মানুষ? তারা দেখে শুনে ফিরে যেতে থাকল! তবু খদ্দেরের আনাগোনা খুব কিছু কমছিল না। নিত্য নতুন খদ্দের আসছিল। আর তাই দেখে বালজাকের হাঁকও কেবল বেড়ে যাচ্ছিল। ফলত কিছুই প্রায় বিক্রি হচ্ছিল না। ভাড়া-বাড়ির ঘরগুলিতে শিল্প-সংগ্রহ কেবল ডাঁই হয়ে উঠছিল। জিনিসগুলি অবশ্য নষ্ট হওয়ার, ফেলে দেওয়ার কিছু না। বাড়ি সাজানোর চোখ নিয়েই অভিজাত রুচির বিবিধ দ্রব্য সামগ্রী কিনেছিলেন বালজাক—সূক্ষ্ম শিল্প খচিত মূল্যবান বাসন-কোসন দুর্লভ কাঠের নিপুণ কারিগরী করা আলনা আলমারি চেয়ার টেবিল, নামী ভাস্করের পাথর-মূর্তি দক্ষ হাতের ফুলদানি মোমদানি ঝাড়-লণ্ঠন বিখ্যাত শিল্পীর তৈলচিত্র—কি-না! ভেবেছিলেন এগুলি বিক্রি করে একটা মোটা মুনাফা লুটে সে-টাকায় আবার করে দুর্লভ চমৎকারিত্বের সুদৃশ্য সব মনোহারী দ্রব্য কিনবেন; কিন্তু বিক্রি হল না। বালজাকের অতি-লাভের লোভ বশতই হল না। অধিকন্তু বালজাকের পাওনাদাররা টের পেয়ে গেল এসব মূল্যবান সম্পত্তি সবই বালজাকের। ব্যাপারটা আঁচ করে বালজাক দুশ্চিন্তায় অস্থির হয়ে উঠলেন। তারা কী বিশ্বাস করবে, ক্যাশ মেমো দেখিয়েও কী তাদের বিশ্বাস করানো যাবে এ সম্পত্তি সমস্তই ইভার, ইভার টাকায় কেনা এ ঐশ্বর্যের সে কেবল জিম্মাদার? তবে? এত মালপত্র এক্ষুনি কোথায় লুকোবেন তিনি!

প্রিয়ার জন্যে প্রিয়দর্শন প্রাসাদ তখনও বালজাকের স্বপ্নের আকাশে; বিষয়-বুদ্ধির আঁকশিতে পেড়ে এনে এখনও তাকে মর্ত্যের মাটিতে বাস্তব করে তুলতে পারেন নি। ঘোড়ার আগে গাড়ি জোতা আর কাকে বলে! এদিকে পাওনাদারের শ্যেন চক্ষু ভীষণ সতর্ক হয়ে আছে, কখন যে কে নিলামের পরওয়ানা এনে সব কেড়ে নিয়ে চলে যাবে কে জানে! অতএব এই বিপুল বিচিত্র মিউজিয়ামকে পাওনাদারের চোখের আড়াল করতে ব্যস্ত হয়ে উঠলেন বালজাক এবং যে কাজটা সর্বাগ্রে করা উচিত ছিল সেইটে সর্বশেষে করতে উঠে পড়ে লাগলেন।

বালজাকের বাড়ি মানে ত কয়েক কাঠা জমির ওপরে কড়ি বর্গা ইট কাঠের

একটা যেমন-তেমন ব্যাপার নয়—রীতিমত রাজকীয় চিন্তা বালজাকের মাথায়। তাঁর স্বপ্নের রানী, য়ুক্রেনের স্থূলী রমণী জারের রাশিয়ার অন্যতম শ্রেষ্ঠ ধনীর বাসের যোগ্য প্রাসাদের ভাবনা ভাবেন বালজাক। তাই দালালরা হন্যে হয়ে গেছে বালজাককে জমি দেখাতে দেখাতে, বাড়ি দেখাতে দেখাতে। শহর থেকে অদূরে ছায়ার অরণ্য রৌদ্রের প্রান্তর চারধারে, মাথার ওপরে নির্মল আকাশের চাঁদোয়া ইত্যাদির মধ্যেও যে জমি কিংবা বাড়ি তার মধ্যেও কোন-না-কোন খুঁত খুঁজে খুঁতখুঁত করেছেন বালজাক। অথচ বাড়ি তাঁর অবিলম্বে চাই। লেখার জন্যে যে সময়টা তাঁর অপরিহার্য প্রয়োজন সেই মহামূল্য সময় মাটিতে স্বপ্নের স্বর্গ খুঁজতে নষ্ট করে প্রকাশকদের কাছ থেকে ভয়ংকর হুমকি খেয়ে তবে ধাতস্থ হলেন এবং শেষমেশ ১৮৪৬-এর হেমন্তে একখানা বাড়ি কিনে ফেললেন বালজাক। পারী থেকে দূরে বাইরে গ্রামের মধ্যে বালজাকের উচ্চ রুচির অনুরূপই হল বাড়িখানা। রু ফোরতুনে-তে এ বাড়িখানার নাম পাভিলিওঁ ব্যুজোঁ। বিপ্লবপূর্ব ফ্রান্সের একজন জাঁদরেল জেনারেলের গ্রাম্যনিবাস ছিল এটি। পঞ্চাশ হাজার ফ্রাঁর এক আধলাও ছাড়তে চান নি বাড়ির মালিক। দরকষাকষিতে ওস্তাদ বালজাককেও অবশেষে হার মানতে হয়েছে।

পঞ্চাশ হাজার ফ্রাঁর বত্রিশ হাজারই দিয়েছেন ইভা। দিয়ে লিখেছেন "তুমি বড্ড অমিতব্যয়ী মানুষ, এত ঋণ মাথায় করে এখন বাড়ি কেনার আদৌ দরকার ছিল না। তোমার লে জাঁরদার বাড়ি নিলাম হয়ে গেছে, তবে কেন বাড়ি সাজানোর এত এত জিনিস কিনেছ? কিনেছ যখন ওই পুরোনো ভাড়া বাড়িতেই এখন তোমার সেই সব দুর্লভ জিনিস ডাঁই হয়ে থাক।"

বালজাক লিখলেন: "আমি তোমাকে মিনতি করছি, তুমি উৎকণ্ঠায় ভুগোনা। আমি এমন কিছু করছি না, করব না, যাতে তোমার সম্মতি পাব না। আমার ওপরে তোমার বিশ্বাস নেই জেনে আমি মনে বড় আঘাত পেয়েছি। কিন্তু আমার ভবিষ্যৎ সম্পর্কে বিন্দুমাত্র সংশয় নেই বলে তোমার ভয় দেখে আমার হাসি পাচ্ছে। কিন্তু তুমি ভয় পাচ্ছ ভেবে আমি কষ্ট পাচ্ছি।"

এসব নিয়ে দু পক্ষে অনেক চিঠি লেখালেখির পরেও বালজাক তাঁর পরিকল্পনাকে রূপ দিতে এতটুকু অমনোযোগী হলেন না। সংকল্পের দিকে নিঃসংশয়ে এগিয়ে এলেন। নগদ বত্রিশ হাজার ফ্রাঁ মালিকের হাতে দিয়ে বাকি আঠারো হাজার চার বছরে শোধ করবেন এই শর্তে ইভা ও তাঁর যৌথ নামে কিনে ফেললেন বাড়িখানা। এবং ইভার ইচ্ছাকেও গ্রাহ্য করলেন না। বাড়িখানাকে নতুন করে

ভেঙে গড়ে মনের মতন করতে মন দিলেন—এসটিমেট ধরে ছিলেন তার জন্যে দশ হাজার ফ্রাঁ, কাজে হাত দিয়ে দেখা গেল দ্বিগুণেরও বেশী খরচা হয়ে গেছে। কিন্তু গ্রাহ্য করলেন না বালজাক। প্রিয়ার জন্যে মর্ত্যের মাটিতে স্বর্গ রচনায় এখন সর্বস্ব পণ করে বেপরোয়া বালজাক। সুবিধে হল, বাড়িখানা মায়ের ও বোনের বাড়ির মাঝামাঝি হওয়ায়; যে কেউ এসে দেখাশোনা করতে পারবে, কেবল ঝি-চাকরের জিম্মায় ফেলে রাখা হয়েছে, দেখাশোনার কেউ নেই জানলে তাঁর এই মূল্যবান দুর্লভ সব সংগ্রহের সমারোহ ডাকাতি হয়ে যাওয়া আশ্চর্য কিছু নয়।

বিশেষ করে মায়ের ভরসাতেই, যে মায়ের প্রসঙ্গে চিরকাল ভর্ৎসনার উক্তিই তিনি করেছেন কেবল, তিনিই দেখাশোনা করবেন কথা দেওয়াতে, একে একে তাঁর মহামূল্য সব সংগ্রহ এনে তুললেন এ বাড়িতে। কাঠের সুদৃশ্য আসবাব, উৎকৃষ্ট শ্রেণীর নানা সূক্ষ্ম কারুকর্ম করা চীনা বাসন-কোসন ফুলদানি ইত্যাদি, আর সাম্প্রতিক ও পূর্বতন বিখ্যাত শিল্পীদের আঁকা সব তৈল ও জল রং চিত্র।

একবার এক বিশিষ্ট বন্ধু, তিওফিল গ্যুতিএকে, এ সব সযত্ন আহরিত সুদর্শন সামগ্রী দেখাতে এনেছিলেন বালজাক। বন্ধু দেখে বিস্ফারিত চোখে চিৎকার করে উঠেছেন: "বালজাক, তুমি দেখছি রাতারাতি কোটিপতি হয়ে উঠেছ।"

বালজাক করুণ হেসে বলেছিলেন: "না, বন্ধু না, আমি চিরকাল দরিদ্র। কিন্তু আমার আজকের দারিদ্র্যের বুঝি তুলনা নেই। জিজ্ঞেস করবে, তবে আমি এসব কোথায় পেলাম, শোন তবে, এর কিছুই আমার না। একগাছি সুতোও না। আমি কুলির মতন বয়ে এনেছি, দারোয়ানের মতন পাহারা দিচ্ছি কেবল।"

আমরা জানি বালজাক এতটুকু বাড়িয়ে বলেন নি। মূল্যবান কারপেটে গৃহতল মোড়া, সুদৃশ্য পর্দায় জানলা-দরজা ঢাকা, নানাবিধ চিত্র মূর্তি ফুলদানি আর বহুশাখ-আলোকপাত্র সজ্জিত প্রাসাদ-প্রতিম বাড়িতে—পাভিলিওঁ ব্যুজোঁতে থাকতেন না বালজাক। তিনি পারীর সেই পুরোনো ফ্ল্যাটেই আছেন। সেখানকারও সেই রাজকীয় পরিবেশ আর নেই, সেখানকার সব বেচে খেয়ে এখন তাঁর আছে কেবল লেখাপড়া করবার মতন একটা টেবিল, এবং অপরিহার্য আর কিছু টুকিটাকি জিনিস। খাচ্ছেন দরিদ্র যা খায়। অসুখে ভুগছেন তবু ডাক্তার দেখাচ্ছেন না। যা কিছু রোজগার সব উজাড় করে চলেছেন পুরোনো বাড়িখানাকে নতুন করে ঢেলে সাজাতে। সমস্ত ত্যাগ-স্বীকার সমস্ত কষ্ট-সহিষ্ণুতা বুকের মধ্যে প্রিয়তমা ইভার কল্পমূর্তির গলায় মালা হয়ে দুলছে।

ইভার স্বপ্ন দেখতে দেখতে মহৎ সৃষ্টির ধ্যানে মগ্ন হয়ে থাকছেন বালজাক। কিন্তু বারে বারে সে ধ্যান ভেঙে যায়, স্বপ্ন প্রাধান্য পায়। মন বৈরাগী হয়ে চলে যায়, প্রিয়-মুখ ঘিরে প্রজাপতি হয়ে ওড়াওড়ি করতে থাকে। অসহ্য কষ্টে ১৮৪৬-এর জানুআরিতে তিনি ইভাকে লিখছেন : "আমি ক্লান্ত, ক্লান্ত, ক্লান্ত। সবকিছু বিস্বাদ লাগছে। বিরক্ত অপ্রসন্ন হয়ে উঠছি আমি সবকিছুর ওপরে। না; কিছু ভাল লাগছে না আর আমার।"

অভ্যাসের দাসত্ব করে যাচ্ছেন বালজাক। শিল্পসৃষ্টির জন্যে তাঁর যে প্রচণ্ড পিপাসা, ধ্যানমগ্ন হয়ে যেতে যে আত্মার মৌলশক্তি সব যেন তিনি হারিয়ে ফেলেছেন —অতীতের সে উত্তাল উষ্ণ—সব-ভুলিয়ে দেওয়া দিনগুলিতে ফিরে যেতে কী তাঁর আকুল আকুতি ; কিন্তু পারছেন না। আট বছর আগে শুরু করা উপন্যাস 'লে পেইজাঁ' আধখানা হয়ে পড়ে থেকেছে, দ্বিতীয় ভাগ বুঝি আর লেখা হবে না। পঁচিশ ত্রিশটি চরিত্র নিয়ে এক বিরাট পটভূমির উপন্যাস 'লে পেতিত ব্যুরজোআ' মন বসে না, কিছুতেই মন বসাতে পারেন না। ঋণ শোধ করতে হবে শুধু সেই তাগিদে ক্লান্ত অবসন্ন ভারবাহী মোষের মতন কাজ করে যান। মাঝে মাঝে তাঁর মনে হয়, "না, নেই আর বেঁচে নেই, আমার শিল্পসত্তার পরম মৃত্যু ঘটেছে।"

> "কল্পনায় অনেক নরক সৃষ্টি করেছি ; কিন্তু আমার কী তাই বলে কিছু স্বর্গসুখ ভোগ করবার অধিকার নেই। আমি কিছুই করছি না। কেবল তোমার কথা ভাবছি। তোমার ভাবনা ছাড়া আমার মনের আর কোন কাজ নেই।" তাঁর ইভাকে আকুল হয়ে লেখেন বালজাক।

এ সময়ে মাদাম ইভা দ্য হানস্কা ইতালিতে। ঠিক করেছেন আন্না ও তার ভাবী বর জর্জকে নিয়ে তিনি শীতটা সোনালি রৌদ্রের দেশেই কাটাবেন। বালজাকেরও উচাটন মন আর পারীতে থাকতে চাইল না। সব কাজ ড্রয়ারে গুঁজে রেখে তিনি বেরিয়ে পড়লেন দলের সঙ্গে, এসে জুটলেন কলোন-সুর-সোন-এ। সেখান থেকে নদীপথে বোটে করে এলেন মারসেইলিসে। সেখান থেকে নেপলস-এর পথে জাহাজে চড়ে পাড়ি দিলেন সমুদ্র। আর পথে পথে জমে উঠল বালজাকের স্বর্গসুখ। বালজাকের জবানীতেই বলি : " 'লায়নস' আমাকে দিয়েছে অগাধ প্রেম : মমতায়, কোমলতায় মাধুরীতে মিশানো সে পরম সোহাগের আদর আমাকে সব ভুলিয়ে দিয়েছে, মনে হয়েছে এই শহরের 'লায়নস' নামটা যেন প্রাচীন কালের সেই গুপ্ত শিনোলেথ মন্ত্রগুলিরই একটি যার উচ্চারণে স্বর্গের দুয়ার খুলে যায়।...... "

ছ'টা মাস সে সুখের সাগরে গা মাজলেন বালজাক এবং যে সাধনায় তিনি উৎসর্গীকৃতপ্রাণ তার কথা প্রায় ভুলেই গেলেন; কেননা এ দীর্ঘ ছ'মাসে 'বেআত্রিস'-এর কয়েক পাতা 'লে পেইজা'-র দ্বিতীয় খণ্ডের একটা খসড়া আর 'স্প্লেনদার এ মেজার'-এর শেষ অংশমাত্র লিখেছেন। "ও কিছু নয়। পড়ে থাক, যে কোন এক সময় ধরব আর নিমেষে শেষ হয়ে যাবে। টাকা? তার জন্যে আমি থোড়াই কেয়ার করি! আমি সুখ চাই। আমি পরিপূর্ণ ভোগের পর ফিরে আসব।" লিখেছিলেন তখন পারীর এক বন্ধুকে।

দুঃখপীড়িত মানুষটি তখন ভুলেই গিয়েছিলেন কি সে-দূরদৃষ্টি আর ছিল না তাঁর যাতে করে টের পাওয়া যায়—শিল্পীর ভাগ্যে সুখ নেই। সুখ চাওয়া তাঁর পক্ষে পাপ। মহৎ প্রতিভার অভিশাপ, তাঁকে কেবল কাজ করে যেতে হবে। কাজের শেকলে আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা হয়ে থাকতে হবে তাঁকে।

সেই কাজের প্রচণ্ড তাড়নায় সুখ-স্বর্গ ফেলে পুনরায় তাঁকে ফিরে আসতে হল পারীতে।

বড় সাধ ছিল আরও কিছুদিন তিনি তাঁর ইভার বক্ষলগ্ন হয়ে থাকবেন। আর প্রাচীন সংগ্রহের দোকানগুলি ঘুরে ঘুরে দেখে অবসরের বর্ণাঢ্য দিনগুলি ফুরিয়ে ফেলবেন। কিন্তু শিল্পীর ভাগ্যে সুখ আর কতটুকু! সে মেঘের কোলে রোদের মতন নিমেষে মিলিয়ে যায়।

পারীতে ফিরে এসে সেই ক্ষণস্থায়ী সুখস্মৃতি স্মরণ করে বালজাক ফেরার পথে মারসেইলিস বন্দরে নেমে একগাছি রমণীয় কোরাল-মালা কিনলেন ইভার জন্যে। ভারতীয় কারুকর্মে অপূর্ব সে হার ইভাকে পাঠিয়ে চিঠিতে লিখলেন: "আমার গোলাপী সুখের স্মৃতি···আরক্ত ভালবাসার স্মারক···লিখতে লিখতে আমার চোখ কৃতজ্ঞতার অশ্রুতে ভরে উঠেছে···ভালবাসা চরম শিখায় যখন লকলকিয়ে জ্বলে তখনকার সঙ্গে প্রথম খ্যাতি লাভের আনন্দেরই কেবল তুলনা চলে···"

ইভার প্রেম অমৃত সমান কাজ করছিল বালজাকের মনে। তাঁর চিঠিগুলি যোগাচ্ছিল অপরিসীম প্রেরণা। ইভার তৃতীয় চিঠির জবাবে বালজাকের ক্ষুদ্র পত্রটিই তার সাক্ষী।

> "তোমার চিঠি তিনখানা আমার আত্মার সর্বোত্তম সম্পদ। তুমি আমার দেহমনের সব ক্ষুধা পূর্ণ করেছ, আমার ভালবাসার সমস্ত কল্পনা ধন্য করেছ তুমি। এমন করে ভালবাসতে পারা কী যে আনন্দের···আমাদের বিচ্ছেদের সময়ে তোমার চিঠিগুলি আত্মার শ্রেষ্ঠ অবদান!···এক

দুর্দান্ত ও চিরস্থায়ী ভালবাসা আমাদের দু'জনকে নিবিড় করে বেঁধে ফেলেছে।…"

যেন ইভা বালজাকের মধ্যে নতুন প্রাণের সঞ্চার করেছে—ইতালি থেকে ফিরে এসে বালজাকের মধ্যে আর সেই আগেকার ক্লান্ত অবসন্ন ভাব নেই। বিস্বাদ বিতৃষ্ণা নিঃশেষে মুছে গেছে।

সৃষ্টির মধ্যে মগ্ন থাকতে থাকতে তারই কৃতজ্ঞতা ফুটে উঠেছে চিঠিতে:

"আবার আমি আমার হারানো আত্মবিশ্বাস ফিরে পেয়েছি। নিভে যাওয়া বুকের বাতি আবার করে জ্বলে উঠেছে। যদি আকস্মিক বাধা-বিপত্তি কিছু না আসে তিন মাস রাতদিন টানা লিখে আমি আমার ষাট হাজার ফ্রাঁ দেনা সব মিটিয়ে ফেলতে পারব।"

বালজাকের সেই গোড়ার দিকের নব্বই হাজার ফ্রাঁ ঋণ এতদিনে মাত্র চল্লিশ হাজার শোধ হয়ে ষাট হাজারে এসে দাঁড়িয়েছে। অবশ্য এ ঋণ শোধ দেওয়া, অনেক আগেই শোধ দিয়ে ফেলা, বালজাকের পক্ষে কিছুমাত্র কঠিন ছিল না; কিন্তু কেন যে পারেন নি পাঠক তা ইতিমধ্যে জেনে গেছেন। এবং ভবিষ্যতেও যে ঋণের বোঝা তাঁর বাড়বে ছাড়া কমবে না বালজাকের প্রকৃতি সম্পর্কে ওয়াকিবহাল পাঠকের তাও জানা। ইভাও তাঁকে চিনতে ভুল করেন নি।

তবু বালজাকের কী দুরন্ত আশা, ইভাকে লিখছেন:

"আমার ঋণের কথা ভেবে তুমি অপ্রসন্ন হও, আমায় তিরস্কার কর; কিন্তু এ সামান্য ঋণ শুধতে কতক্ষণ! তারপর আমার সঞ্চয় দেখে তুমি বিস্মিত হবে। আমরা আমাদের উত্তর পুরুষের জন্যে অনেক অর্থ রেখে যাব। আর আমাদের দু'জনের সংসারেও ত নিশ্চয় কোন আড়ম্বর থাকবে না। আমাদের সরল জীবন স্বচ্ছন্দে কাটাতে বছরে চার হাজার ফ্রাঁই যথেষ্ট। হাঁ, কমপক্ষে চার হাজার। এর কমে কোন ভদ্রলোকের চলে না। বছরে দু' হাজার ফ্রাঁতে ভিকতর যুগোর কী করে চলে আমি ভেবে পাইনে! ও ত ইঁদুর কুকুরের জীবন!"

এত উদ্দীপনার উৎস আগেই বলেছি, ইতালি সহ য়ুরোপের নানা শহর ভ্রমণ। সেই প্রমোদ-ভ্রমণ থেকে যে অপরিমিত উৎসাহ সঞ্চয় করে ফিরেছেন বালজাক, তার ফলশ্রুতি বিস্ময়কর। তিনি নিজেই তা লিখছেন ইভাকে:

'ল্য পারাসিৎ' শেষ করে ফেলেছি। গোড়ায় যে-কাহিনী তিন খানা উপন্যাসে সম্পূর্ণ করব ভেবেছিলাম তা ওই শিরোনামে এক বিরাট খণ্ডে

একত্র করেছি। আজ পরম তৃপ্তির সঙ্গে তোমাকে লিখছি, আমার প্রথম শ্রেণীর বইগুলির অন্যতম হয়েছে এই উপন্যাসখানা। মানুষের হৃদয়বৃত্তি নিয়ে এমন সরল প্রাঞ্জল ও গভীর কথা বুঝি আর লিখি নি। এ উপন্যাস-খানা 'ল্য ক্যুরে দ্য তুর'-এর চেয়েও মিষ্টি ও কোন অংশেই কম মর্মান্তিক নয়। আজ আমার উৎসাহের অবধি নেই। আমি শিগগিরই তোমাকে ওর প্রুফ পাঠাচ্ছি।"

এই বছরের সেপ্টেম্বরে আবার তিনি এলেন ওয়াইজবাডেন-এ। ইভা ওখানেই আছেন। আন্নার বিয়ে ১৩ অকটোবর। ওই পর্যন্ত তিনি থাকবেন ওখানে। ১৩ অকটোবরের বিয়ের নিমন্ত্রণে সাড়া দিয়ে সেপ্টেম্বরের প্রথমেই এসে হাজির হলেন বালজাক। ইভার কাছে থেকে কিছুদিন বিশ্রাম করবেন। মনের মধ্যে আর এক আশা মেয়ের বিয়ে যদি হয়ে যায়, প্রতিশ্রুতি মত মায়ের বিয়ে হতেও আর তবে দেরি নেই; তবু মনের মধ্যে প্রিয়ার পাশে অবসর যাপনটাই বড় আকাঙ্ক্ষা হয়ে উঠল, কেননা ইতিমধ্যে তিনি তাঁর জীবনের শ্রেষ্ঠ দুখানা সৃষ্টি সমাপ্ত করেছেন। বড় কঠোর পরিশ্রম গেছে তাতে।

উপন্যাস দুখানার নাম 'ল্য কুজ্যাঁ পঁ' এবং 'লা কুজিন বেত্'—বালজাক তাঁর প্রথম যৌবনেই তাঁর শিল্প-কৃতিত্বের শীর্ষে উঠে গিয়েছিলেন; কিন্তু সার্থকতার শিখর চূড়ায় যেন এইবারই উঠলেন তিনি। তাঁর অন্তর্দৃষ্টি এত মর্মভেদী, তার শিল্প-শৈলী এমন তীক্ষ্ণধার বুঝি আর কখনো হয় নি।, অসাধরণ শিল্পবোধ ও বুদ্ধিতীক্ষ্ণ চাতুরী সত্ত্বেও বালজাকের প্রথম দিককার রচনায় সোচ্চার আদর্শবাদ আর শস্তা ভাবাবেগ বইগুলির সাহিত্যমান অনেকটা লঘু করে দিয়েছে; কিন্তু এবারকার উক্ত দুটি রচনাতে সে সমস্ত দুর্বলতা অনায়াসে কাটিয়ে উঠতে পেরেছেন বালজাক। পেরেছেন কেননা, ইতিমধ্যে তিনি পোড় খেয়েছেন অনেক, অভিজ্ঞতা অর্জন করেছেন বহু আর প্রজ্ঞার গভীরতাও বেড়েছে বিপুল; ফলত জগৎ ও জীবন এক অতি পরিশীলিত শিল্পভাবনায় শাশ্বত হতে পেরেছে। পেরেছে এ জন্যে যে সমকালের মানুষের সাহিত্যক্ষুধা মিটানোর উঞ্ছবৃত্তির দিকে তাঁর তখন আর কিছুমাত্র ভ্রূক্ষেপ ছিল না। তাঁর লক্ষ্য ছিল মানুষের নিবূঢ় সত্তার মূল্যায়নের প্রতি। কালকে অতিক্রম করে এসে না দাঁড়াতে পারলে সে মূল্যায়ন সম্ভব নয়। সমকালে থেকে সমকাল হ'তে ভবিষ্যতের দিকে অনেকখানি এগিয়ে এসে সমকালকে নৈর্ব্যক্তিক ভাবে দেখার লোকোত্তর প্রতিভা বালজাকের ছিল বলেই এটা সম্ভব হয়েছে তাঁর পক্ষে। তাই আমরা ল্য কুজ্যাঁ পঁ' ও 'লা কুজিন বেত' পড়ে আজও আনন্দ

পাই, অনুভব করতে পারি যেন আজকেরই কোন যন্ত্রণাকাতর মানুষের হৃদয়-স্পন্দন শুনছি অথচ কাহিনীর সংস্থাপনা হয়েছে উনবিংশ শতকে। কিন্তু পড়তে পড়তে সে-কথা একবারও আমাদের মনে থাকে না। তা ছাড়া আর এক বৈশিষ্ট্য এর সার্বজনিক ও সার্বদেশিকতায়। এ ঘটনা ফ্রান্স ইংলণ্ড জর্মনি ভারতবর্ষ যে কোন জায়গায় ঘটতে পারত আর এর চরিত্র যে কোন দেশের মানুষ হতে পারত, যে কোন কালের—আজকের কালেরও। সেই শিল্পীই অমর, যিনি বিশেষ দেশ কাল ইতিহাসকে অতিক্রম করে চিরকালের মানুষের হৃদয়ের কথাকার হতে পারেন। এঁদের সংখ্যা সামান্য। বালজাক সেই সামান্য সংখ্যক স্মরণীয় মানুষদের একজন।

তাঁর বই পড়তে পড়তে মনে হয় নির্মম নিয়তি যদি তাঁকে এমন অকালে কেড়ে না নিত, যদি তাঁকে আরও দশটা বছর কি পাঁচটা বছরও বাঁচতে দিত ত পরিণত জীবনের প্রজ্ঞা ও অভিজ্ঞতার ঐশ্বর্যে 'কমিদি য়ুমেন' না-জানি আরও কত ঐশ্বর্যমণ্ডিত মহত্তর সম্পদ হতে পারত—যেন হত হিমালয়ের মতন উচ্চচূড়, অতলান্তিকের মতন সুগভীর, সাহারার মতন রহস্যময়, আফ্রিকার অরণ্যের মতন ভয়ংকর।

কিন্তু নিয়তির ইচ্ছা অন্য রকম। পৃথিবীর মানুষ লোকোত্তর প্রতিভার প্রাজ্ঞ বয়সের ফসল আরও বেশী করে ভোগ করুক যেন চায় নি নিয়তি। নিয়তি যেন চেয়েছে বালজাকের জীবনটাকেই একটা করুণ বেদনার দুর্ধর্ষ উপন্যাস বানাতে। যেন সেই প্রতিজ্ঞাতেই বদ্ধপরিকর নিয়তি এমন নিষ্ঠুর খেলা খেলছিল বালজাককে নিয়ে। অথবা জীবনেরই এই রীতি, সে সোজা পথে স্বচ্ছন্দ গতিতে চলতে চায় না। চলতে জানে না।

আন্নার বিয়ের কথা আগে বলেছি, কাউণ্ট জর্জ এমনিসঝেকের সঙ্গে আন্নার বিয়েতে ১৩ই অক্টোবর বালজাক নিজে উপস্থিত ছিলেন। আর নিজের বিয়ের দরকারী দলিলপত্র পকেটে করে বইছিলেন ও নিঃশব্দে জারের কানে যাতে না ওঠে এমন গোপনে ওয়াইজবাডেন চার্চের যাজককে দিয়ে বিয়ের মন্ত্রটা পড়িয়ে নেবেন মনে মনে একরকম ঠিকঠাকও করে ফেলেছিলেন। মেয়ের বিয়ে হয়ে গেলে আর কোন বাধা নেই নিজেই বলেছিলেন ইভা! সে প্রতিশ্রুতি ত রয়েছেই তা ছাড়া এবারকার পরিস্থিতিটা বালজাকের পক্ষে আরও অনুকূল। তার হেতুটাও খুব স্পষ্ট। বালজাক যখন ইভার সঙ্গে ইতালি শুদ্ধু য়ুরোপের বিভিন্ন শহর বেড়িয়ে বেড়াচ্ছেন তখন তাঁদের অবাধ মেলামেশায় কোথাও নিষেধের সীমা ছিল না। ইভা আর কোন অজুহাতেই ঠেকিয়ে রাখতে পারেন নি বালজাকের দাবি কিংবা আর চানওনি ঠেকিয়ে

রাখতে; কেননা মনে মনে তাঁর এ বিশ্বাস যেন খুব দৃঢ় ছিল যে, পঁয়তাল্লিশ বছর বয়সে তাঁর আর নিশ্চয় সন্তান হওয়ার ভয় নেই। কিন্তু সেই মিথ্যে বিশ্বাসটাই কাল হল। যথাসময়ে ইভা টের পেলেন তিনি অন্তঃসত্ত্বা। বালজাককেও তিনি খবরটা জানিয়ে ছিলেন। খবর পেয়ে বালজাক যেন সেই মুহূর্তেই তাঁর সুদূরের নক্ষত্রকে হাতের মুঠোয় পেয়ে গেলেন। সে কি আনন্দ তাঁর। সে আনন্দে আন্নার বিয়ের নিমন্ত্রণটাকেই নিজের বিয়ের আহ্বান বলে মনে করে নিয়েছিলেন বালজাক। স্বাভাবিক। বালজাকের সন্তান পেটে ধরেও কী আর তাঁর ইভা দ্বিধা করবে? না কি তা কেউ পারে? বালজাকের মনে মনে বিশ্বাস তাঁর ছেলে হবে। তিনি ছেলের নামও ঠিক করে ফেলেছিলেন—ছেলের নাম রেখেছিলেন ভিকতর অনরে বালজাক। ভিকতর য়ুগো আর বালজাক—সমকালের দু'জন শ্রেষ্ঠ কথাশিল্পীর স্মৃতি পুত্রের নামের মধ্যে স্মরণীয় হয়ে থাক, এই ইচ্ছে বালজাকের।

সব ঠিক। ছেলের নাম ঠিক। বিয়ের দিন ঠিক। কোথায় বিয়ে হবে সে স্থান ঠিক। বিয়ের জন্যে বালজাকের তরফ থেকে যে দলিল দস্তাবেজ দরকার তাও ঠিক। তবু বিয়ে হল না। ১৮৪৬-এর শুভলগ্ন বৃথা বয়ে গেল। কেননা ইভার নিজের দলিলই তখন তাঁর হাতে নেই। "য়ুক্রেনে রয়ে গেছে। আনতে ভুলে গেছি।" বলেছেন শ্রীমতী ইভা। অথচ বালজাক আগে থেকেই জানিয়ে দিয়েছিলেন, "তোমার তরফ থেকে আর কিছুর দরকার নেই কেবল তোমার বার্থ সার্টিফিকেটটা হাতে রেখো। বাপ মায়ের ডেথ সার্টিফিকেট তুচ্ছ ব্যাপার—বিয়ের ব্যাপারে অত্যাবশ্যক শুধু নিজের বার্থ সার্টিফিকেট। ওটা না থাকলে পৃথিবীর কোন দেশেই কারো বিয়ে হতে পারে না—যে চার্চেই যাই আমরা, ওটা দেখাতেই হয়, দেখাতে হবে।"

তৎসত্ত্বেও ইভার যেন গরজ নেই। গরজ ছিল না। হয়ত আসলে ব্যাপারটা ছিল বয়স গোপন করবার সেই চিরকালের মেয়েলী মনস্তত্ত্বের সমস্যা। মেয়েরা সহজে কাউকে, প্রৌঢ় বয়সে বিশেষ করে, তার সঠিক বয়সটা জানাতে চায় না। ইভাও চাইতেন না। তিনি এই সময়ে তাঁর বয়স বলতেন চল্লিশ। অথচ বার্থ সার্টিফিকেটে তার জন্ম সন ১৮০০। অর্থাৎ ছ'টা বছর তিনি বেমালুম গোপন করে যাচ্ছিলেন। বার্থ সার্টিফিকেট দেখালেই সেটা জানাজানি হয়ে যাবে এই ছিল তাঁর মনের ভয়। সেই ভয়ই কী তাঁর বিয়ের মতন একটা গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারেরও বাধা হয়ে উঠেছিল? না। হয়ত না। রহস্যময়ী এই রমণীর মনে হয়ত অধিকতর প্রবল আর কোন বাধা মাথা খাড়া করেছিল।

প্রেমিক হিসেবে বালজাককে তাঁর ভালই লাগত, সে দৃষ্টিতে তিনি তাঁকে সত্যি ভালও বাসতেন। সে কথা তিনি অকপটে স্বীকারও করেছেন, বালজাকের কাছে ত বটেই—মেয়ের কাছেও। নিকটতম বন্ধুর কাছে ভাইয়ের কাছে চিঠিপত্রে সে কথা তিনি অসংকোচে উচ্চারণও করেছেন। কিন্তু না স্বামী হিসেবে না, বালজাককে স্বামী হিসেবে ভাবতে গেলেই যেন ইভা ভীষণ দোটানায় পড়ে যেতেন। যেন তাঁর নিঃশ্বাস ফেলতে কষ্ট হত। তাঁর মনে তখন বালজাকের বিরূপ চিত্রটাই ফুটে উঠত কেবল।

"স্বামী হিসেবে তুমি আদৌ নির্ভরযোগ্য নও। তুমি বড্ড বেহিসেবী।" ইভা বালজাককে বার বার লিখেছেন। বালজাকও তার জবাবে বার বার বলেছেন: "আমার ঋণের কথা তুলছ? ও শোধ করে দিতে ক'দিন লাগবে? দেখ না, এই ত শোধ হয়ে গেল বলে। তারপরে ত আমরা সচ্ছলতার স্বর্গে বাস করব।"

যতই প্রতিশ্রুতি দিন বালজাক, তিনি তাঁর সে প্রতিশ্রুতি কখনো পালন করেন নি। ঋণ তাঁর কমা দূরে থাক ক্রমাগত বেড়েই যাচ্ছে অতএব দ্বিধাপীড়িত বিবেচক নারী এমন পুরুষের হাতে আত্মসমর্পণ করতে যদি বারংবার পেছ-পা হন, বুঝি দোষ দেওয়া যায় না তাঁকে। তা ছাড়া দ্বিধা দ্বন্দ্বের আরও নানা কারণ ত আছেই, আগেই তা নিয়ে আলোচনা করেছি। এবার আর নতুন কোন কারণ দেখানোর বা পুরোনো কারণ পুনরাবৃত্তির দরকার হল না, বার্থ সার্টিফিকেট না থাকার অজুহাতেই বিয়ে এড়াতে পারলেন শ্রীমতী ইভা। তবু মুখ ফুটে কিছু বলতে হয় যেন সে জন্যেই তিনি বললেন: "মেয়ের সবে বিয়ে হল, এখনই আমি ওকে ছেড়ে থাকি কী করে, এতকাল যাকে কাছে রেখে লালন পালন করলাম, তাকে এক্ষুনি ছেড়ে যেতে কষ্ট হচ্ছে। যাক না আর ক'টা দিন।" বলে ইভা বালজাককে বিদায় দিয়েছেন।

তবে! সন্তান! তার ভবিষ্যৎ কী হবে? বিস্মিত হতবুদ্ধি বালজাক দলিল-পত্র পকেটে পুরে আবার ফিরে এসেছেন প্যারী।

এদিকে বালজাকের সন্তান শ্রীমতী ইভার গর্ভে দিনে দিনে বাড়ছে।

তেরো

একদা বালজাক তাঁর লেখার টেবিলে এসে বসলে তাঁর সমস্ত দুঃখ দুশ্চিন্তা ক্লেশ ক্লান্তি দূর হয়ে যেত। অপমান পরাজয় নিমেষে ভুলে যেতেন তিনি। তাঁর সবটুকু অস্তিত্ব পূর্ণ করে জ্যোতির্ময় হয়ে উঠত কল্পনার সূর্য। দৈনন্দিন জীবনের সুখ-দুঃখ-গ্লানি-সংঘর্ষে ঘুলিয়ে ওঠা বাস্তব ও তার মানুষ সেই উদ্‌ভাসিত কল্পনায় সৃষ্টির প্রেরণা হয়ে উঠত। চরিত্রগুলি আপনা থেকেই কথা বলতে থাকত, জীবনের কথা; বালজাক যেন তার শ্রুতিলিপি লিখতেন। তাঁর অন্তরে পরিদৃশ্যমান জগৎ সৃষ্টির আন্দোলনে শিহরিত হতে থাকত। বালজাক আত্মবিস্মৃত হয়ে যেতেন। আত্মবিস্মৃত বালজাক ঘণ্টার পর ঘণ্টা, একটানা দশ পনর ঘণ্টা রুদ্ধশ্বাসে লিখে যেতেন। আর সে লেখার রেখায় রেখায় ফুটে উঠত দ্রষ্টার অন্তরের সেই বাস্তব সব ছবি যা দেখে আজও বিশ্বের তাবৎ মানুষ বিস্ময়ে মুগ্ধ হয়ে থাকে।

১৮৪৬-এ এসে সে শক্তি যেন হারিয়ে ফেলেছেন বালজাক। বুকের মধ্যেকার সেই সৃষ্টির অমিত উৎস যেন শুকিয়ে এসেছে, যেন এখন আর সেই আগেকার মতন তা বিপুল আবেগে উৎসারিত হচ্ছে না। প্রবল পেষণে নিংড়ানো আখের রসের মতন ফোঁটা ফোঁটা ঝরছে। সে ফোঁটা ফোঁটা বিন্দুগুলিও যেন নিরবচ্ছিন্ন নয়। মাঝে মাঝেই থেমে যায়। কলম কামড়ে চুপ হয়ে বসে থাকেন বালজাক। কোথায় সেই উদ্দাম কল্পনার উত্তাল শব্দ প্রবাহ—খুঁজে পান না, ধরতে পারেন না, কেবল হাতড়ে বেড়ান।

লেখা ফেলে চিঠির কাগজ টেনে নেন বালজাক। ইভাকে চিঠি লিখতে বসেন :

> "সব হারিয়ে ফেলেছি। আমি আর এখন এক লাইনও লিখতে পারছিনে। আমি আজ তোমাকে চাই। আমরা দু'জন এক না হতে পারলে এ জীবন বুঝি নিরর্থক হয়ে যাবে।"

চিঠি লিখতে লিখতে মনটা তাঁর আরও উচাটন হয়ে ওঠে : তিনি পিতা হতে যাচ্ছেন। পিতৃত্বের দায়িত্ব চিন্তা করে, তার গুরুত্ব ভেবে আরও বেশী অস্থির হয়ে ওঠে তাঁর মন।

সাতাত্তর হাজার ফ্রাঁ খরচা হয়ে গেছে বাড়িটার পেছনে, আরও হবে, এখনও সব কাজ সারা হয়নি কিন্তু সংশয় জাগে বালজাকের মনে—এত করছি কার জন্যে ?

প্রিয়ার জন্যে প্রাণ দিয়ে তৈরি প্রাসাদপুরী বুঝি শূন্যই থাকবে, প্রিয়ার পদচিহ্নে আর বুঝি ধন্য হল না সে।

বুঝতে পারেন না বালজাক, এত কেন সংশয় সন্দেহ ইভার মনে। ঈশ্বরের দোহাই পেড়ে চেঁচিয়ে ওঠেন, কেন কেন কেন? আমরা ত বিয়ে করে দু'মাসের মধ্যেই ঘর গুছিয়ে বসতে পারি, বাধা কী, প্রতিবন্ধক কোথায়! "তুমি শুধু বল হ্যাঁ, দেখো নিঃশব্দে নিভৃতে বিয়ে হয়ে যেতে কিছু বাধা নেই। আমার বন্ধু জারম্যা রয়েছে, আমার ডাক্তার-সুহৃদ নাকোআর্ত-এর ছেলে রয়েছে, পাসী-র চার্চের উপাচার্যের মতন শুভানুধ্যায়ীই বা কোথায় পাব! এঁরা বিয়ের সব আয়োজন করে দেবেন। যদি কোথাও আইনের বাধা থাকে, বিয়ের সার্টিফিকেটে তাকে আইন মোতাবেক করে দিতেও এঁরা কিছু বাকি রাখবেন না। তবে? তবু কেন তোমার দ্বিধা? কেন কেবল শুভদিনটাকে ঠেলে ঠেলে দূরে সরিয়ে রাখছ?"

চিঠি শেষ করে মনে মনে ভাবেন বালজাক, তবে কী অভাবের কথা ভেবে, ঋণের কথা চিন্তা করে এত বিরক্তি তাঁর, এত দ্বিধা? কিন্তু ইভা কী জানে না মাত্র দু' চারটে মাস নিশ্চিন্তে বসে কলম চালাতে পারলে সব সমস্যার ফয়সলা করে দিতে পারে বালজাক। শুধু একবার সম্মতি জানাও, একটিবার শুধু 'হাঁ' কর, অমনি দেখবে আমি কী উদ্দাম হয়ে উঠেছি উৎসাহে। কিন্তু না, ইভার যেন সেদিকে এতটুকু ভ্রূক্ষেপ নেই। তার কেবল গাল পেড়েই আনন্দ, বালজাকের দোষ খুঁজে দেখানোতেই কেবল উৎসাহ।

মেজ-এর পল্লী অঞ্চলের চার্চেই হোক কিংবা মেইজ-এর কাউন্টি চার্চে আর যত নিভৃতে বিয়ে হওয়ারই প্রতিশ্রুতি দেওয়া হোক আঁৎকে উঠছেন ইভা, যেন বিয়েটা যে-করে হোক মুলতুবি রাখতেই তিনি বদ্ধপরিকর। অন্তত আরও বছরখানেক বিয়েটা ঠেকিয়ে রাখতে চান ইভা দ্য হানস্কা। তিনি চান লোকচক্ষুর আড়ালে সন্তান ধারণ করতে, প্রসব করতে। তারপর সময় ও সুযোগ মতন যখন বিয়ে হবে, সন্তানকে আইনমোতাবেক স্বীকার করে নিলেই চলবে।

ইভার এ ইচ্ছার কথা জেনে ভীষণ আহত হন বালজাক, লেখেন:

> "তোমার এ সিদ্ধান্তের ফলে আমার সব পরিকল্পনা বানচাল হয়ে গেছে। আমার সুখী হওয়ার স্বপ্ন সত্য হয়ে উঠতে উঠতে আরও পনর মাস পেছিয়ে গেল, অন্তত এক বছরের জন্যে ত বটেই······তোমার কথা মানি, আইনগত, পারিবারিক এবং সামাজিক অনেক সমস্যা এর সঙ্গে জড়িয়ে আছে····কিন্তু সবার উর্ধ্বে কী বিয়ে নয়!···"

কিন্তু বালজাকের আশা কিছুতেই যেন পূর্ণ হতে চায় না। বালজাক ভাবেন, যেন ইভার মধ্যেই দ্বিধা, যেন ইভারই সব দোষ। অথচ না, চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিলেন বন্ধু জারমুদ; "কোথাও না, কোন গোপন চার্চেই বিয়ে করে বিয়ের খবর গোপন রাখতে পারবে না তোমরা। ইভার শত্রুর অভাব নেই। তাদের মারফৎ জারের চর খবরটা জেনে যাবে আর জানলে কী বিপদ জান? মাদাম ইভার সব সম্পত্তি জার সরকার বাজেয়াপ্ত করে নেবে।" শুনে এবার যেন একটু ধাতস্থ হলেন বালজাক। অনেকখানি শান্ত হলেন, ইভাকে জানালেন,

> "তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হোক। তবে আমার ইচ্ছা তুমি তোমার সব সম্পত্তি মেয়েকে লিখে দাও, ল্যাঠা চুকে যাক, তখন আর বিয়ের জন্যে জারের মুখ চেয়ে থাকতে হবে না।"

চিঠি লিখে অনেকটা হালকা হলেন বালজাক। এবার লেখায় মন দিতে পারলেন। আসলে পারতেই হবে, কেননা, যথেষ্ট অবহেলা হয়েছে, লেখার প্রতি আর অবহেলা করলে স্বখাত সলিলে ডুবে মরতে হবে।

ইতিমধ্যে পাঠক মহলে বালজাকের সুনাম প্রতিষ্ঠিত হয়েছে নতুন করে। 'কমেদি য়ুমেন' নতুন করে জনতার দৃষ্টি বালজাকের দিকে উৎসুক করে তুলেছে। সে খ্যাতির সঙ্গে যুক্ত হয়েছে তাঁর সদ্য প্রকাশিত উপন্যাস 'লিঁসত্রাকসিওঁ ক্রিমিনেল'-এর সুনাম। (এ বইখানা পরে 'স্প্লেনদার এ মিজার দে ক্যোরতিজন' নামে পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত করেছেন বালজাক।) তদুপরি তখন একটা কাগজে ধারাবাহিক বেরোচ্ছে 'লা কুজিন বেত'—আর সেই ধারাবাহিক রচনা পড়ে ক্রমশ মানুষ মুগ্ধ অভিভূত হচ্ছে আর বলছে, এ খানা নিঃসন্দেহে বালজাকের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কীর্তি।

সে প্রশস্তিতে প্রসন্ন বালজাক ইভাকে লিখেছিলেন, 'লা কুজিন বেত' কতখানি ভাল আমি নিজে ঠিক বুঝে উঠতে পারছিনে। তুমি নিজে পড়ে বিচার করো। তবে আমি এটুকু শুধু বলতে পারি যে, তুমি এর মধ্যে এমন কতকগুলি সূক্ষ্ম শিল্পকর্মের মুনশিয়ানা দেখতে পাবে যা আমার এতকালের সমগ্র সাহিত্য কৃতিত্বেও দুর্লভ।......জনতার উচ্ছ্বাস দেখে আমি তৃপ্ত......আমার আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হয়েছে। আমি ফ্রান্সকে পদানত করতে চেয়েছিলাম, বুঝি তা পেরেছি।"

বালজাকের মনে যখন আবার প্রত্যয় ফিরে এসেছে, নতুন উৎসাহে আবার করে যখন তিনি রচনায় মন দিয়েছেন তখন ১৮৪৭-এর জানুআরিতে এল সেই মর্মান্তিক আঘাত।

ড্রেসডেনে ইভা অসুস্থ হয়ে পড়লেন। সন্তান প্রসব করতে গিয়েই আসলে তাঁর সেই অসুস্থতা। সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর মাত্র কয়েক দিন সে বেঁচে ছিল। (কেউ কেউ বলেন, না, সন্তানটি মৃতই প্রসব করেছিলেন ইভা।) সন্তানের সেই অকাল আকস্মিক মৃত্যু সংবাদ শুনে বালজাক কেঁদে ফেললেন। ইচ্ছা হল তক্ষুনি ছুটে যান ইভার কাছে। ইভার আহ্বানে সব কাজ মুলতবি রেখে প্রত্যেকবার যেমন ছুটে গেছেন, কিছুর প্রতিই ভ্রুক্ষেপ করেন নি, এবারও তাই যাবেন স্থির করলেন ; ইভার এই সংকট সময়ে কিছুতেই তাঁর কাছ থেকে দূরে থাকতে পারবেন না। তবু থাকতে হল। এবার, এবং এই প্রথমবার সব ফেলে তিনি ছুটে এসে ইভার পাশে বসতে পারলেন না, নিয়তির নির্বন্ধ এসে বাধা হয়ে দাঁড়াল তাঁর ইচ্ছার পথে। শেয়ার মার্কেট তাঁকে ডুবিয়ে দিলে। নর্দার্ন রেলের শেয়ারের দর এমন নেমে গেল যে, অবিলম্বে আরও কিছু টাকা ভরতুকি দিতে না পারলে যে টাকাটা ইতিমধ্যে দেওয়া হয়েছে সেটাই বরবাদ হয়ে যাবে। অতএব লেখার টেবিল ছেড়ে উঠতে পারলেন না এবার আর বালজাক। এবার তাঁকে চোখের জল মুছে প্রুফ সংশোধন করতে উপুড় হয়ে পড়তে হল, নতুন রচনায় মনঃসংযোগ করতে হল জোর করে।

আর সেই জোরের কাছে আত্মসমর্পণ করে ভগ্ন-স্বপ্ন বালজাক ইভাকে লিখলেন,

> "আহ্ কী আকুল মনেই না তোমার কাছ থেকে একটি পুত্র আশা করেছিলাম—পুত্র মানে ত্রুটিহীন এক অখণ্ড জীবন—সে জীবন খণ্ডিত হয়ে থাকল, তথাপি বিশ্বাস কর ইভা, আমাদের আত্মিক সম্পর্ক নিবিড়তর হওয়ার পক্ষে এ বিঘ্ন আসলে কোন প্রতিবন্ধক নয়……অবশ্য আমাদের মিলন, যাকে আমরা আমাদের জীবনের পুরস্কার মনে করি, যার জন্যে আমাদের এত আকুতি, নানা বাধার বিরুদ্ধে এত সংগ্রাম, যার শেষে রয়েছে বিপুল শান্তি ও সুখ, এই পুত্রশোক তাতে নিঃসন্দেহে প্রবল আঘাত হানল…. …তৎসত্ত্বেও বলছি, তুমি আমারই আছ, চিরকালের জন্যে আমারই থাকবে, চিরকাল আমি তোমাকেই ভালবাসব। এই শোকের জন্যেও আমি ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিচ্ছি, এও যেন এক পরীক্ষা।……আমি আবার কাজে মন দিচ্ছি, আবার অপেক্ষা করছি তোমার সান্নিধ্যের……অপেক্ষা, হাঁ, আমি অপেক্ষাই করতে থাকব কেবল।"

দীর্ঘ তেরো বছর ধরে অপেক্ষা করছেন বালজাক। এত ধৈর্য তাঁর, এত

তিতিক্ষা, অথচ শেষ অবধি এ কী করলেন তিনি! বালজাকের মনে হল, এ দুর্ঘটনার জন্যে তিনিই দায়ী। তিনি আত্মসম্বরণ করতে পারেন নি বলেই না ইভা সন্তান ধারণ করতে, নিভৃতে তাকে বহন করতে বাধ্য হয়েছিল। তা যদি বা হল, তাঁর কী উচিত ছিল ওই পূর্ণ মাসের সময়ে তাকে মেয়ে জামাইয়ের সঙ্গে ড্রেসডেন যেতে দেওয়া। তাঁকে বাধা দেওয়া উচিত ছিল না কি? অত দূরের পথ যাওয়ার ধকলেই না অকালে সন্তান ভূমিষ্ঠ হল, আর অকালে হল বলেই না মারা গেল এমন ঐকান্তিক আকাঙ্ক্ষার পুত্র। তাঁর বংশধর তাঁর উত্তর-পুরুষ। ভাবতে ভাবতে ব্যাকুল বালজাক আবার চিঠি লিখতে বসেন:

"ইভা আমি কিছুতেই নিজেকে ক্ষমা করতে পারছি না। দীর্ঘ রেলপথ ভ্রমণের কষ্ট এই সর্বনাশ ঘটাল। তোমার কঠিন দুর্ভোগ হল, আমার পুত্রটিরও হল প্রাণান্ত। তা যা হবার হয়েছে, এবার নিজের প্রতি যত্ন নাও, সন্তান নষ্ট হওয়ার পরে মেয়েদের বড় সংকট সময় আসে, তার পরিণামও অশুভ হয়।....তোমার ডাক্তার যেমন যেমন উপদেশ দেবেন, অক্ষরে অক্ষরে পালন করবে। বাইরে বেরোবে না। বিছানায় পড়ে থাকতে পারলে কিছুতে উঠবে না। উত্তেজিত হবে না। শোক করবে না। শান্ত থাকাই এ সময়ে সব থেকে বড় চিকিৎসা।"

কিন্তু শান্ত থাকার, উত্তেজিত না হওয়ার যে পরামর্শ তিনি ইভাকে দিলেন, নিজে কিন্তু তা পালন করতে পারছেন না। অথচ শান্ত থাকার, উত্তেজিত না হওয়ার তাঁরও নিদারুণ প্রয়োজন; কিন্তু মন মানে না। মন কেবলই ক্রমাগত উচাটন উদাসীন হয়ে ওঠে—কিছুতে মন বসে না, কোনটাতেই উৎসাহ পান না, নিবিষ্ট হতে পারেন না কোন কাজের মধ্যেই।

আবার চিঠি লেখেন:

"...তুমি অন্তঃসত্ত্বা হওয়া থেকে আমি আমার ভাবী পুত্রকে যে কী ভালবেসে ফেলেছিলাম আগে বুঝি নি, দিনে দিনে ক্রমাগত অনুভব করছি সেই ব্যর্থ পুত্রস্নেহের মর্মান্তিক যন্ত্রণা। সে তো শুধু পুত্র ছিল না, আমাদের দুটি জীবনের এক অখণ্ড প্রতিভূ ছিল, ছিল দুটি আত্মার একটি প্রতীক। আমি আর থাকতে পারছি না, আমি তোমাকে দেখতে আসছি..."

"না আসবেন না," মায়ের হয়ে মেয়ে চিঠি লিখল বালজাককে, "আপনাকে দেখলে মা হয়ত উতলা হয়ে উঠবে, আর বুঝতেই পারছেন, সে হবে মায়ের বর্তমান স্বাস্থ্যের পক্ষে অত্যন্ত মারাত্মক।"

অতএব বালজাক আগুনের সামনে বসে অনিদ্রার রাত কাটান, আর ভাবেন। তাঁর সব ভাবনার বড় ভাবনা একটা বিপুল অভিমান হয়ে গলা চেপে ধরে—ইভা, ইভা ত কই তাকে একটা চিঠি লিখল না। সে কেন চিঠি দেয় না আমাকে?

সেই অতি আকাঙ্ক্ষার চিঠি অবশ্য এল কিছুদিন পরে। ইভা লিখলেন,

"তুমি মিথ্যে কাঁদছ, বৃথা শোক করছ, নোরে। যে সন্তানের জন্যে ক্রমাগত তুমি শোক করছ, চোখের জল ফেলছ, বেঁচে থাকলে তাকে পেয়ে তুমি খুশী হতে পারতে না। কেননা, সে তোমার ভিকতর অনরে নয়, সে ছেলে না, আমার একটি কন্যা সন্তান জন্মেছিল।"

"ঠিক ঠিক," ইভাকে তৎক্ষণাৎ উত্তর দিলেন বালজাক, "সত্যিই সে যদি আমার ছেলে হত, হত ভিকতর অনরে ত কিছুতে সে আমাদের ছেড়ে যেত না। আমাদের দুজনার বুক উজ্জ্বল করে সে বেঁচে থাকত, বড় হত। তাকে নিয়ে আমরা আরও পঁচিশটা বছর বাঁচতাম। এখন এই দীর্ঘ পঁচিশ বছর আমাদের সেই স্মৃতি বইতে হবে।"

বালজাকের বড় আশা ছিল তিনি আরও পঁচিশ বছর বাঁচবেন। তাঁর সেই আশার উক্তি শুনে নিয়তি সেদিন বুঝি একটু ঠোঁট বেঁকিয়ে হেসেছিল।

হাসুক কিন্তু বালজাক কখনো নিয়তিকে গ্রাহ্য করেন নি। আত্মবিশ্বাসে প্রতিষ্ঠিত পুরুষ নিজের ভবিষ্যৎ নির্মাণের দায় নিজের বলিষ্ঠ হাতে পরম প্রত্যয়ের সঙ্গে গ্রহণ করেছিলেন।

আবার ইভার চিঠি এল দিন কয়েক পরে। ইভা য়ুক্রেনে ফিরে যাবার কথা ভাবছেন। ড্রেসডেনে থেকে অযথা প্রচুর টাকা খরচ হয়ে যাচ্ছে। সেই টাকা বাঁচবে, তা ছাড়া ওখানকার সম্পত্তিরও একটা ফয়সলা প্রয়োজন। তার উত্তরে বালজাক লিখলেন,

"তোমার সম্পত্তি চাইনে, ও তুমি যাকে খুশী দাও, বিলিয়ে দাও, আমার সকল সম্পত্তির সেরা তুমি। তুমি আমার হও ইভা। এই জুলাইতেই যদি তুমি বিয়ের ব্যবস্থা করতে রাজী না হও ত তোমার অবিমৃষ্যকারিতার জন্যে তুমি শেষে দুঃখ করবে। কেন না, শোক আমাকে দ্রুত ক্ষয় করে ফেলছে। এ জীবন আর আমার সহ্য হচ্ছে না। আমি মরব। আত্মহত্যা ছাড়া আমার আর উপায় থাকবে না।"

হাঁ, শোকে ও হতাশায় বালজাক তখন আরও শীর্ণ ক্ষীণবল অবসন্ন হয়ে

পড়ছিলেন। ইভা ড্রেসডেন থেকে সোজা য়ুক্রেন চলে যাচ্ছেন জেনে বালজাক আরও ভেঙে পড়লেন। লিখলেন,

"তোমাকে ছাড়া আমার আর বাঁচার আশা নেই। য়ুক্রেন যাবার আগে একটিবার দুদিনের জন্যেও কী পারী আসবে না? তুমি যদি না আস, তোমাকে যদি আমি দেখতে না পাই আর উৎসাহ সংগ্রহ করতে পারব না। এক লাইনও লিখতে পারব না আর। আমার শোচনীয় মৃত্যু অনিবার্য হবে তখন। তাই আমি আবার বলছি, তুমি পারী এস। যদি না এস ত বল, আমি এসে তোমার সঙ্গে য়ুক্রেনে বাস করব কি না?" পত্রের শেষে যোগ করে দিলেন, "আমি তোমার জন্যে লিখি, তোমার জন্যে খ্যাতি চাই। তুমিই আমার সব। স্বদেশ বল. স্বজন বল, ভবিষ্যৎ বল তোমাকে বাদ দিয়ে সব শূন্য।"

এই মর্মান্তিক আকুল প্রার্থনার প্রেরণাতেই কিনা, কিংবা বালজাকের জন্যে ইভার সত্তার গভীরে যে প্রেম তারই অমোঘ আকর্ষণ এড়াতে না পেরে ইভা শেষমেশ পারী আসতে, য়ুক্রেন যাবার আগে পারীতে দু'মাস থাকতে রাজী হলেন।

১৮৪৬-এর ডিসেম্বরে লেখা ইভার সেই চিঠি না যেন এক বোতল মৃতসঞ্জীবনী সুরা। বালজাকের মুমূর্ষু স্নায়ুতে জীবন ঝংকৃত হয়ে উঠল, আগুন ধরে গেল রক্তের কণায় কণায়।

"এই আমি চাই, এইটুকুই আমি প্রার্থনা করেছিলাম। দু'মাস, হাঁ দু'মাস, স্বামী স্ত্রীর মতন আমরা দু'মাস বাস করতে পারলে শেষে নিক, কেড়ে নিক আমাকে মৃত্যু, আমি দুঃখ করব না। আমি পরম সুখে মরব। আমার স্বপ্ন যদি দুটো মাসের জন্যেও সত্য হয়ে ওঠে কাকে আর গ্রাহ্য করি। ইভা, আমি উদ্দীপনায় উদ্‌ভিন্ন হয়ে উঠেছি। আমার কল্পনায় জোয়ার এসেছে। আমি লিখব। লেখার প্রেরণায় আমার সমস্ত সত্তা টলমল করছে। আমি তোমার চোখের সামনে বসে 'লে পেইজাঁ' শেষ করব।"

সত্যি একটা উৎসাহের চিঠি যে কী অপরিসীম প্রেরণা হয়ে উঠতে পারে টের পাওয়া গেল কয়েক দিনের মধ্যেই। বালজাক কুড়ি থেকে ত্রিশ পাতা লিখতে থাকলেন দৈনিক। লেখা হয়ে গেল 'লা দারনিয়ার ইনকারনাসিওঁ দ্য ভোত্র্যাঁ'। সঙ্গে সঙ্গে ধরলেন 'ল্য ক্যুজঁ্যা পঁ।' ২৫ জানুআরির মধ্যে তাও শেষ করে ফেললেন। বিখ্যাত কট্টর সমালোচক ভেরোঁ যার সম্পর্কে বলেছিলেন 'লা ক্যুজিন

বেত' থেকেও মহৎ ও উন্নত রচনা এই 'ল্য ক্যুজ ্যাঁ পঁ'—আর এই সব ইভার উৎসাহের চিঠিরই ফলশ্রুতি।

তবু শুধু লেখা নিয়েই মশগুল হয়ে ছিলেন তিনি, তা নয়—ফেবরুআরির শুরুতেই ইভার পারী বাসের সব আয়োজনও সম্পূর্ণ করে ফেলেছিলেন বালজাক। বিয়ের আগে পাভিলিওঁ বুজোঁতে এসে বাস করবার প্রশ্ন ওঠে না, তা ছাড়া তখনও সে বাড়ি ইভার বাসের যোগ্য করে সম্পূর্ণ করা হয়নি, পারীতে নিভৃতে গোপনে বাস করবার জন্যে তাই শাঁজেলিজে-তে একটা প্রায় গোটা বাড়িই ভাড়া নিয়ে ফেললেন বালজাক। এনট্রেন্স রুম, ড্রইং রুম, ডাইনিং রুম, তিনটে বেডরুম, ঝি চাকরের ঘর, সঙ্গে একটা সুন্দর বাগান নিয়ে মস্ত ফ্ল্যাট, একটা গোটা বাড়ির মতন বই কী। হাঁ, খরচ হবে তারজন্যে দু মাসে দু' হাজার চারশ' ফ্রাঁ। তা হোক, প্রিয়ার পরম সান্নিধ্য পেতে যাচ্ছেন বালজাক, তার তুলনায় ও টাকা যৎসামান্য।

সব জানিয়ে বালজাক ইভাকে লিখলেন,

"না গো না, এ টাকাটাকে তুমি সাংঘাতিক অপব্যয় মনে করো না। আমার সারাজীবনের স্বপ্নের সাফল্যের ওই দাম নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর। কী-আগ্রহে, কী-আকুল পিপাসার প্রার্থনা নিয়ে যে আমি তোমার আসার পথ চেয়ে আছি কী করে বোঝাব! যে-কোন মুহূর্তে আমি তোমাকে আনতে যাব। তৈরি থেকো।"

বুঝি চিঠি পৌঁছতে না পৌঁছতে বালজাক গিয়ে হাজির। ফ্রাঙ্কফুর্ট থেকে ৪ ফেবরুআরি (১৮৪৭) পারীতে ফিরে এলেন বালজাক। সুন্দরী ইভা, প্রিয়তমা ইভা শেষমেশ আবার এলেন তাঁর প্রেমে উদ্‌ভ্রান্ত কথাশিল্পীর অঙ্কশায়িনী হতে। দু'মাসের জায়গায় আড়াই মাস থাকলেন তিনি। সেই আড়াইটা মাসও যেন নিমেষে নিঃশেষ হয়ে গেল। আবার বিচ্ছেদ। সে কষ্ট কোন মতে বুকে চেপে বালজাক তাঁকে পৌঁছে দিয়ে এলেন ফ্রাঙ্কফুর্ট এবং ফিরে এলেন—যেন ফিরে এলেন এক প্রাণহীন অবয়ব বহন করে।

সে নিষ্প্রাণ অবয়ব বহন করা তাঁর পক্ষে ক্রমশই কঠিন হয়ে উঠতে থাকল। ইভার প্রেরণায় তাঁর প্রতিভার মূলে সঞ্জীবনী সুধা সঞ্চার হয় ঠিকই কিন্তু এখন আর তা বেশীদিন সক্রিয় থাকে না। মন কেমন নিরুদ্যম অবসন্ন হয়ে পড়ে। আসলে শরীর দিচ্ছে না। ইভাকে ফ্রাঙ্কফুর্ট পৌঁছে দিয়ে এসে বালজাক আবার লেখায় মন দিলেন বটে—দিতে বাধ্য হলেন কারণ অবিলম্বে তাঁকে 'লে পেইজাঁ' শেষ করে দিতে হবে। আর লিখতে হবে একখানা নাটক। নাটকখানা লিখতে

পারলে ভিসকোতি'র কাছে তাঁর ঋণ পনর হাজার ফ্রাঁ শোধ হয়। এ ঋণ অবিলম্বে শোধ না করলেই নয়। কিন্তু এখন আর বালজাক আগের মতন অমিতশক্তি নন। স্বাস্থ্য ভেঙে পড়েছে। এখন আর রাত জাগতে পারেন না। কখন্ অজ্ঞাতসারে চোখের পাতা বুজে যায়, নেতিয়ে পড়ে অবসন্ন শরীর। নিজের সম্পর্কে একটা অনিশ্চয়তাও এসে গেছে মনের মধ্যে। শরীরের সঙ্গে মনের জেদ জোরটাও কমে আসছে দ্রুত। ডাক্তার পই পই করে বারণ করছেন, "এত খেটোনা বালজাক, সাবধান হও, একটু সচেতন হলে এখনও হয়ত ভাঙা শরীর জোড়া লাগতে পারে। পরে আপসোস করবে।"

পরম আত্মীয়ের মতন ডাক্তার নাকোআর্ত বন্ধুকে উপদেশ দেন। কিন্তু পাওনাদার সে কথা শুনবে কেন! 'লা প্রেস'-এর সম্পাদক জিরারদি তাঁর কাগজে 'লে পেইজাঁ' ধারাবাহিক ছাপছিলেন। কিন্তু বালজাক দু'দুবার কিস্তির লেখা দিতে অক্ষম হওয়ায়, "অনিবার্য কারণে ধারাবাহিক রচনা প্রকাশ সম্ভব হল না" বলে বিজ্ঞপ্তি দিয়ে তাঁকে পাঠকের কাছে ক্ষমা চাইতে হয়েছে। এবার তিনি ক্ষেপে উঠেছেন, বালজাককে চেপে ধরেছেন, "বইটি সম্পূর্ণ লিখে আমার হাতে দাও, তবেই আমি ধারাবাহিক ছাপব। নয়ত এখানেই ইতি, তৃতীয়বার আর আমি আমার গ্রাহকের কাছে বেল্লিক বনতে চাইনে।

অথচ শরীর দিচ্ছে না। অনিচ্ছুক ঘোড়ার মতন বেঁকে বসেছে অসুস্থ শরীর। অসমাপ্ত পাণ্ডুলিপির ওপরে কলম রেখে বালজাক নৈরাশ্যে কঁকিয়ে ওঠেন: "না, আমি আর পারছি নে।"

তা পারছি না বললেই ছাড়বে কেন সম্পাদক। তিনি চেপে ধরলেন, "না পার টাকা ফেরত দাও। তোমাকে গুচ্ছের টাকা আগাম দিয়ে বসে আছি। ও-টাকা আমি জলে ফেলতে পারব না।"

যেন মুক্তি পণ চাইছে জিরারদি। এ টাকা শোধ দিতে পারলে তবেই তিনি নিশ্চিন্ত মনে য়ুক্রেনে ইভার কাছে চলে যেতে পারেন। চলে যাবেন। স্থির করে ফেলেছেন, এবার তিনি ইভাকে সঙ্গে নিয়ে ফিরবেন। আর টালবাহানা নয়। স্ত্রী চাই, স্ত্রীর কোলে মাথা রেখে নিশ্চিন্ত হতে চাই। আমি সুখ চাই, শান্তি চাই। আর লিখতে চাই নে।

ইভাকে লেখেন তিনি। চিঠির পর চিঠি লেখেন। তার সব চিঠিতে ওই সকরুণ উক্তি থাকে। "আমাকে বাঁচাও। তোমার কাছে আসতে অনুমতি দাও। আমি আর একলা থাকতে পারছি নে। আমি মরে যাচ্ছি।"

পুনঃপুন সেই এক প্রার্থনার করুণ আকুতি শুনে শুনে অবশেষে অনুমতি দিলেন ইভা। আসলে বালজাকের বিরুদ্ধে তাঁর যতই অভিযোগ থাক, এযুগের শ্রেষ্ঠ লেখকটিকে তিনি অন্তরের গভীরে ভালবেসে ফেলেছেন। ইভা নিষ্ঠুর, ইভা হিসেবী, ইভা অহংকারী—সবই হয়ত সত্য কিন্তু সবার ওপরে সত্য তিনি বালজাকের প্রিয়া। সেই প্রিয়ার ডাক এল অবশেষে, "প্রিয় নোরে, য়ুক্রেনের শীত যদি সহ্য করতে পার, চলে এস।"

তৎক্ষণাৎ সব আলস্য অনীহা অবসাদ মিলিয়ে গেল বালজাকের। অসুরের বল এল শরীরে। যাত্রার আয়োজনে ব্যস্ত হয়ে উঠলেন বালজাক। ভিসা করলেন, পাসপোর্ট নিলেন এবং দ্রুত হাতে কয়েকটা গল্প লিখে ফেললেন, অধিকন্তু একটা সুন্দর উপন্যাসের পরিকল্পনা শুনিয়ে এক প্রকাশককে ঘায়েল করতে পারলেন; ফলে একটা মোটা টাকাই পেলেন সব মিলিয়ে। অবশ্য তার থেকে কিছু খসাতে হল নাছোড়বান্দা এক পাওনাদারের ঋণ শোধ করতে; অবশিষ্ট যা রইল তার ওপরেই ভরসা করে বেরিয়ে পড়লেন বালজাক। প্রিয়ার উদ্দেশে যাত্রাপথে পর্বতপ্রমাণ বাধাও তুচ্ছ হয়ে গেল। ৫ সেপ্টেম্বর রওনা হয়ে ১৩ সেপ্টেম্বর এসে পৌঁছলেন প্রিয়ার বাড়ি ভের্ঝকোভানিয়ায়।

খাওয়ার কষ্ট, যানবাহনের কষ্ট, রাস্তার ধকল, দুরন্ত শীত, সব তুচ্ছ হয়ে গেল। প্রিয়ার স্বপ্ন সমস্তটা পথ উজ্জীবিত করে রাখল তাঁকে। তাঁর যে তখন কী সুখ মনের মধ্যে, ইভাকে লেখা কয়েকটা লাইনেই তা ভাস্বর হয়ে আছে।

> "তোমাকে নিয়ে সবই সম্ভব, তোমাকে ছাড়া কিছুই সম্ভব নয়। তোমাকে বাদ দিয়ে আমি শূন্য। তোমার প্রতীক্ষায় আমি ক্ষয় হ'য়ে যাচ্ছি……মনে করো না এ আমার নালিশ, তোমাকে মনের মধ্যে করে আমার মতন সুখী বুঝি কেউ না। …তুমি তোমার মধ্যে অনন্তকে বেষ্টন করে আছ।"

সেই অনন্তের দিকে উন্মাদের মতন ছুটে চলেছেন বালজাক। ইভার কাছে পৌঁছতে তাঁর তর সইছিল না। সাধারণত একজন যাত্রীর পারী থেকে পূর্ব পোল্যাণ্ডের ভের্ঝকোভানিয়া যেতে কম পক্ষে চৌদ্দ দিন সময় লাগে। জর্মনির মধ্যে দিয়ে প্রথমে ট্রেনে যেতে হয়, জর্মনি ছাড়ালে তারপর পোল্যাণ্ডের প্রান্ত পার হতে হয় বাসে করে। ট্রেন থেকে নেমে কোথাও আরামে যাওয়ার রাস্তা নেই এক মাইলও।

বালজাক ঠিক করলেন এই দীর্ঘ পথ তিনি সাত দিনে পার হবেন। তদনুরূপ সংক্ষিপ্ত পথও একটা বের করলেন তিনি। পারী থেকে এলেন কোলোন।

কোলোন থেকে হানোভের, সেখান থেকে বেরলিন হয়ে ব্রেসল্যু এবং এসে পৌছলেন পোল্যাণ্ডে ; আর সেই মুহূর্তে মুগ্ধ হয়ে গেলেন দেখে—ইভার দেশ, জর্মনরা এখনও একে নষ্ট করতে পারেনি, এখনও এ-দেশটা মধ্যযুগের অন্ধকারে এক বিপুল রহস্য হয়ে আছে। বিস্ময়ের চোখ বিস্ফারিত হয়ে দেখতে থাকল চারদিক।

পোল্যাণ্ডের অর্ধেকটাই প্রায় প্রাচীন অরণ্যের দুর্গমতা—একজন ফরাসী ভাবুকের চোখে সে এক অতল বিস্ময়। ডাক-গাড়ি তাঁকে পূর্ব পোল্যাণ্ডের যত গভীরে নিয়ে চলল, ততই যেন বালজাকের মধ্যে একটা অ্যাডভেনচারের পৌরুষ উত্তেজনায় থরথর করতে থাকল। পোল্যাণ্ডে ইভার দেশের অংশটাই সব চাইতে দুস্তর। পোল-সীমান্তে রাশিয়াকে ছুঁয়ে আছে ইভার বিশাল জমিদারি। যেন ঈশ্বর ইচ্ছে করেই একে অবশিষ্ট বিশ্ব থেকে বিচ্ছিন্ন করে গহন অরণ্যে গোপন করে রেখেছেন।

এই দুর্গম অরণ্য-গোপন প্রদেশের দরজায় রয়েছে জারের সীমান্ত-প্রহরী। এদের অনুমতি ছাড়া আর এক পা-ও এগোবার একতিয়ার নেই কোন বিদেশীর। রূঢ় অশিক্ষিত এই সীমান্ত প্রহরীদের অসভ্য আচরণের কথা যাত্রাকালে শুনে এসেছেন বালজাক।

কিন্তু এখন বাস্তব অভিজ্ঞতা হল অন্যরকম, বুঝি বালজাক বলেই তা হল। ক্যাভেলরি অফিসার তাঁর পাস-পোর্ট পরীক্ষা করতে করতে সহসা মুগ্ধ কণ্ঠে বিশুদ্ধ ফরাসী ভাষায় পরম সম্ভ্রমের উক্তি করলেন।

"আপনিই কী সেই বিখ্যাত লেখক অনরে দ্য বালজাক ?"

এই সুদূর পোল-প্রান্তে কেউ ফরাসী ভাষা জানবে, ফরাসী ভাষায় কথা বলবে বালজাক কল্পনাও করেন নি। তদুপরি এমন সুষ্ঠু উচ্চারণ আর ভক্তি গদগদ কণ্ঠ শুনে তিনি হকচকিয়ে গেলেন—নিঃশব্দে মাথা নেড়ে তিনি সায় দিলেন, হাঁ, তিনিই লেখক বালজাক। আর যায় কোথা! অফিসারটি উৎসাহে ব্যস্ত হয়ে উঠলেন, রাজার মতন সমাদরে তাঁর ব্যারাকে নিয়ে তুললেন, প্রচুর খাওয়ালেন এবং বালজাকের 'প্যের গোরিও' উপন্যাস খানি সামনে ধরে দিয়ে বললেন—"এই বইখানির ওপরে আপনি আপনার নামটি সই করে দিন। এ আমার চিরকালের গর্বের বস্তু হয়ে থাকবে।"

এই অরণ্য প্রদেশের জনমানবহীন পথপ্রান্তে তাঁর এমন একজন মুগ্ধ পাঠক আছে জেনে বালজাকের বিস্ময় আর অহংকারের অবধি রইল না। এই ভক্ত পাঠকটির সহায়তায়ই বালজাকের অবশিষ্ট পথটুকু পার হতে আর বিশেষ কষ্ট

হয়নি। ক্যাভেলরি অফিসারটি তাঁকে দু'ঘোড়ার একটি কিবিতকা (মিলিটারি গাড়ি) দিলেন। সেই গাড়ি চালিয়ে নিয়ে চলল এক দুঃসাহসী কসাক সৈনিক। দুর্দান্ত শীতে জমে যাওয়া কঠিন বরফের এবড়ো-খেবড়ো পথ বেয়ে কসাকের চাবুক খেয়ে মিলিটারি ঘোড়া পক্ষীরাজের মতন ছুটে চলল। শীতে শক্ত কাঠ হয়ে যাচ্ছিলেন বালজাক, আর ঝাঁকুনিতে হাড় থেকে মাস আলগা হয়ে আসছিল। মাঝে মাঝেই ঘোড়া দুটোকে বিশ্রাম দিতে কিংবা ঘোড়া বদল করতে পোসটিং স্টেশনে থামতে হচ্ছিল কসাকটিকে আর সেই সময় সে গলায় ঢালছিল বোতল বোতল ভোডকা। সে মদ না, যেন তরল আগুন। বরফ হয়ে আসা রক্তকে তরল রাখতে বালজাককেও তার দু'চার ঢোক মাঝে মাঝে গিলতে হয়েছে। সেই তরল আগুন গলাধঃকরণ করে মুহূর্তে তাঁর সর্বাঙ্গ জ্বলে উঠেছে তবু যেন শীত কমছিল না, ব্যথা মরছিল না গায়ের। একমাত্র ইভার চিন্ময় মূর্তি মনের মধ্যে থেকে শক্তি জোগাচ্ছিল তাঁকে। তিন দিন এইভাবে একটানা ছুটে সাত দিনের পথ পেরিয়ে এলেন বালজাক। এসে পৌছলেন তাঁর যাত্রার সীমায়, তাঁর স্বপ্নের স্বর্গে।

চৌদ্দ

সামরিক শকট 'কিবিতকা' এসে থামল মস্ত এক দেউড়ির সামনে। বালজাক চোখ তুলে তাকালেন। অদূরে সাদা কালো পাথরের এক বিশাল অট্টালিকা। তার কয়েক শ' জানালা, কয়েক ডজন মিনার—অরণ্য ভূমির নির্জনে সে যেন এক রহস্যময় রাজপুরী। স্বর্গ! সত্যি স্বর্গ। মর্ত্যে যেন অমর্ত্যের আবাস। ক্ষণকাল মুগ্ধ হয়ে থেকে চোখ নামালেন বালজাক। কসাক সৈন্যটিকে বকশিশ দিতে গেলেন। সে দু'পা পিছিয়ে গেল। সসম্ভ্রমে কুর্নিশ করে ছুটে গিয়ে তার কিবিতকায় উঠল; ঘোড়ার পিঠে জোর চাবুক মেরে নিমেষে রাস্তায় নেমে উধাও হয়ে গেল সে।

বালজাককে পথ দেখিয়ে ইভার কাছে নিয়ে এল এক দাসী।

ইভা একলা বসে চা খাচ্ছিলেন। চোখ তুলে তাঁর আর বিস্ময়ের অবধি রইল না। দু' সপ্তাহের পথ সাতদিনে পেরিয়ে এলে কার চোখে না বিস্ময়ের ঘোর লাগে।

"নোরে"! অবাক গলায় অভিভূত সুখে বলে উঠলেন ইভা, দু'হাত বাড়িয়ে এগিয়ে এলেন, "নোরে তুমি! সত্যি তুমি! স্বাগতম্, স্বাগতম্।

বিশাল প্রাসাদের বিপুল ঐশ্বর্যের মধ্যে ইভাকে এক মহিয়সী রাজ্ঞীর মতন মনে হল বালজাকের। তিনিও অভিভূত হলেন। এতদিনে এইবার বুঝতে পারলেন ইভার চরিত্রের কোন্ বৈশিষ্ট্য এতদিন এমন করে তাঁকে দূরে ঠেকিয়ে রেখেছে। সম্রাজ্ঞীর সহজাত অহমিকাকে যেন বালজাক ইভার মধ্যে জীবন্ত দেখতে পেলেন এখন। বন্যরা বনে সুন্দর সম্রাজ্ঞী তাঁর সিংহাসনে। অন্যত্র যা তাঁর পরম দোষ, যথাস্থানে সেই তাঁর মুখ্য গুণ।

ইভার প্রসারিত বাহুর মধ্যে নিবিড় সুখে আত্মসমর্পণ করলেন বালজাক। আলিঙ্গনাবদ্ধ হলেন দু'জনে। চুমু খেলেন। তারপর আপনাকে মুক্ত করে বালজাকের চোখে চোখ রাখলেন ইভা। হাসলেন। হাত ধরলেন তাঁর।

"এস চা খাবে।"

ইভা একটা আরাম কেদারায় বসিয়ে দিলেন বালজাককে।

ইভার খাস-কামরাগুলির সংলগ্ন ছ'খানা ঘরের একটা সুইট দেওয়া হয়েছে বালজাককে। বসার ঘর, পড়ার ঘর, শোবার ঘর মিলিয়ে সে যেন এক আস্ত বাড়ি। আর নেই কী তাতে! আলনা আলমারি চেয়ার টেবিল বুককেস বিবিধ চিত্র, মূল্যবান কাঠের মস্ত খাট তাতে দুগ্ধফেন-কোমল বিছানা। কেবল বসবার ঘরটাই পারী শহরের অভিজাত পরিবারের যে-কোন ফ্ল্যাটের দুখানা ঘরের সমান। তাছাড়া ঘরগুলির মেঝেয় পাতা কারপেট আর ফারনিচারের চেহারা দেখলে পরম বিলাসী ফরাসীরও মনে ঈর্ষা জাগবে এমন মূল্যবান আর মনোহর সে-সব। সমস্ত ক'খানা ঘর সাজানো হয়েছে সর্বাধুনিক বিবিধ আরাম আর স্বাচ্ছন্দ্য দিয়ে। এর কারণও অবশ্য আছে। প্রত্যেকটি ঘরই এত সুসজ্জিত যে-হেতু রাস্তার দুরন্ত কষ্ট সয়ে সভ্য সমাজ থেকে এত দূরে যাঁরা হানস্কি পরিবারের সঙ্গে দেখা করতে আসেন, সেইসব স্বজন বন্ধুরা চার ছমাস না থেকে যান না। ওঁরাই ছাড়েন না তাঁদের। শুধু অতিথিদের জন্যে না নিজেদের স্বাচ্ছন্দ্যের জন্যেও বটে, সমস্ত প্রাসাদ জুড়ে এই নিপুণ রাজকীয় রুচির আড়ম্বরের বাহার দেখে বালজাক পদে পদে অবাক হন। মুগ্ধ হন।

বালজাকের ঘরের দোরে চব্বিশ ঘন্টার জন্যে মোতায়েন থাকে একটি ক্রীতদাস। ইঙ্গিত মাত্র সে ছুটে আসবে। তুচ্ছতম জিনিসটিও পৌঁছে দেবে

হাতের কাছে, নিকৃষ্টতম কাজটিও করে দেব অম্লান মুখে, পায়ের কাছে কুকুরের মতন লুটিয়ে পড়বে পুনঃপুন।

সারা জীবন ধরে যে বিলাস ঐশ্বর্য আর স্বচ্ছলতার স্বপ্ন দেখে আসছেন বালজাক, সহসা তারই মাঝখানে নিজেকে আবিষ্কার করে বালজাক বিপন্নবিস্ময়ে বার বার হতবাক হয়েছেন। এই পরিবেশের উপরে একটা উপন্যাস ফাঁদতে লুব্ধ উত্তেজিত হয়ে উঠেছেন কিন্তু কেবলই হাত কেঁপে কেঁপে উঠেছে তাঁর। কলম রেখে লেখার টেবিল ছেড়ে ব্যালক্যানিতে এসে দাঁড়িয়েছেন। ইভার প্রাসাদ বেষ্টন করে বিরাট পার্ক বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত। তারপর যতদূর চোখ যায়, খেত-খামার অরণ্যভূমি সব—সমস্তই নাকি ইভার। এই অতুল ঐশ্বর্যের পরিমাপ করতে বালজাকের চক্ষু স্থির মন অবশ হয়ে আসে। ভের্ঝকোভানিয়া যেন জমিদারি নয় ছোটখাট এক সাম্রাজ্য ইভার। তিন হাজার প্রজা ও পুত্র পৌত্রাদিক্রমে তাদের পরিবার সকলেই ইভার ক্রীতদাস, পদলেহী কুকুরের মতন বংশবদ! বালজাকের বুঝতে বাকি রইল না এই প্রতুল সমস্তের অধিকারিণী ইভার স্বভাবের মধ্যে সম্রাজ্ঞীর ঔদ্ধত্য আর ঐশ্বর্যের অহংকার স্বাভাবিক। আরও স্বাভাবিক তাঁর নিস্পৃহতা, নিষ্ঠুরতা।

সামন্ত সম্রাজ্ঞীর ক্ষমাহীন নিষ্ঠুরতার সেই দৃশ্য সচক্ষে দেখে বালজাক একদিন অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলেন। নির্মম শীতে সামান্য পোশাকে বরফ-জলে কাদায় কঠোর পরিশ্রম করে যারা ফসল ফলায় ফসলের ওপরে তাদের এতটুকু অধিকার নেই। বরাদ্দের অধিক একমুঠো না বলে নিলে তাদের কী যে কঠিন সাজা হয় ইভা তাঁকে নিয়ে গিয়েছিলেন তাই দেখাতে।

ইভা যে কতখানি নিস্পৃহ তা তিনি জানতেন; কিন্তু নারী হয়ে তিনি যে কতখানি নিষ্ঠুর তা তাঁর জানা ছিল না।

বালজাক বলেছিলেন, "এক থলে গম নিয়েছে তার আবার শাস্তি কী, ও ত তোমার ইঁদুরে চড়ুইতেই খেয়ে ফেলে।"

"তার অনেক বেশী খায়।" গ্রীবা বঙ্কিম করে ঠোঁট টিপে হেসেছিলেন ইভা!

"তবু……?"

বালজাকের কথা শেষ হতে না দিয়ে ইভা বলেছিলেন, "তবু বরাদ্দের বেশী এতটুকু দেওয়া হবে না ওদের। চুরির প্রশ্রয় আরও দেওয়া হবে না। আজ এক থলে নিয়ে পার পেলে কাল দু থলে নেবে, পরশু তিন থলে। কুকুরের মতন পদলেহী এই মানুষগুলি সেই প্রশ্রয়ের সুযোগে একদিন মাথা

উচিয়ে দাঁড়াবে। হাজারটা মানুষ এক জোট হয়ে ছুটে আসবে সেদিন। এই নির্বান্ধব দেশে একলা তুমি তখন তাদের কেমন করে সামলাবে। তোমার জমিদারি ছেড়ে পালাতে হবে না তখন? তাই কখনো বুঝতে দেওয়া হবে না ওদের, ওরাও মানুষ। ওদেরও মানুষের অধিকার আছে।”

মানুষের মনুষ্যত্ব ভুলিয়ে দেয়, চিরদিন কুকুর করে রাখে, সে কোন্ শাস্তি দেখতে কৌতূহলী হয়ে উঠেছিলেন বালজাক।

প্রাসাদ থেকে দূরে খামার ছাড়িয়ে ‘রাই’ খেত, তারপর বার্চ বন। সেই খেত আর বনের মাঝখানে ক্রীতদাসদের এক একটা গ্রাম। অপরাধীর গ্রামের মাঝখানে একটা জায়গা বন কেটে সাফ করা হয়েছে। সেখানে শ’খানেক মানুষের একটা জমায়ত। ইভা আর বালজাককে নিয়ে ঘোড়ার গাড়ি সেখানে এসে পৌছলে সেই শ’খানেক শীর্ণ-মুখ অর্ধাবৃত মানুষ মাটিতে উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ে তাদের ক্রীতদাসত্বের আনুগত্য জানাল। তারপর তাঁরা এসে বসলেন তাঁদের নরম গদি আঁটা আসনে। বালজাক বসে চারধারে তাকালেন। সামনে একটা মস্ত খুটি পোঁতা। তার সঙ্গে চামড়ার হাতকড়া ঝুলছে। অদূরে বৃত্তাকারে দাঁড়িয়ে আছে জনতা। শীতার্ত অর্ধনগ্ন মানুষগুলি নিঃশব্দ নিথর। মজা দেখতে এসে মানুষ এমন শক্ত অসাড় হয়ে দাঁড়ায় না, তাদের চোখে ভয় আতঙ্ক থাকে না। বালজাক বুঝলেন, একজনকে শাস্তি দিয়ে আর সকলকে শিক্ষা দিতে ডেকে আনা হয়েছে। ওরা স্বেচ্ছায় আসেনি, ওদের চোখে সেই অনীহাও বালজাক দেখতে পেলেন।

হতভাগ্য বান্দাকে ততক্ষণে নিয়ে আসা হয়েছে সেই খুঁটির কাছে। তার কবজিতে হাত-কড়া পরিয়ে দেওয়া হয়েছে। শীর্ণমুখ কৃশ চেহারার মানুষটির বয়স বছর চল্লিশ হবে। তার চুলগুলি উস্কখুস্ক, দাড়ি নোংরা ময়লা। পরনের পায়জামা গায়ের কোর্তা অত্যন্ত বেঢপ বেমানান। একটা দুর্ভাগ্যের ছাপ যেন তার সর্বাঙ্গে।

চাষাদের পুরোহিত, আসামীর মতনই সাততালি পোশাক-পরা জীর্ণ দেহ নোংরা একটি মানুষ এগিয়ে এসে তার কপালে হাত দিয়ে বিড় বিড় করে কী বলল, শেষে নিজের দুকাঁধে বুকে আঙুল ঠেকিয়ে ক্রশ এঁকে সরে দাঁড়াল এক ধারে। আসন্ন শাস্তির আতঙ্কে হতভাগ্য ক্রীতদাস একটা করুণ শব্দ করে নিঃশ্বাস ছাড়ল।

উপস্থিত মানুষগুলি অনড় স্থাণু হয়ে দাঁড়িয়ে আছে যেন পাথর হয়ে গেছে সকলে। পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে, ওরা জেনে গেছে, এ তাদের বিধাতার বিধান। একে খণ্ডানো যাবে না। জন্ম মৃত্যু ঝড় আগুনের মতন এ শাস্তিও স্বাভাবিক এবং অনিবার্য। মেনে নিতে হবে। না মেনে উপায় নেই।

ইভার দিকে তাকালেন বালজাক। ইভা শান্ত কঠিন যেন ইস্পাতের মতন ঠাণ্ডা। দৃঢ় এবং অনুচ্চ কণ্ঠে ইভা রায় দিচ্ছেন, "তুমি ভোড্‌কা বানানোর জন্যে রাই চুরি করেছিলে, তোমার শাস্তি পঞ্চাশ ঘা চাবুক।"

তখন জাঁদরেল এক জোয়ান, ইভার মাইনে করা জল্লাদ তাতে সন্দেহ রইল না বালজাকের, এগিয়ে এল। তার হাতে লম্বা একটা চামড়ার চাবুক। ইভা চাবুকটা তুলে নিলেন। শুকনো কাঁচা চামড়ার চাবুকটার গায়ে মাঝে মাঝে লোহার কাঁটা জড়ানো। শেষের দিকে একটা কাঠের মোটা হাতল।

ইভা চাবুকটা পরীক্ষা করতে করতে জিজ্ঞেস করলেন, "এটাকে দুধে ভিজিয়ে শুকিয়ে নিয়েছ ত ?"

"নিশ্চয়।" টুপীতে হাত দিয়ে অবনত জোয়ান জল্লাদ জবাব দিল, "আপনার আদেশ আমি অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছি।"

"চাবুকটাকে আবার দুধে ভিজানো হবে কেন ?" অবাক হয়ে শুধোলেন বালজাক।

"দুধে ভিজিয়ে শুকোলে চাবুকের চামড়া খুব শক্ত আর ধারালো হয়।" জল্লাদের হাতে চাবুকটা ফিরিয়ে দিতে দিতে অনিচ্ছুক গলায় জবাব দিলেন ইভা।

লোকটা চাবুক হাতে করে আসামীর সামনে এগিয়ে গেল। পকেট থেকে একটা ছুরি বের করে তার কোর্তাটাকে পিঠের ওপর দিয়ে আগাগোড়া ফালি করে দিলে তারপর টেনে খুলে ফেললে গা থেকে।

আরও কতবার যেন চাবুক খেয়েছে এই হতভাগ্য বান্দা ; জীর্ণ হাড়-বের-হওয়া পিঠে তারই ছোট বড় শুকনো ক্ষত চিহ্ন দেখতে পেলেন বালজাক। উপস্থিত দর্শকদের মুখ থেকে একটা চাপা গোঙানি বেরিয়ে এল। ইভা তার কুশানে সোজা হয়ে বসলেন। তাঁর চোখ বিস্ফারিত হয়ে উঠেছে, উত্তেজনায় চকচক করছে চোখের মণি। তাঁর ঠোঁট আর্দ্র, ঈষৎ ফাঁক।

জোয়ান জল্লাদ হতভাগ্যের পিঠ লক্ষ্য করে চাবুকটাকে একবার শূন্যে আস্ফালন করল। চাবুকের লোহার কাঁটা বাতাসে শিস্ দিয়ে উঠল, শুকনো শক্ত চামড়ার চাবুকের ধার হাওয়া কেটে সাঁই সাঁই আওয়াজ করল।

জল্লাদ ইভার দিকে ফিরে মাথা নত করে অভিবাদন জানাল, যেন নিঃশব্দে বলল, সব তৈরি।

ইভা শিরদাঁড়া সোজা করলেন। বঙ্কিম গ্রীবা হেলিয়ে ইঙ্গিত করলেন, তবে শুরু কর।

এবার বাতাসে তীক্ষ্ণ আওয়াজ তুলে চাবুক এসে বান্দার পিঠে পড়ল। একটা অমানুষিক আর্তনাদ করে উঠল আসামী। তারপর গোঙাতে থাকল। আকাশে যেন বাতাস নেই, জনতা হাঁপাচ্ছে। চাবুক উঠছে আর পড়ছে। ইভা কখন অজ্ঞাতসারে বালজাকের কব্জি চেপে ধরেছেন। তাঁর মুঠো ক্রমশ কঠিন হচ্ছে বালজাকের কবজিতে। তাঁর চোখ অপলক। সমস্ত ইন্দ্রিয় দৃষ্টি হয়ে বিঁধে আছে আসামীর পিঠে। চাবুকের বাড়িতে পিঠ কেটে কেটে যাচ্ছে। ফোঁটা ফোঁটা রক্ত জমতে জমতে এখন তা অঝোতে ঝরতে শুরু করেছে। ইভাকে দেখে বালজাকের মনে হল, অত্যাচারের দৃশ্য যেন রক্তে নেশা ধরিয়ে দিয়েছে ইভার। চাবুকের দ্রুত ওঠা নামার সঙ্গে সঙ্গে ইভার নিঃশ্বাস প্রশ্বাসও দ্রুত দ্রুততর হচ্ছে, মাঝে মাঝে যেন দম বন্ধও হয়ে যাচ্ছে ; দম বন্ধ করে থাকছে ইভা। তাঁর হাতের নখ ক্রমশ বালজাকের কবজির মাংসে কেটে বসে যাচ্ছে, তাঁর হাতের তাপ বাড়ছে, বালজাকের কবজি গরম হয়ে উঠছে। বালজাকের সন্দেহ রইল না—বান্দার ওপরে এই চাবুকের মার ইভার মধ্যে এক প্রবল দৈহিক সুখ সঞ্চার করেছে। একটা অসহ্য শারীরবৃত্তিক সুখে অস্থির হয়ে উঠেছে ইভা।

গোটা বারো চাবুক পড়তেই মানুষটার পিঠ ক্ষতবিক্ষত হয়ে গেল। পিঠে চামড়া বলতে আর কিছু রইল না। সারা পিঠটাকে একটা লাল রঙের ময়দার পুলটিশ বলে মনে হতে থাকল।

জল্লাদ রক্তে ভেজা চাবুকটাকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে আর একটা নতুন চাবুক তুলে নিল।

"ও আবার একটা নতুন চাবুক তুলে নিচ্ছে কেন?" জিজ্ঞেস করলেন বালজাক।

তাঁকে অন্যমনস্ক করবার জন্যে বিরক্তিতে রেগে উঠলেন ইভা, "গাধা কোথাকার, রক্তে ভিজে চাবুকের ধার মজে গেছে না?" ফিস্ ফিস্ শব্দে ধমকে উঠলেন তিনি।

আরও বারো ঘা চাবুক পড়ার পরে এবার আসামীর শরীর শিথিল মাথা ঘাড়ের ওপরে কাত হয়ে পড়ল, পা অবশ হয়ে লেপটে রইল মাটিতে। হাতকড়ার সঙ্গে যেন ঝুলতে থাকল মানুষটা। জল্লাদ থামল। ঝুঁকে পড়া মাথাটাকে নাড়া দিল, কোন সাড়া পেল না। সে ইভার দিকে ফিরে তাকাল তখন। হাতে চাবুক, চোখে জিজ্ঞাসা—চাবুক সে চালাবে কিনা।

ইভা হাত তুলে ইঙ্গিত করলেন, চালিয়ে চাও।

"কিন্তু মানুষটা যে মরে গেছে ইভা!" বালজাক শিউরে উঠে বললেন।

"পঞ্চাশ ঘা চাবুক ওর পানিশমেণ্ট," ইভা কঠিন হয়ে বললেন, "মরে যাক আর বেঁচে থাক পঞ্চাশ ঘা চাবুক ওকে খেতেই হবে।"

মুহুর্মুহু চাবুক পড়ছে আর মৃত শরীরটা আছড়ে আছড়ে পড়ছে খুঁটির গায়ে। দেখতে দেখতে বালজাকের চোখের আলো মলিন হয়ে এল। তিনি চোখের সামনে বিন্দু বিন্দু অন্ধকার দেখতে থাকলেন। এক একটা চাবুক পড়ে আর বালজাকের বুকটা প্রচণ্ড বেগে দুমড়ে মুচড়ে ওঠে। বুকের কপাটে শরীরের সমস্ত রক্ত একবারে এসে দারুণ জোরে আছড়ে পড়ে। বুকটা ভেঙে যেতে চায়। বুঝি ভেঙে গেল, এখনই বুঝি ভেঙে যাবে। দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে অন্ধকার করে সমস্ত দৃশ্য যেন গাঢ় কুয়াসায় হারিয়ে যাচ্ছে। মনে পড়ছে কৈশোরের সেই স্কুল জীবনের কথা। সেই প্রচণ্ড বেত্রাঘাতের স্মৃতি—টেবিলের পায়ার সঙ্গে হাত বাঁধা, তাঁর আদুল পাছার ওপরে প্রাণপণে বেত মেরে চলেছেন মাস্টার মশাই। সে বেতের সাঁই সাঁই শব্দও যেন তিনি স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছেন। সেদিনের সেই নিষ্ঠুর বেত্রাঘাতেও তাঁর চোখ দিয়ে এক ফোঁটা জল পড়েনি। কাঁদতে সেই কৈশোরেই তাঁর পৌরুষে বেধেছে। কিন্তু আজ চল্লিশ বছর পেরিয়ে এসে সেই বেত্রাঘাতের নির্মম দৃশ্যের সামনে তিনি আর তাঁর চোখের জল রুখতে পারলেন না। চীৎকার করে উঠলেন, "না, না, না," জেসাস ক্রাইসটের নামে, কুমারী মেরীর নামে, না, না, না!

চীৎকার করে উঠে বালজাক মূর্ছিত হয়ে পড়ে গেলেন।

তাড়াতাড়ি বালজাকের মাথাটা কোলের মধ্যে টেনে নিলেন ইভা, স্মেলিং সলটের শিশি বের করে তাঁর নাকের কাছে ধরলেন। অ্যামোনিয়ার তীব্র ঝাঁজ নাকে যেতেই জ্ঞান ফিরে এল বালজাকের। তিনি মাথা ঝাঁকুনি দিয়ে উঠে বসলেন। কুয়াসা কাটতে থাকল তাঁর চোখের সামনে থেকে। আস্তে আস্তে চোখে স্বাভাবিক দৃষ্টি ফিরে এল।

ইভা তাঁকে দেখতে দেখতে হাসলেন। কিছু বললেন না।

ততক্ষণে মৃত মানুষটার দেহ মাটিতে শুইয়ে দেওয়া হয়েছে। পুরোহিত তার সামনে বসে শেষ-কৃত্য করছে। একটি দুটি করে নীরব জনতা ছত্রভঙ্গ হয়ে যে যার খেতে মজুর খাটতে চলে যাচ্ছে।

বালজাক আর ইভা ফিরে এসেছেন প্রাসাদে। এবার খেতে বসে ইভা শুধোলেন, "আমার নিষ্ঠুরতা দেখে তুমি মূর্ছা গেছ। কিন্তু বলতে পার, এমন কঠিন না হয়ে কী করে এতবড় জমিদারি শৃংখলার সঙ্গে চালানো যায়?"

বালজাক কোন জবাব দিলেন না। তিনি খাচ্ছিলেনও না। মাংসের ঝোলে চামচ নাড়ছিলেন কেবল। সকাল বেলার নির্মম দৃশ্য তাঁর দুপুর বেলার সব ক্ষুধা নষ্ট করে দিয়েছে।

ইভা বলে যাচ্ছেন, বলতে বলতে তাঁর স্বর গর্বে সোচ্চার হয়ে উঠেছে, "আমাদের পূর্বপুরুষ আমার ঠাকুর্দা তাঁর বাবা ফ্রান্সের আয়তনের সমান বিরাট জমিদারি শাসন সংরক্ষণ করে গেছেন ; পেরেছেন শুধু এই কঠিন শাসনের জোরেই। আমার স্বামীর জমিদারিতেও পঞ্চাশ হাজার ভূমিদাস। তুমি কী আশা কর জর্জ সেই গাড়োলগুলিকে চাবুকের বদলে চকোলেট বিলিয়ে শায়েস্তা রাখতে পারবে ?"

বালজাক তবু কোন উত্তর দিলেন না। সামন্ততান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় একদল হৃতসর্বস্ব মানুষের ভাগ্য এমনই মর্মান্তিক হবে! এ ব্যবস্থা যতদিন থাকবে তার নড়চড় হবার জো নেই। এ সামাজিক সত্য নিষ্ঠুর, তবু যতদিন না বিপ্লব এসে সব ভেঙেচুরে দিচ্ছে, তাকে মেনে নিতেই হবে। অথচ তাঁর বুকটা প্রতিবাদে কেবলই মুচড়ে মুচড়ে উঠছিল। তিনি জানেন, উঠবেই। তিনি নিরুপায়। তাই নিরুত্তর রইলেন।

নিরুপায় নিরুত্তর কথা-শিল্পীর সেই অবরুদ্ধ প্রতিবাদের কান্না আর প্রবল ঘৃণার ধিক্কার অমর হয়ে আছে তাঁর লে পেইজাঁ (গ্রামীণ) উপন্যাসে।

কিন্তু সেদিন সেই য়ুক্রেনে বসে ইভার চরিত্রের মন্দ ভালর সমস্ত দিকগুলিকে স্পষ্ট দেখতে পেয়ে তাঁর প্রতি মন বিরূপ হওয়া দূরে থাক ওই কঠিন নিস্পৃহ হৃদয়টাকে জয় করবার এতকালের দুর্নিবার বাসনা যেন আরও প্রবল আরও দুর্বিনীত হয়ে উঠল।

ইভার চলনে বলনে ব্যবহারে সম্রাজ্ঞীর কুহক। সেই কুহকের কুক্ষিতলে বালজাকের প্রেমের আসন। ইভা তাঁকে স্বামীর সম্মান দিয়ে গ্রহণ করেছেন। বালজাক সেই পরম আত্মশ্লাঘার সমুদ্রে যেন অবগাহন করছিলেন।

ইভার শোবার ঘর সব সময় একটা মদির সৌরভে ম-ম করত। এমন আকুল-করা গন্ধ-রস তিনি য়ুরোপ বেড়ানোর কালে কখনো ব্যবহার করেছেন বলে মনে পড়ছে না বালজাকের। এ মদির সৌরভ যেন এই প্রাসাদের জন্যেই সংরক্ষিত, সম্রাজ্ঞীর স্বরূপে থাকার সময়ই শুধু ব্যবহার করার জন্যে যেন বিশেষভাবে নির্বাচিত। এই মদির সুরভি নাকে এলেই একটা তীব্র সুখস্পৃহা দুলে ওঠে রক্তে। একটা অসংযত ক্ষুধার আগুনে যেন ইন্ধন যোগায় সব সময়।

পাওনাদারের পেয়াদা নেই, পাবলিশারের চোখ রাঙানি নেই ; অর্থের ধাক্কায় পেটে ক্ষুধা নিয়ে পথ-কুকুরের মতন ছুটাছুটি করতে হচ্ছে না। নিরবচ্ছিন্ন নিরুদ্বেগ অবসর। রাজকীয় পরিবেশে আহার বিশ্রাম সর্বোপরি এক নূতন দেশের ভিন্ন দৃশ্যের রোমাঞ্চকরতা। এখানেই ত মহৎ রচনার প্রেরণা আসার কথা। কলম চলার কথা আরও দ্রুত গতিতে। পারীতে নানা ঝঞ্ঝাটের মধ্যে যদি দিনে বারো ঘণ্টা পনর ঘণ্টা লিখতে পেরে থাকেন, এখানে বিশ ঘণ্টাই বা লিখতে পারবেন না কেন বালজাকের মতন শক্তিধর কথাশিল্পী? কিন্তু আশ্চর্য, তাঁর কলম চলে না। আসলে বুঝি প্রতিভার দস্তুরই এই, চোখের সামনে প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী আর মনের ওপরে তাগিদের প্রচণ্ড চাপ চাই, নইলে কল্পনা ঝিমিয়ে পড়ে, ঘুমিয়ে নিতে চায় শরীর, রেসের ঘোড়ার মতন বাজি জিততে প্রাণপণ করতে চায় না। বাজি জিতবে যার সঙ্গে দৌড়ে, আর একজন তেমন কেউ যে কাছে পিঠে নেই। যে আছে সে ইন্ধন যোগায় অন্য উত্তেজনার অন্য তৃষ্ণার। ইভা মাঝে মাঝে মধ্য রাত্রির বিছানায় খিল খিল করে হেসে ওঠেন, বলেন, তুমি লেখার টেবিলে এক মহান শিল্পী, বিছানায় একটা বন্য পুরুষ।

এই সুখের দিনগুলি আরও দীর্ঘায়ত করতে চেয়েছিলেন বালজাক। বসন্তকাল আসবে, বরফ গলবে, পথঘাট পরিচ্ছন্ন হবে, শীত যাবে তখন তিনি ফিরবেন পারীতে।

কিন্তু তিন মাসের মাথায় জানুআরি মাসেই সমন এল পারী থেকে, যখন য়ুক্রেনে চরম ঠাণ্ডা প্রচণ্ড বরফ পড়ছে—পথঘাট নিশ্চিহ্ন করে দিয়ে বনভূমি খেত-খামার আচ্ছন্ন আবৃত করে আদিগন্ত এক সাদা তুষারের চাদর পাতা হয়েছে। বন্ধ জানালার শারশি দিয়ে দেখতে বিদেশীর চোখে তা নিঃসন্দেহে চমৎকার ; কিন্তু অগ্নোত্তাপ-উষ্ণ ঘরের দরজা খুলে সেই তুষারের মধ্যে বেরিয়ে আসা প্রাণান্তিক। নিরুপায় মানুষের মতন বিষণ্ণ মুখ করে চিঠিটা এগিয়ে দিলেন বালজাক।

চিঠিটা লিখেছে ব্যাঙ্কার বারোঁ গু রতচাইল্ড : ফ্রান্সের অর্থের বাজারে দারুণ মন্দা। নর্দার্ন রেলের শেয়ারের দর ভীষণ নেমে গেছে। দেউলিয়া হতে যদি না চাও এক্ষুনি কিছু টাকার জোগান দাও। নর্দার্ন রেলের শেয়ারের টাকাটা মূলত ইভার। ফলত বালজাককে টাকার জন্যে এবার তাঁর কাছেই হাত পাততে হল।

রতচাইল্ডের নাম শুনেই ক্ষেপে উঠলেন ইভা, "ওই কঞ্জুস ডাকাত ইহুদীটার খপ্পরে পড়েছ তুমি? তুমি একটা আহাম্মুক। তুমি চেননা কিন্তু পোল্যাণ্ডের মানুষ প্রত্যেকে ইহুদীদের হাড়ে হাড়ে চেনে। একবার যে এই ইহুদীদের হাতে পড়েছে তার আর রক্ষে নেই।"

কিন্তু রাগ করে আর উপায় নেই তখন, ক্ষোভেরও অবকাশ নেই। পঞ্চাশ হাজার ফ্রাঁর একটা ড্রাফট কেটে বালজাকের হাতে দিলেন ইভা। সমকালের এক অপ্রতিদ্বন্দ্বী কথাশিল্পীর এই ভিখিরীর দশা ইভার অর্থের অহংকারকে বড় তৃপ্তি দিল। মহৎকে এক জায়গায় তুচ্ছ করতে পেরে বুঝি হীনম্মন্যতার জ্বালা কিঞ্চিৎ জুড়োতে পারলেন তিনি।

কী ঠাণ্ডা কী ঠাণ্ডা, এমন দিনে একটা শেয়ালও রাস্তায় বেরোয় না। শূন্য থেকে কুড়ি ডিগ্রী নিচে নেমে গেছে তাপমান যন্ত্রের পারদ। তবু বালজাককে ভের্ঝকোভানিয়ার উষ্ণ প্রাসাদের সুখ-আশ্রয় থেকে নেমে আসতে হল পথের তুষারে। পায়ের তলায় কাঠ কয়লার উনুন, গায়ে সাইবেরিয়ান্ ওভারকোট, স্লেজের এক কোণে জড়সড় হয়ে বসেছেন বালজাক। মোটা মাফলারের ভেতর দিয়ে নিঃশ্বাস টানতেও যেন বুকের রক্ত হিম হয়ে আসে। রাস্তা না, যেন তুষার স্তূপের মাঝখানে সরু জমাট জলের নালা। মধ্যে মধ্যে ছোট বড় নানান গর্ত। এমন রাস্তায় স্লেজ চেপে একমাত্র যমের বাড়ি ছাড়া আর কোথাও পৌছান যায় কিনা সন্দেহ। তবু বালজাক ফিরে এলেন না ইভার কাছে, তাঁর লোভের কাছে, তাঁর তৃষ্ণার কাছে। য়ুরোপের একপ্রান্ত থেকে আর এক প্রান্তে য়ুক্রেন থেকে পারীর পথে স্লেজের কোণে দাঁতে দাঁত চেপে শক্ত হয়ে বসে থাকলেন।

যে দু'জন ক্রীতদাস সেই মরণ-শীতের মধ্যে স্লেজ চালিয়ে চলছিল তারা মুহুর্মুহু ভোডকা খাচ্ছিল আর পোলিশ ভাষায় পাগলের মতন গলা ছেড়ে পল্লীগীতি গাইছিল। তাদের দাড়িতে বরফ জমে জমে দাড়ি শক্ত পাথর হয়ে উঠেছিল কিন্তু মনেই হচ্ছিল না তারা এতটুকু অসুখী; বরং মদ খেয়ে মাতাল হতে পেরে যেন তাদের ফুর্তির অবধি ছিল না।

অথচ বালজাক ভুগছিলেন অপরিসীম কষ্টে। তাঁকে ভের্ঝকোভানিয়া থেকে ক্রাকাউ অবধি স্লেজে চড়ে আসতে হবে তবে তিনি রেলে চড়বার সুযোগ পাবেন। কিন্তু স্লেজের এই পথটা এমনই দুঃসাধ্যের যাত্রা যে য়ুক্রেনের শীতে সারা জীবন বাইরের কাজে অভ্যস্ত কোন জাঁদরেল জোয়ান পরম কষ্টসহিষ্ণু চাষার ছেলেও প্রাণের দায়ে না ঠেকলে এই পথে বেরোতে চাইবে না। সেই পথে বালজাক যাচ্ছেন যাঁর গায়ে য়ুক্রেনের শীত কোনদিন হাত রাখেনি, যিনি জীবনে অনেক যন্ত্রণা পেলেও এমন নিদারুণ শীতে কখনো ভোগেন নি। বস্তুত তিনি জীবন বিপন্ন করেই যাত্রা করেছেন এবং সে মর্মান্তিক সত্য উপলব্ধি করতে তাঁর একটা দিনের বেশী লাগল না। তিন দিনের পথের একটা দিন পার করেই তিনি

টের পেলেন, এমন তুষার বর্ষণের মধ্যে তাঁর রাস্তায় বেরোনো উচিত হয় নি। কিন্তু একগুঁয়ে মানুষটি একবার যা স্থির করেন জীবন থাকতে তার বড় নড়চড় হতে দেন না। কিংবা তিনি মনে মনে যেন বিশ্বাস করতেন, এখনও তাঁর আয়ু শেষ হয় নি। তিনি আরও অনেক দিন বাঁচবেন। আসলে হয়ত ফ্রান্সের অর্থের বাজারের সংকটই শুধু তাঁকে ভাবিত করেনি, তাঁকে ভাবিত করে তুলেছিল প্রকাশকের কাছ থেকে অগ্রিম টাকা এনে তিন মাসে একটা লাইনও না লেখার পরিণামটাও। ড্রয়ারের মধ্যে গুঁজে-রেখে আসা অসমাপ্ত লেখাগুলিও সমাপ্ত হওয়ার জন্যে তাঁকে কম তাড়া করছিল না। তাই এমন সুখের নীড়ও তাঁকে ধরে রাখতে পারল না, এমন প্রচণ্ড তুষারপাতও তাঁর পথের প্রতিবন্ধক হয়ে উঠল না। তাঁর স্লেজ আপন বেগে সামনে এগিয়ে চলল।

ইভা তাঁকে বড় বড় দু'বোতল উৎকৃষ্ট ভোডকা দিয়েছিলেন। আখের রসের গন্ধ-সরস সেই তীব্র সুরাসার মাঝে মাঝে ওষুধের মাত্রায় খাচ্ছিলেন বালজাক। আর তাতেই তাঁর ঠোঁট পুড়ছিল, গলা জ্বলছিল। নিঃশ্বাস যেন বন্ধ হয়ে আসছিল তাঁর, প্রাণ ওষ্ঠাগত হচ্ছিল। তবু সেই সুরাসারই বস্তুত ওই নিদারুণ শীতেও তাঁকে বাঁচিয়ে রেখেছে। তাঁর শরীরের রক্ত শিরায়, ধমনীতে, হৃদপিণ্ডের মধ্যে জমাট বাঁধতে দেয় নি। এই সুরাসার আর অপরিসীম মনোবল সম্বল করে বালজাক দুরন্ত দুর্গম তুষার পথ পার হয়ে এলেন। তখন তাঁর গায়ে রীতিমত জ্বর।

ক্লান্ত অবসন্ন জ্বর-বিধ্বস্ত শরীর নিয়ে ফেবরুআরির মাঝামাঝি বালজাক এসে নামলেন রু ফরতুনে-তে। ইভার জন্যে সঞ্চিত সম্পদের পাহারায় এখানে এই পাভিলিওঁ ব্যুজোঁ-তে বালজাক রেখে গিয়েছিলেন তাঁর মাকে।

দরজার সামনে মাকে দেখে নিশ্চিন্ত হলেন বালজাক। গাড়ি থেকে নামলেন। তখনই দূরে শুনতে পেলেন রাইফেলের কর্কশ আওয়াজ। চমকে উঠলেন তিনি।

"ও কিসের শব্দ মা?"

"কৃষক মজুর বেকার গরিব এক জোট হয়ে রুখে উঠেছে। হাজার হাজার মানুষ পারীর রাস্তায় রাস্তায় জিগির তুলছে। তারা রাজা লুই ফিলিপের নিপাত চায়। রাজার সৈন্য নির্বিচারে গুলি চালাচ্ছে।" মা মুখ শুকনো করে জবাব দিলেন।

বিপ্লব। বালজাক বুঝতে পারলেন।

তাঁর মনে সন্দেহ রইল না, য়ুক্রেনের তুষার পেরিয়ে এসে পারীর আগুনে পা রেখেছেন তিনি।

পনর

১৮৪৮-এর সেই ঐতিহাসিক বিপ্লবে পারী শহর তখন টালমাটাল। রাজতন্ত্রের ভিত নড়ে উঠেছে, যে কোন সময় ধসে পড়বে। তেরঙা নিশান উড়িয়ে ক্ষুব্ধ জনতা সাধারণতন্ত্রের নিষিদ্ধ গান 'লা মারসেইয়েজ' গাইতে গাইতে রাজপথ প্লাবিত করে চলেছে। বিপ্লব সফল হোক—জিগির মানুষের মুখে মুখে। ত্যুলরি-র রাজপ্রসাদ প্লাস দ্য লা কঁকোর্দ-এর সামনে থেকে জনতার চাপ ছত্রভঙ্গ করতে রাজার সৈন্য মুহুর্মুহু গুলি চালাচ্ছে। রাজপথের নালা বেয়ে গড়িয়ে যাচ্ছে রক্তস্রোত। শহীদের রক্তে স্নান করে ফরাসী বিপ্লব ক্রমাগত ভয়ংকর হয়ে উঠছে। সে বিপ্লব নির্মম হাতে দমন করতে রাজা দেশের সমস্ত সৈন্যবাহিনীকে রাজধানীতে তলব করেছেন। ত্যুলরি-র বাগান থেকে ক্ষণে ক্ষণে কামান গর্জে উঠছে। তার ধ্বনি শুধু পারী না, শুধু ফ্রান্স না, বুঝি ছড়িয়ে পড়েছে সমগ্র য়ুরোপে। বুঝি পৌঁছে গেছে এমন কি সুদূর সেন্ট পেতেরসবুর্গেও—মস্কোআয়, কিয়েভ-এ সর্বত্র সাধারণ মানুষ সচকিত হয়ে উঠেছে; বঞ্চনা-দগ্ধ অত্যাচার-পীড়িত ভূমিদাসদের বুকের মধ্যেও বুঝি সে-গর্জন প্রতিধ্বনি তুলেছে।

ভ্রমণ-ক্লান্ত অবসন্ন বালজাকও অসুখ-শয্যায় শুয়ে শুয়ে শুনছেন বন্দুকের আওয়াজ কামানের শব্দ। আর অস্থির মন উদ্বিগ্ন হয়ে ছটফট করছে কেবল। তাঁর বড় সন্দেহ, এ বিপ্লব জাতির কোন মুশকিল আসান করবে না। এ বিপ্লবের কোন ভবিষ্যৎ নেই। ফ্রান্সের মাটিতে এর আগেও আরো বিপ্লব ঘটে গেছে, কী ফল দিয়েছে সে বিপ্লব, প্রজার ভাগ্য কী এতটুকু প্রসন্ন হয়েছে? আজকের বিপ্লব সম্পর্কেও তাই বালজাক বড় নিরাশ। তবু বিছানায় পড়ে থাকতে পারলেন না বালজাক। বিপ্লবের সামিল হতে নয়, বিপ্লবের একজন প্রত্যক্ষদর্শী হতে জর-জর্জর শরীর নিয়েই বেরিয়ে পড়লেন তিনি।

সেদিন ২৩ ফেব্রুআরি। তখনও পালান নি রাজা লুই ফিলিপ। তখনও তাঁর আশা, শেষ পর্যন্ত একটা নিয়ম-সম্মত সরকার গঠন করে রাজতন্ত্রের মুখ রক্ষা করতে পারবেন তিনি, সিংহাসন আঁকড়ে থাকতে পারবেন। ত্যুলরি-র প্রাসাদে তাই নিয়ে বশংবদ পারিষদদের সঙ্গে জোর শলাপরামর্শ চলছে। এদিকে রাজপ্রাসাদের বাইরে, পারীর রাস্তায় রাস্তায় গলিঘুঁজিতে উঁচু হয়ে উঠেছে বিপ্লবের ঝাণ্ডা। মজুর চাষা বেকার গরিব—সাধারণ মানুষের চ্যালেঞ্জ দুর্নিবার হয়ে উঠেছে। গুলি

চালাচ্ছে রাজার সৈন্য, মাঝে মাঝে দূরে কামান গর্জে উঠছে। তারই মধ্যে দিয়ে হেঁটে চলেছেন বালজাক।

গায়ে ইভার দেওয়া সেই ভারী সাইবেরিয়ান ওভারকোট, হাতে তাঁর সেই বিখ্যাত ছড়ি। বালজাক রাজপ্রাসাদের অনতিদূরে আসতেই এক বিরাট জনতা যেন গ্রাস করে ফেলল তাঁকে। তারই মধ্যে দিয়ে তিনি পথ করে করে হাঁটছিলেন। অভিজাত পোশাক পরিহিত মানুষটিকে দেখে কিছু কিছু লোক টিট্‌কিরি দিতে ছাড়ল না। অবশ্য কেউ গায়ে হাত দিল না। তাদের 'গ্রেট রাইটার' বালজাককে অনেকেই চিনেছিল। তাঁর পথ ছেড়ে দিচ্ছিল তারা।

কিন্তু গোলমাল আর ভীড়ের মধ্যে হঠাৎ কে একজন এসে তাঁর হাত চেপে ধরল—

"সাধারণতন্ত্রের নাগরিক বালজাক না?"

বালজাক দাঁড়িয়ে পড়লেন, শক্ত হাতে ছড়িটাকে ধরে দৃঢ়স্বরে বললেন, "না, আমি মঁসিয়ে দ্য বালজাক রাজতন্ত্রের একজন বশংবদ প্রজা। সরে দাঁড়াও, আমাকে যেতে দাও।"

ছেড়ে দিল না বরং লোকটি তাঁর হাত আরও জোরে চেপে ধরল, "না, একজন সৎ লেখককে দেখতে সত্যি সত্যি কেমন না দেখিয়ে ছাড়ব না আপনাকে।"

সে গায়ের জোরে বালজাকের শরীরটাকে ঘুরিয়ে দিল রাস্তার আর এক কোণের দিকে। আঙুল বাড়িয়ে বললে, "দেখুন, সাধারণতন্ত্রের নাগরিক লামার্তিনকে দেখুন। তিনি শুধু লেখন নন, সৎ এবং শক্তিমান লেখক। অথচ তিনি জনতার সপক্ষে দাঁড়াতে এতটুকু লজ্জা বোধ করেন না।"

বালজাক অবাক হয়ে দেখলেন, সত্যি লামার্তিন। তাঁকে ঘিরে উত্তেজনা-অস্থির মস্ত এক জনতা উৎকর্ণ হয়ে আছে। একটা উঁচু প্যাকিং বাক্সের মঞ্চের উপর দাঁড়িয়ে তিনি বক্তৃতা দিচ্ছেন। তাঁর পাশে তেরঙা এক নিশান উড়ছে। নিশানটা উঁচু করে ধরে দাঁড়িয়ে আছে এক কিশোর।

বালজাক লোকটির হাত থেকে নিজেকে ছিনিয়ে নিয়ে মঞ্চের দিকে ছুটে এলেন।

—"আলফোঁস", চিৎকার করে ডাকলেন বালজাক, "আলফোঁস লামার্তিন!"

মুহূর্তের জন্যে বক্তৃতা বন্ধ করে লামার্তিন তাকালেন বালজাকের দিকে। মৃদু হেসে বললেন, "বালজাক? দাঁড়াও আসছি।" বলে আবার বক্তৃতা শুরু করলেন।

লামার্তিন শুধু বিখ্যাত কবি কথাশিল্পী ও ঐতিহাসিক নন, একজন সক্রিয় রাজনীতিকও বটেন। বালজাকের বন্ধু। তাঁর থেকে বছর নয় বড়। এই সাধারণতন্ত্রী মানুষটি অনেকদিন থেকেই রাজতন্ত্রের নিপাত চেয়ে আসছেন। আজ তাঁর স্বপ্ন সফল হতে চলেছে। তিনি তারস্বরে জনতার সামনে তাদের ত্যাগ সংগ্রাম ও ঐক্যের জয় ঘোষণা করছেন। উদ্দীপ্ত সেই বাণীতে ক্ষণে ক্ষণে জনতা উদ্বেলিত হয়ে উঠছে। তাঁর বক্তৃতা শেষ হলে টুপি তুলে জনতা উল্লাসে জয়ধ্বনি করে উঠল। তিনি মঞ্চ থেকে নেমে এলেন।

বালজাক মনে মনে জানলেন, লামার্তিন আজ জনতার দেবতা হয়ে উঠেছে।

লামার্তিন এসে বালজাকের হাত ধরলেন। ততক্ষণে এক তরুণ শ্রমিক লামার্তিনের জায়গায় উঠে দাঁড়িয়ে বক্তৃতা শুরু করেছে।

"চল একটা কাফেতে গিয়ে বসি। বক্তৃতা করে করে আমার গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে।"

তাঁর সঙ্গে হাঁটতে হাঁটতে বালজাক বললেন, "তোমার ঐ শুকনো গলাটা একদিন কাটা না পড়লে বাঁচি। তুমি ঐ ইতর মানুষগুলোকে ক্ষ্যাপাচ্ছিলে কেন?"

লামার্তিন শান্ত গলায় বললেন, "তুমি যাদের ইতর বলছ, ভুলে যেয়ো না তারা ফ্রান্সের জনসাধারণ।"

বালজাক বিরক্ত হয়ে বললেন, "জনসাধারণের কর্তব্য কথা শোনা, তাদের যা করতে বলা হবে তাই করা।"

"নির্দেশ অন্যায় হলে সহ্য করবে কেন তারা? প্রতিবাদ অবশ্যি করবে। আজকের বিপ্লব সেই প্রতিবাদ। এই প্রতিবাদের স্বর কেউ স্তব্ধ করতে পারবে না। তুমি জিজ্ঞেস করেছ, আমি কেন ওদের উত্তেজিত করছি। না, আমি ওদের উত্তেজিত করছি না। আজ ওরা নেতৃত্ব চায়। আমি সেই নেতৃত্ব দিচ্ছি ওদের।"

তাঁরা এসে একটা কাফেতে ঢুকলেন।

বালজাক একটা চেয়ার টেনে বসতে বসতে শুধোলেন, "রাজতন্ত্র যদি যায় তার জায়গায় কোন্ তন্ত্র আসবে?"

"সাধারণতন্ত্র", লামার্তিন জবাব দিতে এতটুকু দ্বিধা করলেন না, "কয়েক সপ্তাহের মধ্যে ফ্রান্সে সাধারণতন্ত্র-সরকার দেখতে পাবে তুমি।"

"আবার আর একটা! না, আর দেখতে চাইনে।" বালজাকের উষ্মা চাপা রইল না।

কিন্তু বিরক্ত হলেন না লামার্তিন। সুন্দর শীর্ণ মানুষটি টেবিলের ওপরে

কনুই রেখে বালজাকের দিকে ঝুঁকে বসলেন। তাঁর এলোমেলো পাকা চুল কপালে জুলপির কাছে উড়তে থাকল।

বালজাককে স্বমতে আনার চেষ্টায় লামার্তিন নরম গলায় বললেন, "তুমি অ্যাদ্দিন ভুল ঘোড়ায় বাজি ধরে এসেছ বালজাক, কিন্তু তুমি ভুলে যেয়ো না, বুরবোঁ রাজবংশ খতম হয়ে গেছে, অরলেআঁস-এর ডিউকদেরও সেই অবস্থা। লুই ফিলিপ একটা গোমূর্খ। কারো পরামর্শই সে শুনতে চায় না। সে নিজেকে ষোড়শ লুইয়ের সমান ভেবে বসে আছে। তার যদি ষোড়শ লুইয়ের অবস্থা না ঘটে ত পরম ভাগ্য।"

"কিন্তু বিপ্লব থেকে আমরা কী পাব?" কফির কাপে চুমুক দিয়ে বালজাক জিজ্ঞেস করলেন, "আগেও ত ফ্রান্সে অনেক বিপ্লব হয়ে গেছে। কী পেয়েছি আমরা?" বালজাক তার হতাশা গোপন রাখলেন না।

লামার্তিন কফি খেতে খেতে বালজাককে দেখছিলেন, কী ভাবছিলেন, বললেন, "সবাই বলে এই উনবিংশ শতকে আমরা নাকি একটা নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্রের অধীনে উন্নত নাগরিক অধিকার ভোগ করছি। কিন্তু তুমি কী বুঝছ না নিয়মতান্ত্রিক সরকারের নামে এটা একটা বিদ্রূপ, একটা ধাপ্পাবাজি। তুমিই বল বালজাক, ফ্রান্সের ৩৫ লক্ষ অধিবাসী আমরা, আমাদের ক'জনের ভোটের অধিকার আছে?"

বালজাক জবাব না দিয়ে কফির কাপ ঠোঁটে তুললেন।

লামার্তিন নিজেই নিজের প্রশ্নের জবাব দিলেন, "মেরে কেটে লাখ দুই মানুষ ভোট দেওয়ার অধিকার ভোগ করে আর তাদের লাখখানেকই সরকারের আমলা কর্মচারী তাঁবেদার তলপিবাহক। রাজা নিজেই তাঁর পারিষদ মনোনীত করেন আর তাঁর শাসক-প্রতিনিধিরাও বস্তুত তাঁরই নির্বাচিত। তাছাড়া, পরিষদে কোন নিয়মানুগ বিরোধী দলেরও অস্তিত্ব নেই, যেমন আছে ইংলণ্ডে। অতএব তুমি দেখতেই পাচ্ছ ওখানে সাধারণ মানুষের কথা বলার এক্তিয়ার বাজেয়াপ্ত। তাদের জন্যে রাস্তা—ওই যেখানে দাঁড়িয়ে তারা এখন গলা ফাটিয়ে তাদের কথা শোনাচ্ছে।"

"কিন্তু ওদের কথা আমার অসহ্য লাগছে।"

"সহ্য করতে শেখ বালজাক। মনে রেখো, ওদের কথাই ভবিষ্যৎ-ফ্রান্সের কথা।"

লামার্তিনের কথা শেষ হতে না হতে একটা গুলি জানালার শারশি চুরমার করে ওঁদের মাথার ওপর দিয়ে বেরিয়ে গেল। দুই কথাশিল্পী টেবিলের

তলায় বসে পড়লেন। কয়েক মিনিট বসে থাকলেন। শেষে আর গুলি গোলমালের আওয়াজ না পেয়ে উঠে দাঁড়ালেন। তাঁদের সর্বাঙ্গে কাঁচের টুকরো। কাঁচের টুকরোয় লামার্তিনের গালের খানিকটাও কেটে গেছে। রক্ত ঝরছিল।

রুমাল দিয়ে রক্ত চাপা দিয়ে তিনি বললেন, "রাজার শেষ সম্বল মিয়ুনিসিপাল গার্ডরা শেষবারের মতন দু চারটে গুলি চালিয়ে নিচ্ছে। সেনাবাহিনীর সৈন্য এখন আর রাজার তাঁবে নেই। তারা এখন জনতার দলে যোগ দিয়েছে।"

কথাটা মিথ্যে বলেন নি লামার্তিন; বালজাক বাইরে তাকিয়ে মিয়ুনিসিপাল গার্ডদের পোশাক দেখে চিনতে পারলেন।

তখন আর গুলি চালাচ্ছিল না তারা। বালজাকের ভাষায় 'ইতর মানুষ' যারা তখন রাস্তার এখানে-ওখানে জটলা আর হল্লা করছিল, রাইফেলের কুঁদা উঁচিয়ে তাড়া করছিল তাদের। যাকে সামনে পাচ্ছিল মারছিল। জনতা তাড়া খেয়ে গলিঘুঁজিতে ঢুকে পড়ছিল।

লামার্তিন আর বালজাক বেরিয়ে এলেন কাফে থেকে। বালজাক বললেন, "রাশিয়া জানে এই মুর্খ জনতাকে কেমন করে শায়েস্তা করতে হয়।"

"এটা রাশিয়া না, এটা ফ্রান্স," বললেন লামার্তিন, "দোহাই তোমার বালজাক, তুমি আগামী দিনের ফ্রান্সের দলে এস। আগামী দিনের ফ্রান্স একটা পরিবর্তন চাইছে।"

"না। আমি অতীতকেই পছন্দ করি।"

"অথচ তুমি তোমার উপন্যাসগুলিতে অন্য কথা বলেছ। তুমি তোমার নিজের প্রতিই বিশ্বাসঘাতকতা করছ বালজাক। মনে করে দেখো, তোমার চরিত্ররা এই অকর্মণ্য ভোগী ও অত্যাচারী রাজতন্ত্রের নিপাত চেয়েছে। এখনও সময় আছে বালজাক, তুমি চিন্তা করে দেখো।" বলে লামার্তিন বিদায় নিলেন।

আর বালজাক একা পারীর পথে নেমে এলেন। এলোমেলো হাঁটতে থাকলেন তিনি। চতুর্দিকে জনতার ভীড় বটে তবে উচ্ছৃংখল নয়। জনতার মধ্যে মারমুখি ভাবটা থিতিয়ে এসেছে যেন। কিন্তু দুটো রাস্তা পার হয়ে এসে তিনি অন্য দৃশ্য দেখতে পেলেন। এক বিশাল জনতা এগিয়ে আসছে। তাদের মুখে শ্লোগান, "মুখ্যমন্ত্রী গুইজোর মুণ্ড চাই।" "রাজতন্ত্র নিপাত যাক।" "লুই ফিলিপ গদি ছাড়।" "সাধারণতন্ত্র জিন্দাবাদ।"

পাশেই মিয়ুনিসিপাল গার্ড-এর ঘোড়-সওয়ার সৈন্য পাহারায় মোতায়েন। জনতা তাদের ওপরে হামলা না করলে, সরকারী সম্পত্তি নষ্ট করতে না

চাইলে, তারা হাতিয়ার তুলবে না এমনই একটা মেজাজ মতলব নিয়ে অপেক্ষা করছে তারা। কিন্তু দৈব বিরূপ। জনতা সামনে এসে পড়লে তাদের আকাশফাটা চিৎকার আর হৈ-হল্লায় হঠাৎ একটা ঘোড়া বেসামাল হয়ে উঠল। দুই পা শূন্যে তুলে লাফিয়ে উঠল ঘোড়া। মিছিলের সামনে ছিল একটি যুবতী। ঘোড়ার শরীরের ধাক্কায় সে মাটিতে পড়ে গেল। আর সেই মুহূর্তে ঘোড়ার উত্তোলিত পা'ও নেমে এল মাটিতে। এল ঠিক যুবতীর ওপরে। ঘোড়া যেন আরও ভয় পেয়ে গেল। ক্ষেপে উঠল। ক্ষিপ্ত ঘোড়া খুরে খুরে তাকে ক্ষত বিক্ষত করে ফেললে।

আর দেখতে দেখতে চেহারা পালটে গেল জনতার। সব মানুষগুলির মুখ নিমেষে একরকম হয়ে গেল—বন্য হিংস্র-জন্তুর মতন হল। তাদের দেখে মনে হল, তাদের মৃত্যুভয় নেই। যেন মৃত্যু কী তাই জানে না। হিংসায় উন্মত্ত সেই মানুষগুলি বেপরোয়া আক্রোশে ঝাঁপিয়ে পড়ল মিয়ুনিসিপাল গার্ডদের ওপরে। আত্মরক্ষা করতে ভীত সৈন্যরা তখন এলোপাতাড়ি গুলি চালাল কয়েক মুহূর্ত। আহত হলে হাতি যেমন দাঁড়ায়, জনতার মিছিল থমকে শক্ত অনড় হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। এক পলক। তারপর আবার ঝাঁপিয়ে পড়ল। আবার কয়েক ঝাঁক গুলি এসে বিদ্ধ করল জনতাকে। এবার জনতা পিছু হটল। কিন্তু পালাতে পারল না। স্তব্ধ স্থাণুর মতন দাঁড়িয়ে থাকল। তাদের সামনে শ' খানেকেরও বেশী মানুষ পড়ে আছে রাস্তায়। নিস্পন্দ মৃত। রক্তে লাল হয়ে গেছে রাস্তার মাটি। গড়িয়ে নালায় পড়ে লাল করে দিয়েছে নালার জল।

জ্বর-ক্লিষ্ট দুর্বল বালজাক সেই দৃশ্য দেখে অস্থির হয়ে পড়লেন। তাঁর মাথা ঘুরে গেল। তিনি বমি করে ফেললেন। রাস্তার রেলিংয়ের ওপরে তাঁর অবশ শরীর কাত হয়ে পড়ল। কিন্তু জ্ঞান হারান নি বালজাক, দেখছেন সারি সারি ঠেলাগাড়ি আসছে, একটা একটা করে ঠেলাগাড়ি আসছে আর জনতা মৃত মানুষগুলিকে বোঝাই করে নিচ্ছে তাতে। ঘোড়ার পায়ের তলায় পড়ে থেতলানো যুবতীকে কেউ ছুঁচ্ছে না। ঘোড়ার খুরে ছিন্নভিন্ন-পোশাক যুবতীর নগ্ন শরীরের দিকে তাকানো যাচ্ছিল না।

কে একজন চিৎকার করে বললে, "ওর শরীরটাকে ঢেকে দাও।"

কিন্তু কয়েকজন ভীষণ স্বরে প্রতিবাদ করে উঠল, "না না, সবাই দেখুক, রাজার কুত্তারা মানুষের ওপরে কী নির্মম অত্যাচার করে, দেখুক। ওর শরীর ঢেকে দেব না আমরা, ওকে সরাব না আমরা এখান থেকে।"

বালজাক কোনমতে নিজের শরীরটাকে সোজা করলেন, মাতালের মতন টলতে টলতে আবার হাঁটতে থাকলেন তিনি। তাঁর মনে হল, লামার্তিনের সঙ্গে অন্তত একটা বিষয়ে তিনি এক মত—রাজা সত্যি কাণ্ডজ্ঞান হারিয়ে বসে আছেন। তাঁকে রক্ষা করবার বুঝি আর কোন উপায় নেই। বিপ্লবী জনতা ঠেলায় করে নিহতদের নিয়ে মিছিল করে চলেছে। সে-দিকে তাকিয়ে তবু বিপ্লবীদের সমর্থন করার কোন যুক্তি তিনি খুঁজে পেলেন না। অবশ্য তিনি মনে মনে স্থির করলেন, যদি নতুন সরকার গঠিত হয় আর সে সরকারে তাঁকে সদস্য মনোনীত করতে চায় ফ্রান্সের মানুষ, তিনি রাজী হবেন। কিন্তু না, রাস্তার ধারে প্যাকিং বাকসের মঞ্চে উঠে তিনি লামার্তিনের পাশে দাঁড়িয়ে বিপ্লবের সপক্ষে বক্তৃতা দিচ্ছেন, এ দৃশ্য তিনি ভাবতে পারলেন না।

তিনি অস্থির শরীর নিয়ে বাড়ি ফিরে এলেন।

কিন্তু সারা রাতে এক ফোঁটা ঘুমোতে পারলেন না বালজাক। ফ্রান্সের ভাগ্য তাঁকে প্রবল ভাবে ভাবিত করে রাখল। ফ্রান্সের ভাগ্যের সঙ্গে তাঁর ভাগ্যও যে ওতপ্রোত জড়িত। এই উচ্ছৃংখলতার বন্যা যদি বইতে থাকে, অনিশ্চিত হয়ে ওঠে ফ্রান্সের ভবিষ্যৎ ত বইয়ের বাজার, মঞ্চ, শেয়ার মার্কেট নিশ্চিহ্ন হয়ে ভেসে যাবে। সঙ্গে সঙ্গে ভেসে যাবেন তিনি নিজেও; তখনই মনে হল, তা হলে তিনি আর পারীতে থাকবেন না। ফ্রান্স ছেড়েই চলে যাবেন। ফ্রান্সে থাকবেন তিনি আর কোন্ টানে? ইভার কাছে চলে যাবেন। ভের্ঝকোভানিয়ার স্মৃতি মনে আসতেই সুখে ভরে উঠল বালজাকের মন, নিমেষে অস্থিরতা দুর্ভাবনা থিতিয়ে এল। কিন্তু ঘুমোতে পারলেন না। অবশিষ্ট রাত জেগে জেগে কাটিয়ে ভোর হতে না হতেই বেরিয়ে পড়লেন আবার। ফ্রান্সের ভাগ্য যেন তাকে সাক্ষী হতে ডাকছে।

বিছানায় শুয়ে শুয়ে তিনি যখন আকাশ-পাতাল ভাবছিলেন ততক্ষণে রাজতন্ত্রের পতন ঘটে গেছে। ২৪ তারিখ ভোর বেলা পারীর রাজপথে পা দিয়ে তিনি জানলেন, রাজ্য রক্ষার সমস্ত আয়োজন, প্রতিরোধের সমস্ত ব্যবস্থা ধূলিসাৎ করে দিয়েছে ক্ষুব্ধ প্রজার বদ্ধপরিকর আক্রোশ। লুই ফিলিপ রাজ প্রাসাদ ছেড়ে পালিয়েছেন। বিজয়ী জনতার সাফল্যের উল্লাস ত্যুলরি-র পথ বেয়ে ঝাঁপিয়ে পড়তে ছুটেছে অরক্ষিত রাজপ্রাসাদের ওপরে।

কৌতূহলী বালজাক তাদের পায়ে পায়ে অনুসরণ করে এসে ঢুকলেন প্রাসাদে। দেখলেন মূঢ় অশিক্ষার অবিবেকী কাণ্ড। আরশি শারশি ঝাড়লণ্ঠন তাদের উন্মত্ত আঘাতে খান্‌খান্ হয়ে পড়ছে। যে যেখানে পাচ্ছে টেনে ফালিফালি করে দিচ্ছে

দরজা জানালার পর্দা, আসবাবপত্রের ওপরকার জরির ঢাকনা ঝালর। রানীর কক্ষে এসে ঢুকে পড়েছে একদল মজুর চাষী। তারা রানীর মূল্যবান আতর এসেন্সের বোতলগুলি তাদের নোংরা কোর্তা কামিজে গলগল করে ঢেলে দিচ্ছে। একটা যুবতী-গণিকা রানীর পালংকে চিৎ হয়ে শুয়ে চিৎকার করে বলছে, "যার খুশী যত খুশী ভোগ করে নাও, আজ ফ্রী, আজ পয়সা লাগবে না।" উন্মাদ জনতা কেউ সেদিকে ভ্রূক্ষেপ করছে, কেউ করছে না ; কক্ষ থেকে কক্ষে ছুটে ছুটে যাচ্ছে, টান মেরে ছত্রখান করে দিচ্ছে, আছড়ে তুমড়ে চুরমার করে দিচ্ছে সব। আগুন ধরিয়ে দিচ্ছে কাগজপত্রে, বইয়ের শেলফ-এ। ভেলভেট কার্পেট মোড়া সুন্দর সুসজ্জিত কক্ষগুলি নিমেষে নিমেষে ক্ষত বিক্ষত বিধ্বস্ত বিভীষিকা হয়ে উঠছে।

দেখে দেখে ঘৃণায় ক্রোধে উত্তেজিত হয়ে উঠলেন বালজাক, সরে দাঁড়ালেন। এ অবিবেকী উন্মত্ততা দেখা যায় না। বাধা দেওয়া আরও যায় না। বিবেকী মানুষকে এখান থেকে চলে যেতে হয়। চলে যাবার জন্যে পা বাড়িয়ে বালজাক কিন্তু আবার থমকে দাঁড়ালেন। আইন শৃংখলার পরম পৃষ্ঠপোষক বালজাক এক কাণ্ড করে বসলেন। স্মরণ-সঞ্চয়ের আজীবনের নেশা তাঁর আইনের প্রতি আনুগত্যবোধের টুটি চেপে ধরল—তিনি সিংহাসন-কক্ষ থেকে কিছু অলংকার ও জরির পর্দা হাতিয়ে নিলেন আর আনলেন রাজপুত্রদের পাঠ্য কিছু বই, খাতা। ফ্রান্সে যখন তিনি আর থাকবেন না, তখন এগুলি ফ্রান্সের স্মৃতি হয়ে তাঁকে সঙ্গ দেবে।

এই অরাজক ফ্রান্সে তিনি আর থাকছেন না যেন মনে মনে ঠিকই হয়ে গেছে তাঁর। তাই ফ্রান্সের ভাগ্য নিয়ে তিনি আর উদ্বেগ বোধ করছিলেন না। অতএব বেশ হালকা আর প্রসন্ন মনেই তিনি বেরিয়েছিলেন রাজপ্রাসাদ থেকে।

ত্যুলরি-র পথ বেয়ে যখন ফিরছেন বালজাক, তাঁর সঙ্গে দেখা হয়ে গেল, আধুনিক ফ্রান্সের তরুণ গল্পকার শঁ্যাফ্ল্যরির সঙ্গে। শঁ্যাফ্ল্যরি তাঁকে চিনতে পেরে সামনে এসে দাঁড়িয়েছিল। পরিচয় জেনে বালজাক মহা উৎসাহে তার কাঁধে হাত রাখলেন। এই নিদারুণ দক্ষযজ্ঞ আর নারকীয় হট্টগোলে ভেসে যেতে যেতে বালজাক যেন এতক্ষণে সত্যিকার একটা আশ্রয় পেলেন। সব ভুলে বলে উঠলেন, "পড়েছি, তোমার গল্প পড়েছি। একদিন এসো তুমি আমার বাড়িতে, পাভিলিওঁ ব্যুজোঁতে কাল পরশুই এসো।"

অভাবিত সেই নিমন্ত্রণে শঁ্যাফ্ল্যরির সে কী আনন্দ! মহান কথাশিল্পী বালজাক তার কাঁধে হাত রেখে কথা বলেছেন। তাকে তাঁর বাড়িতে নিমন্ত্রণ করেছেন। রইল

পড়ে রাজনীতি আর রক্তারক্তি বিপ্লব, তুচ্ছ সে-সব অনায়াসে মুলতবি রেখে ঠিক দুদিন পরেই সে এসে হাজির হল বালজাকের বাড়িতে।

পারীর কেন্দ্রে যখন রাজ্য ভাঙাগড়ার তুলকালাম কাণ্ড, তখন পারীর প্রান্তে পাভিলিওঁ ব্যুর্জো নীরব নির্জন। সেই স্তব্ধতার পটভূমিতে বসে তরুণ গাল্পিক মুগ্ধ হয়ে দেখছিল বালজাককে—তাঁর উজ্জ্বল কালো চোখ, তাঁর কাচা পাকা ঘন অবিন্যস্ত চুল, স্বর ওঠানামার সঙ্গে সঙ্গে মুখের বর্ণবিবর্তন, কখনো হলুদ কখনো লালচে হয়ে ওঠা, আর তাঁর অদ্ভুত ধরনের গুচ্ছ গুচ্ছ দাড়ি।

কথার মধ্যখানে মাঝে মাঝে উঁচু গলায় হেসে উঠছিলেন বালজাক আর তাঁর স্থূল ভুঁড়ি কেঁপে কেঁপে উঠে মজার দৃশ্য হচ্ছিল। কিন্তু শাঁফ্ল্যুরির চোখ সব সময় পড়েছিল বালজাকের আরক্ত ঠোঁট আর শক্ত সূচলো দাঁতের দিকে। অনেক কথা বলেছিলেন বালজাক তাকে। প্রবীণ কথাশিল্পী তাঁর মূল্যবান অভিজ্ঞতার শরিক করেছিলেন তরুণ কথাকারকে। একদিনের ঘনিষ্ঠ আলাপেই প্রবীণ আর নবীনের বন্ধুত্ব নিবিড় হয়ে উঠেছিল।

ছোট গল্প সম্পর্কে সেদিন বালজাক তাকে যা বলেছিলেন তা আজও ভেবে দেখবার মতন।

> "ছোট গল্প লিখো না ছেলে, ও লিখে কিচ্ছু হবে না। গল্প বড্ড সীমিত। শেষ পর্যন্ত লেখকের মনটাকেও সে তেমনি সীমিত ছোট্ট করে দেয়। সে আর তারপরে বড় কিছু, বিস্তৃত পল্লবিত কিছু লিখতে পারে না। মানে দম থাকে না। আমার মনে আছে 'লা প্রেস' কাগজে বারতোআ বলে একজন প্রতি সপ্তাহে একটা করে ছোট গল্প লিখত, বছর দুই লিখল—কিন্তু কী হল তার, নাম হল? কেউ আজ মনে করছে তাকে? তুমি যখন গল্প লিখে আনন্দ পাও, তুমি লেখ; কিন্তু বছরে তিনটের বেশী গল্প কিছুতে লিখবে না। সে-গুলি তুমি নিজের তৃপ্তির জন্যে লিখবে। আর লিখবে নভেলা—ছোটগল্প লেখকদের মেজাজে ছোট উপন্যাস ভাল আসবে; বছরে তাও দুতিনটের বেশী না। দশ বছরে যদি তোমার তিরিশটা নভেলা লেখা হয় আর তার অন্তত কুড়িটা হয় মাস্টারপীস তা হলে আর তোমার দুঃখ কী! হাঁ, বাকি সময় অন্য লেখা লিখবে। বেঁচে থাকার জন্যে অর্থ চাই, ওটা আসবে নাটক থেকে। নাটক লিখতে পারলে প্রচুর রোজগার হবে তোমার। আর লিখতে পারবেই বা না কেন? নাটক আর উপন্যাসে কিছু ফারাক নেই। কলা-রীতির যে পার্থক্যটুকু আছে নিষ্ঠার

সঙ্গে চেষ্টা করলেই আয়ত্ত করতে পারবে। আর মনে রাখবে একটা কথা—দীনতার প্রশ্রয় দেবে না মনে। শিল্পী বাঁচবে শিল্পীর মতন সমারোহে। তার জীবন ধারণ হবে শিল্পরুচির পরাকাষ্ঠা।"

উদাহরণ দিতে বালজাক তাঁর পাভিলিওঁ ব্যুজোঁর প্রত্যেকটি ঘর ঘুরে ঘুরে দেখালেন তাকে। শঁ্যাফ্ল্যুরি বালজাকের আর্ট কালেকশন, লাইব্রেরি আর বিভিন্ন কক্ষের রাজকীয় সজ্জা দেখে যেন বোবা হয়ে গেছে এমনি মুগ্ধ হল। একটা কথা উচ্চারণ করতে পারল না।

সেই প্রমত্ত বিপ্লবের দিনে পরম ভাগ্য শঁ্যাফ্ল্যুরির যে বালজাককে সে সেদিন খোস মেজাজে পেয়েছিল। খোস মেজাজ সেদিন পারীর বুদ্ধি-জীবীদের কারোরই ছিল না।

বালজাকের মেজাজটাও খিচড়ে ছিল লামার্তিনের সঙ্গে তর্ক করে। এই সাধারণতন্ত্রটা অশিক্ষিতের অরাজকতা বলে রাজনীতির নামে সেদিন শপথ উচ্চারণ করেছিলেন বালজাক ; ফ্রান্স ছেড়ে য়ুক্রেনে ইভার কাছে চলে যাবেন মনস্থির করে ফেলেছিলেন। তাই মনটা তাঁর ফ্রান্সের প্রতি বিমুখ ছিল। আর সে জন্যেই শঁ্যাফ্ল্যুরির মতন একজন উৎসাহী তরুণ গল্পকারকে পেয়ে অনেকক্ষণ খোস মেজাজে কাটিয়েছিলেন বালজাক। কিন্তু সে মেজাজ আবার বিগড়ে যেতে দেরি হল না। ঘটনার স্রোত অচিরেই বালজাককে দুশ্চিন্তার আবর্তের মধ্যে টেনে নিয়ে এল।

ভিকতর য়ুগো আর তাঁর সঙ্গীরা রাজতন্ত্র বাঁচাবার আশায় উদারপন্থী রাজতন্ত্রী দ্যুশেস দার্লেআঁস-কে কর্তা করে প্রতিনিধিরাজ প্রবর্তন করতে চেয়েছিলেন ; কিন্তু সশস্ত্র জনতা ক্ষমতা দখল করে ততক্ষণে সাধারণতন্ত্রী সরকার গঠন করার রাস্তা তৈরি করে ফেলেছে। আর সেই সাধারণতন্ত্রের একজন মাতব্বর নেতা তাঁর বন্ধু লামার্তিন। লামার্তিন যেখানে নতুন সরকারের একজন মোড়ল সেখানে যে শান্তি শৃংখলার আশা কম, সেখানে যে অরাজকতা অনিবার্য, বালজাক তাতে নিঃসন্দেহ ছিলেন। কেননা লামার্তিন স্বভাবত সৎ হলেও তাঁর কাব্যিক উচ্ছ্বাস আর ভাবাবেগের ওপরে বালজাকের আদৌ আস্থা ছিল না। তাঁর রাজনৈতিক দূরদর্শিতা সম্পর্কেও বালজাকের নৈরাশ্য ছিল প্রচুর।

শুধু বালজাক নন, সাধারণতন্ত্রী সরকারের প্রতি আস্থাশীল হওয়ার লোক সেদিন পারীর অর্থনীতির বাজারে আর ব্যবসায়ী-মহলে সামান্যই ছিল। হাড়ে দুর্দিনের কন্‌কনে হাওয়া লাগছিল সবারই। বাজার থেকে টাকা উধাও হয়ে যাচ্ছিল। শেয়ারের বাজার দারুণ পড়ে গেছে। নর্দার্ন রেলের শেয়ারে বহু টাকা লগ্নী করেছেন

বালজাক, সে টাকা উদ্ধারের কোন উপায়ই চোখে পড়ছিল না তাঁর। তিনি তাকিয়ে তাকিয়ে কেবল দেখছিলেন, তিনি ডুবে যাচ্ছেন, তিলে তিলে ডুবছেন তিনি। পারীময় কেবল আতঙ্ক। যার চোখের দিকেই তাকান আতঙ্ক ছাড়া আর কিছু দেখতে পান না। সম্পাদক, প্রকাশক, নাট্যমঞ্চ বালজাককে দেখলে কারো চোখই উজ্জ্বল হয়ে ওঠে না। কারো কাছ থেকেই বইয়ের বাবদ টাকা আদায় করতে পারছেন না। কেউই নতুন বইয়ের বাবদ কোন চুক্তি করতে চাইছে না। পারীর ভাগ্যে কী আছে, কী হয়, কী হবে—এই কেবল উৎকণ্ঠা সকলের।

একটা আপস মীমাংসার সকল চেষ্টা ব্যর্থ হলে, মেহনতী জনতা আর অভিজাত শ্রেণীর মধ্যে শক্তি পরীক্ষাটাই অনিবার্য হয়ে উঠল। স্থির হল গণভোটের ভিত্তিতে লোকসভার নির্বাচন হবে এপ্রিল মাসে।

'ল্য কনসতিত্যুশনেল' কাগজে বিজ্ঞপ্তি দিয়ে বালজাক জানিয়ে দিলেন, তিনিও এ নির্বাচনে একজন সদস্যপদপ্রার্থী হবেন। তিনি লিখলেন, "আজ ফ্রান্স তার সমস্ত শক্তি ও বুদ্ধিকে সংহত করতে চায়। আজকের দিনে ফ্রান্সের এটাই সব চাইতে বড় প্রয়োজন। এমন দিনে একজন বুদ্ধিজীবী হিসেবে নিজেকে তিনি দূরে সরিয়ে রাখতে পারেন না।"

কিন্তু জড়িয়ে গেলেই যে মস্ত কিছু হবে, তিনি খুব একটা কিছু করতে পারবেন ফ্রান্সের, এমন কোন স্বপ্নও পোষণ করেন নি বালজাক। তিনি সে কথা তাঁর বন্ধু আলেকজাঁদ্র্ বয়ে-কে স্পষ্ট বলেও ছিলেন, "ছাখো, গণভোটের ওপরে আমার কোন আস্থা নেই। এদের বেশীর ভাগই অশিক্ষিত অর্ধশিক্ষিত। এরা ভোটও দেবে সেই অশিক্ষিত অর্ধশিক্ষিতদের সুতরাং বুঝতে পারছ, বুদ্ধিজীবীদের নির্বাচিত হওয়ার আশা খুবই সামান্য।......আর তুমি ভাবছ, লামার্তিন হবে গণতন্ত্রী সরকারের মাথা? হুঁ, দেখো, সে ততক্ষণই নেতা হয়ে থাকবে যতক্ষণ না একজন প্রকৃত নেতা এসে ওকে টেনে নামিয়ে আনছে। আর ইতিমধ্যে সে যদি তার নিজের কোন আদর্শ ওদের ওপরে চাপাতে চায়, ওকে গুঁড়িয়ে দেবে সবাই মিলে।"

ফ্রান্সের অর্থনীতির বাজার, রাজনীতি আর সাধারণতন্ত্র সম্পর্কে হতাশার এই সব চিন্তা ভাবনা বালজাককে অস্থির করে তুলেছিল। ফ্রান্স আর তাঁর ভাল লাগছিল না। পারীর জন্যে তিনি আর বিন্দুমাত্র আকর্ষণ বোধ করছিলেন না। তিনি যদি নির্বাচিত না হন ফ্রান্স ত্যাগ করে তৎক্ষণাৎ ইভার কাছে চলে যাবেন স্থির করে ফেলেছিলেন।

ভের্ঝকোভানিয়ার জন্যে তাঁর মন ক্রমশ উতলা হয়ে উঠছিল। তাঁর

জীবিকার দুটি মাত্র উপায়, সাহিত্য আর মঞ্চ—উভয়ের ভবিষ্যৎই অনিশ্চিত হয়ে উঠেছে, শুকিয়ে গেছে তাদের আ।থক সামর্থ্যের উৎস, এমন অবস্থায় পারীতে পড়ে থাকবেন আর তিনি কোন ভরসায়? সর্বোপরি ফ্রান্স সাধারণতন্ত্রের নাগরিক হতে তাঁর সব থেকে বেশী অনীহা। অতএব পারী ত্যাগই সমীচীন, স্থির করলেন বালজাক। লামার্তিন যখন বর্তমান সরকারের একজন মাতব্বর ব্যক্তি পোল্যাণ্ড যাওয়ার পাসপোর্টের জন্যে অতএব বেগ পেতে হবে না তাঁকে। তাঁর সব বড় কাজ এখন পাওনাদারদের সঙ্গে একটা আপস-রফা করা। কিন্তু শূন্য হাতে পাওনাদারদের মন গলানো যায় না, কিছু কিঞ্চিৎ টাকা তাদের হাতে তুলে দিতেই হয়। এখন চিন্তা সে টাকা আসবে কোথা থেকে, কে দেবে সেই টাকা? বালজাক যাঁদের চিনতেন তারা সকলেই এখন জমির স্পেকুলেশনে মেতে উঠেছে। জলের দরে বিকিয়ে যাচ্ছে বাড়ি-ঘর খেত-খামার। এখন যদি মোটামুটি কিছু কিনে রাখা যায় আখেরে আশাতীত লাভ ঠেকায় কে! তাদের সকলেরই বিশ্বাস রিপাবলিকান সরকার বছর তিনের বেশী টিকবে না। তখন নির্ঘাৎ ডিকটেটরী শাসন আসবে, সে-পথে আবার করে নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্র।

চিরকাল স্পেকুলেশন করে এসেছেন বালজাক, ফাটকাবাজিতে ভাগ্য পরীক্ষা করতে সবার আগে এগিয়ে গিয়েছেন তিনি কিন্তু আজ আর সে-সব কিছু যেন লুব্ধ করেছে না তাঁকে। তাঁর এখনই এই মুহূর্তে কিছু টাকা চাই এবং সে টাকা কেবল তিনি পেতে পারেন তাঁর সৃষ্টির বিনিময়ে। সেই বিশ্বাসই তাঁকে সাহস জোগাল। এই নিদারুণ মন্দার বাজারেও তাঁর দোরে দোরে ঘোরার ফল ফলল। অনেক হেঁটে খেটে একটা নাট্য-সংস্থাকে বাগ মানাতে পারলেন বালজাক। তারা তাঁর 'লা মারাত্‌র্' (বিমাতা) নাটকটি মঞ্চস্থ করতে রাজী হল। কিন্তু 'লা মারাত্‌র্' তখনও লেখা শেষ হয় নি। তখনও তিনি লিখছেন। কিন্তু লেখা কী সোজা! একে ত চোখে অসুখ, যন্ত্রণা; তিনি এক একটা অক্ষরকে দুটো তিনটে দেখেন, তবু জোর করে লিখে চলেছেন। চোখের ওপরে যদি বা জোর চালাতে পারছেন রাস্তার উচ্ছৃংখল মানুষদের ওপরে তাঁর কোন এক্তিয়ার নেই। লিখতে লিখতে কলম থেমে যায়, কানে এসে বেঁধে উত্তেজিত মিছিলের প্রবল জিগির আর আকাশ বিদারী বিপ্লবের গান।

বালজাক কলম কামড়ে ধরে ভাবেন, তিনি গল্পে উপন্যাসে যা করেছেন নাটকে যদি তা করতে পারেন আর্থিক দিক থেকে তা হলে তিনি নিশ্চিন্ত হয়ে যাবেন চিরদিনের জন্যে; সম্পদে সম্মানে তখন আর তাঁর জুড়ি থাকবে না ফ্রান্সে। কিন্তু পারী শহর জুড়ে যদি এ রকম উচ্ছৃংখলতা চলতে থাকে, তবে তিনি কাজ করবেন

কী করে? ভাবেন এবং শক্ত করে কলম ধরেন। তাঁর বিশ্বাস রাজতন্ত্রীদের সঙ্গে সাধারণতন্ত্রীদের সংঘর্ষে শেষমেশ সাধারণতন্ত্রীরাই হেরে যাবে। তখন আবার শান্তি ফিরে আসবে। শেয়ারের বাজার তেজী হবে। বই কাটতে শুরু হবে। নাটক দেখতে ভীড় করবে প্যারীর মানুষ।

"....আমি লিখব। আমি লিখে যেতে চাই। আমি লিখে যাব। আর পাঁচ ছ'খানা নাটক লিখলেই যথেষ্ট। আর সে পাঁচ ছ'খানা নাটকের বিষয়বস্তু এখনই আমার মাথায় এসে গেছে। আমি জানি, আমি অনায়াসে তা লিখতেও পারব। কিন্তু এও জানি, সে লেখা খুব ভাল হবে না। আর ভাল না হলে আমাকে মঞ্চ থেকে বিদায় নিতে হবে। হোক, তবু, হাঁ, তবু আমি সে ঝুঁকি নেব। নেবই নেব। পৃথিবীতে একদল মানুষ জন্মে যাদের চোখে সারা জীবনই জল ঝরে, আর একদলের ঠোঁটে থাকে সারাজীবন সুখের হাসি। হাসুক তারা। আমি আমার ভাগ্যকে মেনে নিয়েছি। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, চোখ বুজলেই আমি তোমার প্রসন্ন মুখের স্নিগ্ধ হাসি দেখতে পাই। আমার দুর্দিনের সে-ই সব বড় প্রেরণা।"

ইভাকে চিঠি লেখেন বালজাক। আর লিখতে লিখতে নিজের মধ্যে সাহস শক্তি সঞ্চয় করেন। সেই সঞ্চিত সাহস আর শক্তির জোরে অবশেষে শেষ করেন 'লা মারাত্‌র্'। এতদিন পরে তাঁর উপন্যাসগুলির মতনই সার্থক এক অসাধারণ নাটক ভূমিষ্ঠ হয় তাঁর কলমে।

এদিকে রিপাবলিকানদের প্রতি রুষ্ট থাকা সত্ত্বেও বালজাক নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার সংকল্প ছাড়েন নি। নির্বাচনের অব্যবহিত আগে ১৯ এপ্রিল তিনি 'লা কনসতিত্যুশনেল' পত্রিকায় স্থায়ী সরকার গঠনের সপক্ষে এক বিবৃতি দিলেন। তিনি লিখলেন, "১৭৮৯ থেকে আজকের এই ১৮৪৮ অবধি ফ্রান্স প্রতি পনর বছর পর পরই তার সরকারের পরিবর্তন ঘটিয়েছে। কিন্তু কোন পরিবর্তনই চিরস্থায়ী কোন সুব্যবস্থা প্রবর্তন করতে পারে নি। পরন্তু প্রতিবারই ফরাসী সভ্যতার প্রভূত ক্ষতি ঘটেছে। তার সম্পদ সম্পত্তি ব্যবসা-বাণিজ্য শিল্প চারুকলা সাহিত্য নাটক অরাজকতার হাতে মার খেয়েছে। অকারণ রক্ত ঝরেছে মানুষের, তারা মিথ্যা অত্যাচার আর লাঞ্ছনা সহ্য করেছে। এখন সময় এসেছে স্থির হয়ে চিন্তা করার। ফ্রান্সের ভাগ্যের দুর্যোগ থেকে তার শিল্প বাণিজ্য চারুকলা সাহিত্য যাতে রক্ষা পায় এমন একটা শক্ত সমর্থ স্থায়ী সরকার গঠনই হোক ভোটদাতাদের লক্ষ্য।"

বালজাকের এই ঐতিহাসিক বিবৃতির ফলশ্রুতি মাত্র ২০টি ভোট। অথচ

পক্ষে লামার্তিন পেলেন ২৫৯৮০০ ভোট। দেখা গেল বালজাক সাহিত্যে জনপ্রিয়তার শীর্ষে উঠলেও তাঁকে লোকসভার শীর্ষে তুলতে কেউ রাজী নয়। তাঁর সাহিত্য-চিন্তার সঙ্গে সকলে একমত হলেও তাঁর রাজনৈতিক চিন্তাকে কেউ আমল দিতে চাইল না।

বালজাক তাতে বিন্দুমাত্র দুঃখিত হলেন না। যেন তিনি জানতেন এমন ঘটনা ঘটবে। তাঁর এখন ইচ্ছে অবিলম্বে ফ্রান্স ত্যাগ। লামার্তিন তাঁর পাসপোর্ট মঞ্জুর করে দিতেও রাজী হলেন। সব ঠিক। এখন ভালয় ভালয় নাটকটা মঞ্চস্থ হলেই তিনি খুশী, যাওয়ার আগে ঋণের একটা সম্মানজনক ব্যবস্থা করে হাতে কিছু টাকা নিয়ে তিনি বেরিয়ে পড়তে চান।

নাট্যসংস্থাও চেষ্টার ত্রুটি করেন নি। মহৎ প্রতিভার এক অবিস্মরণীয় সৃষ্টিকে পাদপীঠের আলোতে উজ্জ্বল করে তুলে ধরতে প্রাণপণ প্রয়াস করলেন। তাঁরা সফলও হলেন। গুণীজন-সমর্থনারও অভাব ঘটল না। বালজাকের এতকালের শত্রু বিখ্যাত সমালোচক জুল জানিঁ পর্যন্ত উচ্ছ্বসিত প্রশংসা গাইলেন নাটকটির। কিন্তু হলে কী হবে! ফ্রান্সের সেই নিদারুণ অরাজকতার দিনে চতুর্দিকে যখন ছুরি শানাশানি আর নির্মম হানাহানি তখন অর্ধেক লোকই প্রাণের মায়ায় পারীর বাইরে। নাট্যরসিক নিরীহ মানুষ তখনও কিছু যারা পারীতে ছিল রাতবিরেতে ঘরের বাইরে বেরোতে তারা অধিকাংশই রাজী নয়। ফলে, দু'তিনটে রাত অভিনিত হল নাটকটি কিন্তু হলের তিনভাগের একভাগও ভরল না একদিন। বালজাকের ভাগ্যে সেই ভাঙাহাটে জুটল মাত্র ৫০০ ফ্রাঁ।

আর কী জন্যে থাকা পারীতে, আর কীসের মায়া ফ্রান্সের জন্যে! বালজাক তৈরি হলেন। তিনি পালাবেন এখান থেকে। পাড়ি দেবেন জন্মের মতন। তিনি রাশিয়ার নাগরিক হবেন। ভের্কোভানিয়াই তাঁর যথার্থ বাসভূমি হবে অতঃপর।

পাশপোর্টের পরে ভিসা। আবেদন মাত্রই রাশিয়ান অ্যামব্যাসি ভিসা মঞ্জুর করে দিলে। অবশ্য বালজাকের অগোচরে রুশ গুপ্তচর-দপ্তরে একটা চিঠিও পাঠিয়ে দিলে তারা: বিপ্লবী ফ্রান্স থেকে যাচ্ছে মানুষটি, তার গতিবিধি চালচলনের ওপরে যেন নজর রাখা হয়।

পাওনাদারদের বিন্দুমাত্র জানতে না দিয়ে বালজাক তাঁর যাত্রার আয়োজন সম্পূর্ণ করলেন। তিনি আর ফিরবেন না, এখন পর্যন্ত এটাই ঠিক। যদি ফেরেন ইভাকে বিয়ে করে একেবারে সঙ্গে নিয়ে তবে ফিরবেন। অতএব যাওয়ার আগে

ব্যবস্থা করে গেলেন, তাঁর প্রিয়ার প্রাসাদ পাভিলিওঁ ব্যুজোঁ। তখন যেন থাকে উৎসব-দীপমালা সমুজ্জ্বল, কুসুম কিশলয় সুসজ্জিত—ইভাকে অভ্যর্থনা করার যেন না কোন ত্রুটি ঘটে কোথাও।

স্ট্যাম্প কাগজে সই করে ডেকরেটারকে টেণ্ডার দিয়ে গেলেন, মনের মতন হওয়া চাই ফুল-আলোক সজ্জা, টাকার জন্তে যেন তারা না ভাবে। যত টাকা লাগুক তিনি এসে মিটিয়ে দেবেন। মায়ের ওপরে ভার রইল ডেকরেটারকে সময় মতন খবর দেওয়ার। মাকে সর্বপ্রকার খুঁটিনাটি উপদেশ নির্দেশ দিয়ে ১৯ সেপ্টেমবর নিঃশব্দে গিয়ে ট্রেনে চাপলেন বালজাক।

বালজাকের নিয়তি অলক্ষ্যে থেকে তাঁর জীবননাট্যের শেষ অঙ্ক রচনায় মন দিল।

ষোল

প্রথম নিকোলাস তখন রাশিয়ার জার। এই দোর্দণ্ড প্রতাপ সম্রাটের ধমনীতে রোমানফ-আভিজাত্যের রক্ত। দয়া মমতা বলতে তাঁর মস্তিষ্কে কিছু ছিল না। তদুপরি তাঁর ধনী পোল-প্রজাদের প্রতি ছিল একটা জন্মগত বিদ্বেষ। আর ফ্রান্স! রিপাবলিকান ফ্রান্সকে তিনি ঘৃণা করতেন প্রাণপণে। তা ছাড়া ছিল একটা পরম ভয়, ফ্রান্সের মেহনতী জনতার জিগির বুঝি তাঁর কানেও এসে পৌঁছেছে। য়ুরোপের অন্তান্ত দেশের রাজন্তবর্গের মতন তিনিও বুঝি সুখ-নিদ্রার মধ্যে মাঝে মাঝে দুঃস্বপ্ন দেখে চমকে উঠছেন। ফলত রিপাবলিকান ফ্রান্সের লোকসভায় নির্বাচন প্রার্থী লেখকের ধনী পোল-বিধবাকে বিয়ে করার আবেদন নাকচ হয়ে গেল।

বালজাক জানতেন না পারীর রুশ অ্যামব্যাসি তাঁকে রাশিয়ায় যাবার ভিসা মঞ্জুর করেছে বটে কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তাঁর গতিবিধির ওপর কড়া নজর রাখতে রুশ-গোয়েন্দা-পুলিশের সদর দফতরেও একটা গোপন চিঠি পাঠিয়ে দিয়েছে। এ যে সেই গোপন চিঠিরই ফলশ্রুতি বালজাক জানবেন কেমন করে? অবশ্য এ বিয়ে মঞ্জুর না হওয়ার পেছনে আসল হেতু বিবাহ-সূত্রে জার তাঁর দেশের ধন-সম্পদ রিপাবলিকান ফ্রান্সের হাতে তুলে দিতে না-রাজ। রাশিয়ার আইনই তার মস্ত বড় বাধা।

জার তাঁর গোয়েন্দা দপ্তরকে নির্দেশ দিলেন, "মঁসিয়ে বালজাককে জানিয়ে দাও। বল, রাশিয়ার আইন ফ্রান্সের মতন ভাঙবার জন্যে তৈরি হয় না।"

জারের সেই নির্দেশ প্রথমে পারী গিয়েছিল। সেখান থেকে ঘুরে যখন ভের্ঝকোভানিয়ার প্রাসাদে এল, বালজাক তখন শয্যাগত। তিনি নিয়ুমোনিয়ায় ভুগছেন।

বালজাক যে আর এ রোগশয্যা ছেড়ে উঠবেন না, উঠতে পারবেন না, এ কথা তিনি মনে মনে না বুঝেছিলেন তা নয়; কিন্তু যে অনমনীয় ইচ্ছাশক্তির জোরে সহস্র প্রতিকূলতার মধ্যেও তিনি শতাধিক পুস্তক রচনা করেছেন সে ইচ্ছাশক্তিই তাঁর সে-মৃত্যুর পরোয়ানাকে দুরন্ত বলে ঠেকিয়ে রাখছিল।

রুশ গোয়েন্দা-পুলিশের কর্তা তাঁর রোগশয্যার পাশে বসে যখন জারের হুকুমনামা শোনাচ্ছিলেন তখন বালজাক ডজনখানেক বালিশের ওপরে আধখানা শরীরের ভর রেখে তাকিয়েছিলেন অফিসারটির মুখের দিকে। তিনি থামলে বালজাক মৃদু হেসে বললেন, "শেষে কী মহামান্য জার একজন সামান্য লেখককেও ভয় করতে শুরু করলেন?"

কথা শুনে ভ্রূকুটি করলেন অফিসারটি, কোন জবাব দিলেন না, উঠে নিঃশব্দে বেরিয়ে গেলেন।

১৮৪৮-এর সেপ্টেম্বরে এসে ১৮৫০-এর এপ্রিলের কয়েকটা দিন—প্রায় দেড় বছর বালজাক ছিলেন ভের্ঝকোভানিয়ায়। কিন্তু এবারকার ভের্ঝকোভানিয়া আর যে তাঁর কাছে স্বর্গ নয় প্রাণহীন প্রান্তর মাত্র, সে তিনি স্পষ্ট করেই লিখেছিলেন তাঁর মাকে, "মা, তুমি যদি পনরটা দিনও কাটাতে আসতে ভের্ঝকোভানিয়ায় ত বুঝতে পারতে তুমি এখন যেখানে আছ সেই রু ফোরতুনে সত্যি কী শান্তির কী আরামের জায়গা।"

কিন্তু ভের্ঝকোভানিয়ার প্রেমের স্বর্গ মমতাহীন মরুভূমি হয়ে ওঠার জন্যে একমাত্র বালজাকের অসুখই দায়ী নয়, তাঁর অসম্ভব ঋণই আসলে তাঁর সব সর্বনাশের মূল। বালজাক তাঁর পাওনাদারদের ফাঁকি দিয়ে পালিয়ে এসেছিলেন কিন্তু বালজাক যে কোথায় গিয়ে গা ঢাকা দিয়েছেন জানতে তাদের দেরি হয় নি আর জানা মাত্র তারা তাদের পাওনার তাগিদের সঙ্গে তাড়া তাড়া বকেয়া বিলগুলি পাঠাতে শুরু করেছিলেন। আর সেই অনাদায়ী বিলগুলি বালজাক একে একে তুলে দিচ্ছিলেন ইভার হাতে, অনন্যোপায় ইভা তাঁর পারীর ব্যাঙ্কারের মারফৎ চেক পাঠিয়ে শোধ করছিলেন সে দায়। কিন্তু বালজাকের

ঋণ যেন অসীম। সমুদ্রের তল আছে কূল আছে কিন্তু এর তল কিনারা পাচ্ছেন না ইভা।

ইভা ইতিমধ্যেই তাঁর সমস্ত সম্পত্তি লিখে দিয়েছিলেন তাঁর মেয়েকে। তাঁর ভরসা এখন বছরে লাখখানেক ফ্রাঁর বৃত্তি মাত্র। আজন্ম ঐশ্বর্যবিলাসে লালিত মানুষটি এই সামান্য বৃত্তি ভরসা করে ওই উড়নচণ্ডে পুরুষটিকে বিয়ে করে কী দশা ভুগবেন, ভাবে মেয়ে আর জামাই আন্না এবং জর্জ। শুধু ত ওই উড়নচণ্ডে ঋণে-ডলানো পুরুষটিই নয়, রয়েছে তাঁর পঁচাত্তর বছরের বুড়ী মা, গরিব একটি বোন আর তার অনূঢ়া দুটি মেয়ে। যাকে যে তাদের ভারও কাঁধে নিতে হবে বিয়ের পরে।

ইভার মনও এই সমস্যার ভারেই এখন পীড়িত। প্রেমিক হিসেবে বালজাক, তাঁর 'বিলবোকে', চিরদিনই তাঁর প্রিয়, তাঁর প্রেম পেয়ে তিনি গর্বিত নিঃসন্দেহে; আজ রোগশয্যায় পড়েও বালজাক ইভার প্রীতি সহানুভূতি হারান নি; ইভার বালজাক, অসুস্থ শয্যাগত হলেও তিনি তাঁরই। তবু বালজাককে বিয়ে করতে তাঁর সাহস নেই; স্বামী হিসেবে কোন দিনই তাঁকে যোগ্য ভাবতে পারেন নি ইভা। আজ যেন আরও অযোগ্য মনে হচ্ছে তাঁকে ইভার। এমন অযোগ্যকে বিয়ে করতে যেন বল সঞ্চয় করতে পারছেন না ইভা। বিয়ের আগে পুরুষটি অন্তত তাঁর ঋণের বোঝা খানিকটা হালকা করুক। এত এত ঋণ নিয়ে কী করে তিনি এমন একটা পুরুষকে বিয়ে করবেন, যে ফ্যাক্‌টের সঙ্গে ফিক্‌শনের পার্থক্য বোঝে না, যে উপন্যাস আর বাস্তব জীবনকে এক সঙ্গে জড়িয়ে ফেলে ?

এ অন্তর্দ্বন্দ্ব ইভা যে সব সময় একলা মনের মধ্যে পোষণ করতেন আর নীরবে কষ্ট ভুগতেন তা নয়, মাঝে মাঝে বলেও ফেলতেন বালজাককে। আর মেয়ের সঙ্গে বসে বসে পরামর্শ আঁটতেন কেবল—কী করা যায়, কী করবেন তিনি ?

বালজাক যে ইভার মনের এই দ্বন্দ্ব যন্ত্রণা কিছুই বুঝতেন না, টের পান নি, তা নয়। টাকাকড়ির ব্যাপার নিয়ে মায়ের এক রূঢ় চিঠির জবাবে, ভের্ঝ-কোভানিয়া ২২ মার্চ ১৮৪৯, বালজাক এক দীর্ঘ চিঠি লিখেছিলেন মাকে। তার শেষ অংশে প্রসঙ্গত তিনি লিখেছিলেন,

> ……অধিকন্তু যে মানুষটিকে আশ্রয় করে আমি সুখী হওয়ার জন্যে আকুল হয়ে উঠেছি সে কচি খুকি নয়। আকণ্ঠ ঋণ, কঠোর পরিশ্রম ও শত দুর্দৈবের মধ্যেও যাকে পাওয়ার জন্যে আমি অতন্দ্র চিত্তে উন্মুখ হয়ে থেকেছি সে বছর আঠারোর একটি অবোধ যুবতীও নয় যে খ্যাতির জৌলুসেই তার চোখ ধাঁধিয়ে যাবে, কি ঐশ্বর্য দেখলেই অস্থির হয়ে উঠবে

অথবা সুন্দরের পায়ে অনায়াসে নতজানু হবে। আমার তা নেইও। আমি তাকে লোভনীয় কিছুই উপহার দিতে পারি নি। আমার আছে একটু খ্যাতি; কিন্তু আগেই বলেছি, খ্যাতির ঝকমকিতে অন্ধ হওয়ার মেয়ে সে নয়, সে বয়সও তার না। তার বয়স চল্লিশ পেরিয়ে গেছে অনেক ক্লেশ কষ্ট গেছে তার জীবনের উপর দিয়ে। ফলত সে আজ দ্বিধাগ্রস্ত সন্দিগ্ধচিত্ত। জীবনের নানা ঘটনা তাকে সন্দিগ্ধ হতেই শিখিয়েছে কেবল।........তার প্রকৃতির সঙ্গে গত দশ বছর ধরে আমার পরিচয়। এটা স্বাভাবিক যে, সে যাতে রুষ্ট অসন্তুষ্ট হয় এমন কোন অপ্রিয় দায় আমি তার ওপরে চাপাব না। তাই আমি তাকে পরিষ্কার জানিয়ে দিয়েছি, 'আমাকে বিয়ে করে তোমাকে আমার পরিবারের বোঝা বইতে হবে না। তাদের অভাব-অনটন প্রয়োজন দেখতে হবে না তোমাকে।' ইভার টাকা আছে বলেই সে তোমাদের জন্যে দু'হাতে খরচ করবে একথা তাকে বলব না, বলছি না বলেই, তোমরা আমাকে স্বার্থপর লোভী নিচ ভাববে এটা ভয়ানক অন্যায়। আমি ত কোনদিনই আমার মনের কথা তোমাদের কাছে লুকোই নি। তোমাকে লোর-কে এ কথা আমি অনেকদিন আগেই স্পষ্ট বলে দিয়েছি। তবে কেন তুমি ওকে শোষণ করার পরামর্শ দিয়ে চিঠি লেখ? তুমি মনে রেখো, আমি আবার করে বলছি, আমি একজন ধনী বিধবাকে বিয়ে করছি এ জন্যে নয় যে, সে আমাদের দারিদ্র্যের সংসার ঐশ্বর্যে ভরে দেবে।......আমার কল্যাণ-চিন্তা সৌভাগ্য-চিন্তা কোন দিন তুমি করোনি। আজও তা করতে বারণ করছি। ঈশ্বর জানেন, ভূমিষ্ঠ হওয়া অবধি তুমি আমাকে কতটুকু আদর যত্ন করেছ, কতটুকু ভালবেসেছ। তা যে করোনি সেজন্য আজ আমি তোমাকে এতটুকু দুষব না, কেননা, তুমি যদি আমাকে তোমার ছোট ছেলে আঁরি-র মতন সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের মধ্যে কেবল লাই দিয়ে মানুষ করতে ত আজ আমি যা হয়েছি তা কিছুতেই হতে পারতাম না, আঁরি-র মতনই বাজে বখাটে হয়ে যেতাম আমি। তোমাকে ধন্যবাদ তা তুমি করো নি। এবং সে অর্থে তুমি আমার মায়ের মতন মা, আদর্শ জননী। কিন্তু জননী, তুমি বড্ড ভোঁতা। তাই তোমাকে অনুরোধ করছি নিজের স্বার্থকে অন্তত চতুর চোখে দেখতে শেখ, যা তুমি কোন দিন পারোনি। আর একটা কথা, আমার ভাবী সুখে বাগড়া দিতে

এসো না। আমি আজ আর খোকা নই, আমার আজ পঞ্চাশ বছর বয়েস। আমার সুখী হওয়ার পথ আমিই তৈরি করে নেব।"

কিন্তু সুখী হওয়ার রাস্তা তৈরি করতে বালজাক কোন দিনই নির্বিঘ্নে পারেন নি। পদে পদে তাঁর বিপদ বাধা ঝড় ঝঞ্চাট।

সেই ঝঞ্চাট অশান্তি যন্ত্রণা চলছে এখনও। ইভার সঙ্গে মাঝেমাঝেই খোঁটাখুঁটি বেধে যাচ্ছে বালজাকের। রোগে মনঃকষ্টে তাঁর প্রাণ ওষ্ঠাগত হয়ে উঠেছে ভের্ঝকোভানিয়ায়। পারীতে নিত্য পত্র লেখেন বালজাক। কিন্তু কোন প্রকাশক এখন আর নতুন বইয়ের চুক্তি করতে চাইছে না। কোন মঞ্চই এখন আর নতুন বই অভিনয় করতে রাজী নয়। পারীর অবস্থা বালজাক যেমন দেখে গেছেন তাই। এখনও অনিশ্চিত অশান্ত। রাজনৈতিক জটিলতা ব্যবসা বাণিজ্যের বাজারে ভীষণ সংকট ডেকে এনেছে। জনতার মন উচাটন। এখন আর তারা বই পড়তে চাইছে না। নাটক দেখতে উৎসাহ পাচ্ছে না।

নিরাশার চিঠি পড়ে পড়ে রুগ্ন বালজাক আরও অসুস্থ হয়ে পড়েন। এখন তাঁর পীড়া সংকট অবস্থায় চলে এসেছে। ১৮৪৯-এর শীত যেন আর কাটতে চায় না। বালজাক না পারেন হাঁটতে, না পারেন উঠে বসতে। চুলে চিরুনি টানতেও দম বন্ধ হয়ে আসে তাঁর। গলা দিয়ে গয়ার ওঠে গলগলিয়ে। ভের্ঝ-কোভানিয়ার মানুষ এখন তাঁকে সহ্য করে নিতান্তই সৌজন্য বশে। আজ আর তিনি ইভার গৌরবের প্রেমিক নয়। একজন প্রিয় পরিচিত লেখক, অসহায় অতিথি মাত্র। গলগ্রহ বললেও অত্যুক্তি হয় না।

সম্ভব হলে বালজাক এখনই এই মুহূর্তে এখান থেকে চলে যেতেন। প্রেম যেখানে উদাসীন, প্রাণ সেখানে স্বভাবতই অতিষ্ট হয়ে ওঠে। তাছাড়া এখন পারীতে উপস্থিত থাকলে যেমন করে হোক দু'একজন পাবলিশার পাকড়াতে পারতেন; অনুরোধ উপরোধ করলে দু'একটা মঞ্চও তাঁর নাটক মঞ্চস্থ করতে রাজী হত। কিন্তু বিধাতা বিমুখ, রোগ আরোগ্য হওয়া দূরে থাক, দিন দিন আরও কঠিন হাতে যেন চেপে ধরছে তাঁকে। যমরাজ এক হাতে তাঁর হৃদপিণ্ড আর এক হাতে ফুসফুস ধরে মরণ খেলা খেলছে।

নির্মম যম আর দুর্ধর্ষ পুরুষের সেই সংগ্রামে হঠাৎ একদিন বালজাকেরই যেন জয় সূচিত হল, অসুখের যেন গতি ফিরল তেজ কমল খানিকটা। ইভার জর্মন ডাক্তার নিঃশ্বাস ছেড়ে বললেন, "এ যাত্রা হয়ত মঁসিয়েকে বাঁচাতে পারলাম আমরা।"

বালজাক শয্যা ছেড়ে হেঁটে এসে তাঁর পড়ার ঘরে বসলেন : তাঁর লেখার পোশাক—সেই যাজকের সাদা জোব্বা, তার কলারের সঙ্গে বাঁধা কাচি, কোথায় সে সব! কত দিন যেন তিনি লেখেন না, কতকাল। "হা ঈশ্বর মাত্র পঞ্চাশ বছর বয়স আমার। এই বয়সেই আমার এই দশা!" দীর্ঘশ্বাস ছাড়েন বালজাক।

ইভাকে বিয়ে করার আশা ছেড়ে দিয়েছেন বালজাক। সম্পত্তি হস্তান্তর করার পরে এখন আর জারের আইনে বিদেশীকে বিয়ে করতে বাঁধা নেই। তবু ইভা কেন তাকে বিয়ে করবে? একজন রুগ্ন পুরুষ ঋণ ছাড়া দেওয়ার যার কিছু নেই, যার দেশে অরাজকতা ছাড়া কিছু নেই, তাকে বিয়ে করে পোল্যাণ্ডের অভিজাত সুন্দরী কেন তার শান্তি আর প্রাচুর্য ক্ষমতা আর সম্মান হেলায় হারাতে বসবে!

তাঁর নিঃশ্বাস টানতেও কষ্ট, গোটা বছর একটা লাইন লেখেন নি, একটা কপর্দক উপার্জন করেন নি। এমন কি প্রেম করার দৈহিক সামর্থ্য পর্যন্ত আজ আর তাঁর নেই। তিনি একটা অসহায় শিশুতে পরিণত হয়েছেন আজ। ইভা দ্য হান্সকা আজ আর তাঁর প্রেমিকা নয়; তাঁর ভালবাসার স্ত্রীকে আজ তিনি নার্সে পরিণত করেছেন : অতএব তাঁর উচিত ইভাকে মুক্তি দেওয়া।

বালজাক একদিন বলেই ফেললেন ইভাকে তাঁর মনের কথাটা। "যত তাড়াতাড়ি সম্ভব, আমি পারী চলে যাব।"

"তুমি একলা যাবে না। আমিও যাব তোমার সঙ্গে। আমি তোমার স্ত্রী হব, বিলবোকে।" আদরের নামে ডেকে বালজাকের চুলের মধ্যে হাত ডুবিয়ে দিলেন ইভা।

বালজাক মূঢ়ের মতন তাকিয়ে থাকলেন। তাঁর মনে হল এ সত্যি নয়, তিনি ভুল শুনেছেন।

ভুল নয় যখন তিনি জানলেন, ইভা যখন তাঁর কথা আবার করে উচ্চারণ করলেন, বালজাক তাঁর কোমর জড়িয়ে ধরে শিশুর মতন কেঁদে ফেললেন! আবেগ একটু স্তিমিত হলে বললেন, "এক ঘন্টা আগেও আমি মৃতকল্প ছিলাম। এখন মনে হচ্ছে আমার কোন রোগ নেই। আমি সুস্থ সবল। তুমি আমাকে বাঁচার প্রেরণা দিয়েছ ইভা, আমি বাঁচব, অনেক দিন বাঁচব।"

কিন্তু আমরা আজ জেনে গেছি, মেয়ের ডায়েরি থেকে প্রকাশ হয়ে পড়েছে, অবশেষে ইভা দ্য হান্সকা যে বালজাককে বিয়ে করবেন বলে কথা দিয়ে ফেললেন তা হঠাৎ কোন আবেগ-মুহূর্তের আকস্মিক উচ্ছ্বাসের উক্তি নয়। মেয়ের ব্যাপারে ছাড়া তিনি কোন কিছুতেই হঠাৎ আবেগে জলে ওঠেন না। তিনি এতকাল যে

কারণে বালজাকের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে এসেছেন সে কারণেই আজ তিনি তাঁর প্রস্তাবে সম্মতি দিয়েছেন। ইভা ঠাণ্ডা মাথায় নিজের স্বার্থের কথা ভাবেন এবং বিনা স্বার্থে কিছুই করেন না। আজও সেই স্বার্থই বালজাককে বিয়ে করার আগ্রহ যোগাল ইভাকে।

তিনি পোল্যাণ্ডের ওপরে বীতশ্রদ্ধ হয়ে উঠেছিলেন। ভের্কোভানিয়ার জমিদারির দায়িত্ব বহন করতে বড় ক্লান্ত লাগছিল তাঁর। এবার সে ভার হস্তান্তর করে যে মুহূর্তে তিনি হালকা হলেন তখন থেকে অপ্সরী পারীর উষ্ণ হাওয়ার হাতছানি কেবলই লোভাতে থাকল তাঁকে। তুষার শীতল পোল্যাণ্ডকে আরও শীতল মনে হতে থাকল। এবার দায়মুক্ত নির্ভার তিনি তাঁর স্বপ্নের পারীতে বাস করবেন। দিনরাত উৎসবের মধ্যে ডুবে থাকবেন। সেণ্ট পেতের্সবুর্গ কিয়েভ নিষ্প্রাণ অকিঞ্চিৎকর, পারীর মতন আকর্ষণ নেই সেখানে, আর কোনখানে। ইভার মতন ধনী বিলাসিনী রমণীকে একমাত্র ভূস্বর্গ পারীই পারে অনুক্ষণ মাতাল করে রাখতে। সেই পারীতে ইভা পরিপূর্ণ মর্যাদায় যেতে পারেন কেবল বালজাককে বিয়ে করে। স্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ কথাশিল্পীর স্ত্রী হিসেবে পারীর অভিজাত সমাজের সকল দরজা তাঁর কাছে অবারিত থাকবে, সে পথে ভোগের নিরংকুশ সুযোগ মিলবে তাঁর। তাছাড়া বালজাকের অবিস্মরণীয় বইগুলির উত্তরাধিকারিণী হিসেবেও সাহিত্য জগতের তিনি হবেন একজন বিশিষ্ট মানুষ। বালজাকের স্ত্রী হওয়া এক জিনিস এবং সে আদৌ লোভনীয় নয়; কিন্তু বালজাকের বিধবা পত্নী হওয়া অন্য জিনিস এবং তার মতন সৌভাগ্য আর কিছু হয় না। অতএব ইভা হান্সকা বালজাককে বিয়ে করতে রাজী হলেন। ইভা হিসেব করে দেখেছেন, ইভার ডাক্তারই হিসেব করে বলে দিয়েছেন, ছ'মাসের বেশী বাঁচবেন না বালজাক। অর্থাৎ বিয়ের ছ'মাস পরেই অথবা বড় জোর এক বছরের মধ্যেই ইভার প্রার্থীত সুযোগ এসে যাচ্ছে। তিনি বিধবা হচ্ছেন। কমেদি যুমেন-এর সর্বস্বত্ব আর বালজাকের নাম হাতে আসছে তাঁর। একাধারে সম্মান ও সম্পদ হিসেবে সে যে কী লাভ, চতুরা রমনী গুনতে ভুল করেননি।

আর বালজাক! সতর বছরের পোষা স্বপ্ন, সেই সুইটজারল্যাণ্ড থেকে যে-স্বপ্ন তিনি দেখে আসছেন তা সত্য হতে চলেছে। সে কী আনন্দ বালজাকের। আজ আর তাঁর মরার ইচ্ছে নেই, আরও পঁচিশ বছর তাঁর বাঁচার ইচ্ছে।

"ডাক্তার, আমি কী করে বিয়ে করতে যাব যদি আমি ভাল করে নিশ্বাস টানতেই না পারলাম?" জিজ্ঞেস করে বিষণ্ণ হয়ে থাকলেন বালজাক।

"ওষুধ দিচ্ছি, ঠিক খাড়া হয়ে যাবেন আপনি", ইভার ডাক্তার প্রসন্ন কণ্ঠে বলে উঠলেন।

আর ইভাকে বিব্রত কণ্ঠে বললেন, "যদি কারো আগের থেকেই হার্ট খারাপ থাকে, তার মধ্যে তাকে ধরে যুক্রেনের ম্যালেরিয়ায়, ত স্বয়ং ধন্বন্তরি এসেও বাঁচাতে পারবেন না তাকে।"

কিন্তু ডাক্তারকে, ইভাকে, ভের্ঝকোভানিয়ার সকল মানুষকে অবাক করে দিয়ে মার্চের প্রথম সপ্তাহেই বালজাক দু'পায়ে ভর করে সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারলেন এবং ১৮৫০-এর ১৪ মার্চ বারবারার চার্চে পর্যন্ত যেতে পারলেন। ভের্ঝকোভানিয়া থেকে বেরদিশফ-এর বারবারা চার্চ বেশ কয়েক ক্রোশ দূর। সেই দূর শহর যুক্রেনের বেরদিথফ-এ ওঁরা মধ্য-রাতে রওনা হয়ে ভোর বেলা এসে পৌছলেন; তখনও এখানে ওখানে গাছের ডালে ঝোপের তলায় অন্ধকার, আকাশে ভাল করে আলো ফোটেনি, সেখানে মেঘের কোলে কেবল সবে রুপোলি রং ধরতে শুরু করেছে। সেণ্ট বারবারা চার্চে সেদিন নিমন্ত্রিত কেউ ছিল না। ইভা কাউকেই নিমন্ত্রণ করতে চান নি তাঁদের বিয়েতে। অত্যন্ত অনাড়ম্বর পরিবেশে মাত্র কতিপয় মানুষের উপস্থিতিতে বিয়ে হল তাঁদের। বিয়ের চুক্তি পত্রে স্বাক্ষর করলেন দুজন সাক্ষী, একজন চার্চ-পিতার আত্মীয় আর একজন আন্নার স্বামী কাউণ্ট জর্জ এমনিস্‌রেক। তাঁরা যখন চার্চ থেকে বেরিয়ে এলেন তখন আকাশ জুড়ে মেঘ করেছে, মৃদু মৃদু বৃষ্টি হচ্ছে তখন। বৃষ্টি আর তুষারপাত। দেখতে দেখতে সে-বৃষ্টি আর তুষারপাত তুমুল হয়ে উঠল। তারই মধ্যে ভিজতে ভিজতে সেদিনই আবার তাঁরা ফিরে এলেন ভের্ঝকোভানিয়ায়। ফিরতে রাত সাতটা বেজে গেল।

রোগের বুঝি সব বড় ওষুধ আনন্দ, নইলে ওই তুষার-বৃষ্টিতে ভিজে সর্দিতে বালজাকের দম বন্ধ হয়ে মরার কথা, তিনি কিন্তু বিছানায়ও গেলেন না, লেখার টেবিলে এসে বসলেন। তাঁর জীবনের সর্বোত্তম সাফল্যের আনন্দ প্রিয়জনদের পরিবেশন করতে চিঠির প্যাড টেনে নিলেন। তাঁর মুখে সুখের উজ্জ্বল উদ্ভাস দেখে কে ভাববে তাঁর বুকে মৃত্যু বাসা বেঁধেছে, আর বেশী দিন বাঁচবেন না তিনি। তিনি যখন চিঠি লিখছেন ছত্রে ছত্রে ফুটে উঠছে তাঁর মুখের সেই খুশীর আলো, সুখের উচ্ছ্বাস। দিন কতক বসে তিনি শুধু চিঠিই লিখলেন।

জুলমা কারুদকে লিখলেন,

"দীর্ঘ সতর বছর যাকে আমি ভালবেসে এসেছি, তিলেকের জন্যেও যাকে আমি ভুলতে পারি নি আমার সেই স্বপ্নের নারীকে আমি বিয়ে

করেছি আজ তিনদিন হল। তার প্রতি আমার ভালবাসা আজ আরো মধুর আরও উজ্জ্বল। মৃত্যুর দিন অবধি আমি এই ভালবাসার মধুর আলোর সমুদ্রে ডুবে থাকব। দীর্ঘতম যে বছরগুলি জুড়ে আমি কেবল কঠোর পরিশ্রম করেছি, নির্মম ঝড়-ঝাপটা সহ্য করেছি আর বিপুল বলে উৎরে এসেছি, এ মিলন যেন তারই মহত্তম পুরস্কার। ঈশ্বর আমার জন্যে যত্ন করে তুলে রেখেছিলেন, এখন আমার হাতে সন্তর্পণে সঁপে দিলেন।

আমার শৈশব সুখের ছিল না। আমার জীবনে বসন্ত কখনো কুসুমাস্তীর্ণ হয়নি। কিন্তু আজ জীবনের পড়ন্ত মধ্যাহ্নকে আমি হৃদয় ভরে উপভোগ করবার সুযোগ পেলাম। দেখো আমার ভাগ্যে জীবনের হেমন্ত-সন্ধ্যাও হবে পরম রমণীয়……"

মাকেও এ শুভ সংবাদ জানিয়ে দীর্ঘ পত্র লিখলেন, কিন্তু সে পত্রের শেষে তাঁর পুত্রবধূর সশ্রদ্ধ নমস্কার যুক্ত করতে পারলেন না বালজাক। বোধ হয় তিনি সাহসই করেন নি ইভাকে বলতে যে, লেখ, আমার মাকে এক লাইন লিখে অভিনন্দন জানাও। ঐশ্বর্যাভিমানিনীকে আহত করতে চান নি, কি ভয় পেয়েছেন বুঝি বালজাক, পাছে দরিদ্র বুড়ী মাকে অভিনন্দন জানানোর প্রস্তাব সে ঠোঁট উল্টে ভ্রূকুঁচকে প্রত্যাখ্যান করে। অতএব স্ত্রীর হয়ে তিনি নিজেই কৈফিয়ৎ দিয়েছেন "তোমার বউয়ের হাতে বাত ধরেছে। কলম ধরতে কষ্ট, তাই ইচ্ছে সত্ত্বেও তোমাকে এক লাইন লিখতে পারল না। তুমি কিছু মনে করো না। হাত ভাল হলেই সে তোমাকে চিঠি লিখবে।"

কিন্তু যে সুখের খবর বালজাক এমন বড় গলা করে বন্ধু ও শুভানুধ্যায়ীদের জানিয়ে বেড়ালেন তার জন্যে যে তাঁকে কি মর্মান্তিক মূল্য দিতে হয়েছে তা যেন অতিবড় দুঃস্বপ্নেরও অগোচর ছিল। বিয়ে করেই বালজাক ব্যস্ত হয়ে উঠেছিলেন, ভের্ঝকোভানিয়ায় আর একদণ্ড না। আর একটি দিনও তিনি তার প্রিয়ার প্রাসাদ পাভিলিওঁ ব্যুজোঁকে শূন্য থাকতে দেবেন না। গৃহে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করতে চান তিনি এক্ষুনি।

'এই তুষার বৃষ্টির মধ্যে এ শরীর নিয়ে বেরোনো মারাত্মক হবে', বাধা দিতে চেয়েছেন ইভা।

বালজাক মাথা ঝাকিয়ে বলেছেন, "তুমি আপত্তি করো না ইভা, দেখো পারীর মাটিতে পা রাখতে না রাখতে আমি সুস্থ হয়ে উঠব, বল পাব শরীরে।"

পারীতে পা দিলেই তিনি সুস্থ হয়ে উঠবেন বল পাবেন শরীরে, মনের মধ্যে এ প্রত্যাশার প্রদীপ জ্বললেও মনের সবটুকু অন্ধকার তাতে করে যেন দূর হচ্ছিল না; মৃত্যুর কালো ছায়টা সে আলোর পটভূমিকায় বরং যেন আরও গাঢ় আরও ভয়ঙ্কর হয়ে কাঁপছিল।

"পারীর পথে শীগগিরই পা বাড়াচ্ছি", মাকে লিখলেন বালজাক, "কিন্তু কবে গিয়ে ঠিক পৌছব এখনই বলতে পারছিনে, ড্রেসডেন থেকে জানাব তারিখ, তখন তুমি ডেকরেটরকে ডেকে বাড়িখানাকে আলোয় পাতায় ফুলে মনের মতন করে সাজিয়ে রাখতে বলবে, আমার হৃদপিণ্ডের কষ্টটা আরও বেড়েছে, সঙ্গে ফুসফুসের দাহটাও। কয়েকদিন আগেও মনে হয়েছিল আমার রোগ আরোগ্যের পথে। কিন্তু এখন দেখছি ক্রমাগত অবনতি ঘটছে কেবল। এখন আবার এক নতুন উপসর্গ জুটেছে—চোখের সামনে সব সময় একটা কালো পর্দা ঝুলতে থাকে, কিছুই ভাল করে দেখতে পাই নে। দেখতে দেখতে অক্ষরগুলি সব ঝাপসা হয়ে আসে। এই প্রথম আমি কলম বন্ধ করে হতাশায় ডুবছি। আর বুঝি কিছু লিখতে পারব না।"...

এবারও কি তাঁর স্ত্রী ইভা দ্য বালজাক, তাঁকে সাহায্য করতে আসবেন না, অন্তত একটা চিঠি লিখে সাহায্য করতে? না, সে রমণী তখনও নিস্পৃহ।

বালজাক অতি কষ্টে পত্র শেষ করেন, "আমার বউয়ের এখন এমন এক মুহূর্ত সময় নেই যে এক লাইন পত্রও লেখে। তাছাড়া তার সেই হাতের বাত—সে আরও বেড়ে গিয়ে সারা হাতটা দখল করে বসেছে।"

কয়েক দিন পরে আবার বালজাক মাকে লিখছেন,

"...মা, অন্ধের মতন চিঠি লিখছি, আন্দাজে ধরে ধরে; অক্ষরগুলো একটাও দেখতে পাচ্ছি না। চোখের সামনে ধূপছায়া অন্ধকার, না পারি লিখতে না পারি পড়তে।..."

বোন লোর তখন অসুস্থ বিছানায় পড়ে আছে, তাকে নানা সান্ত্বনা দিয়ে চিঠি লিখতে লিখতে নিজের কথায় এসে জানাচ্ছেন,

..."আমি বড় ভাল নেই। ফুসফুস আর হৃদপিণ্ড থেকে থেকেই বেঁকে বসছে। বড় কষ্ট। মাঝে মাঝে দম বন্ধ হয়ে আসছে। না পারি কথা বলতে, না পারি এক পা হাঁটতে।"

তবু তখনই কেন তিনি পারী রওনা হলেন? ইউক্রেনের আকাশ জুড়ে মেঘের

মেলা। মাঝে মাঝে ঝড় উঠছে। তুষার ঝরছে কেবল। বুঝি মহাকালের ডাক শুনেছে বালজাকের অন্তরাত্মা। দেশের মাটিতে দেহ রাখতে ডাকছে তাঁকে মহাকাল; তাই তিনি আর একদণ্ডও ভের্ঝকোভানিয়ায় থাকতে চাইছেন না। যে দুর্যোগে দুরন্ত যৌবনও পারতপক্ষে ঘরের বার হতে চায় না বালজাক তারই মধ্যে বেরিয়ে পড়তে বদ্ধপরিকর অথচ তাঁর যে শরীরের অবস্থা বিছানা থেকে নামাও তাঁর পক্ষে বিপজ্জনক।

একগুঁয়ে মানুষটার সঙ্গে যুঝে উঠতে না পেরে ইভা অগত্যা রাজী হলেন।

১১ মে ড্রেসডেনে পেঁাছে বালজাক তাঁর বোনকে লিখছেন,

"ছ'দিনের পথ একমাসে এসেছি। একবার দুবার না, কমছে কম একশ' বার আমাদের গাড়ি ভয়ংকর গাড্ডায় পড়েছে। কখনো কখনো পনের ষোল জন লোক লেগেছে গাড়িকে সে গাড্ডা থেকে তুলতে। এই করে যাহোক শেষ পর্যন্ত আমরা ড্রেসডেন অব্দি পেঁাছেছি। এবং এখনও ধড়ে প্রাণ টিকে আছে। অবসাদ আর ক্লান্তির চূড়ান্ত অবস্থা আমাদের। পথ যেন আমাদের দশ বছরের আয়ু কেড়ে নিয়েছে। কে কার কোলে মাথা রেখে মরব যেন এ ভয়েই আমরা সন্ত্রস্ত হয়ে আছি। ভালবাসা খুব প্রবল হলেই বুঝি এ ভাবনা হয় মানুষের।"

মাকে লিখেছেন

"...মা আমার অবস্থা যারপর নাই শোচনীয়। এই ভয়াবহ পথ আমার অসুখকে আরও সাংঘাতিক করে তুলেছে।"

এমন যে সাংঘাতিক অবস্থা বালজাকের, তবু প্রত্যেকখানা চিঠি তাঁকে নিজের হাতে লিখতে হচ্ছে। চোখ বুজে থেকে, চোখ মুছে নিয়ে, ঝাপসা দৃষ্টি সাফ করতে করতে অনেকক্ষণে এক একখানা চিঠি লেখেন বালজাক আর কৈফিয়ৎ দেন, "এই ঠাণ্ডায় ইভার হাতের বাতটা আরও বেশী চাগিয়ে উঠেছে। ওঁর পক্ষে কলম ধরাই শক্ত হয়ে উঠেছে এখন।"

বালজাক যখন রোগ শয্যায় শুয়ে শুয়ে এ সব কথা বানিয়ে বানিয়ে লিখছেন, ইভা তখন ড্রেসডেনের রাজপথে মণিমুক্তোর দোকান চুঁড়ে বেড়াচ্ছেন আর গুচ্ছের গহনা কিনছেন। একটা পঞ্চাশ হাজার ফ্রাঁতে কেনা মুক্তোর হার যে কী সুন্দর আর দুর্লভ কারিগরিতে অপূর্ব, মেয়েকে তাই ইনিয়ে বিনিয়ে লিখতে পাঁচ পাতা ব্যয় করে ফেলেছেন। সে চিঠিতে তাঁর যে হাতে বাত তার এতটুকু আভাস নেই।

ইভা যখন সোজেগুজে ড্রেসডেনের রাজপথ আলো করে বেড়াচ্ছেন, বালজাক তখন হোটেলে রোগশয্যায় কাতর—কাতরাচ্ছেন।

বালজাকের একজন জীবনীকার, চার্লস গোরহাম, কোন্‌সূত্রে জেনেছেন জানি না, লিখেছেন বালজাকের অবস্থা দেখে ব্যস্ত হয়ে হোটেলের ম্যানেজার একদিন বললেন "মাদাম, আপনার স্বামী বড্ড অসুস্থ মনে হচ্ছে, আমার জানাশোনা ভাল জর্মন ডাক্তার আছে, ডাকব ?"

মাদাম জবাব দিলেন, "বড় বড় জর্মন ডাক্তারই ওঁর চিকিৎসা করছেন। তাঁদের প্রেসক্রপশন-এর ওষুধই খাচ্ছেন তিনি। আমার স্বামীর ব্যাপারে নাক গলাতে এসো না। নিজের কাজ দেখ।"

নিঃসন্দেহে ব্যাপারটা হৃদয়বিদারক। এর থেকে অনুমান করা শক্ত নয়, ইভার মনের মধ্যে বালজাকের প্রতি বীতস্পৃহা স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল, কিন্তু তখনও সে বীতস্পৃহা ছাপিয়ে মাঝে মাঝে সহানুভূতি জেগে উঠত। মেয়েকে তখন লিখতেন, এবং বালজাকের বদলে ল্য বোঁ (আমার ভাল লোকটি) শের আমি (আমার প্রিয় বন্ধু) প্রভৃতি মধুর সম্বোধনগুলি ছড়িয়ে থাকত তার মধ্যে। লিখতেন,

"বিলবোকে বড় অসুস্থ, ওর জন্যে দুঃখ হয় কষ্ট হয়।"

কিন্তু বালজাকের জন্যে ইভার এই দুঃখ বোধ কষ্ট অনুভব ছিল সাময়িক অথবা আন্তরিক হলেও অধিকাংশ সময়ই মাথা চাড়া দিয়ে থাকত একটা বিরক্তি একটা অপ্রসন্নতা।

ড্রসডেনেই তাঁদের মতের অনৈক্যটা খুব প্রকট হয়ে উঠেছিল। ইভা যে বালজাকের মাকে, আসলে তাঁর পরিবারের কাউকেই বরদাস্ত করতে চান না, কোন দিনই চান নি, সে কথাটা বালজাকের চিঠিতে এবার আর গোপন থাকল না। হাতে বাত না ধরলেও যে বউ তাদের চিঠি লিখে প্রীতি জানাত না এবার মা আর বোন সেইটে জেনে গেল। বউ সম্পর্কে তাদের সংশয় সন্দেহ সত্য বলে প্রমাণ হল। পৌছনোর দিন তারিখ জানিয়ে বালজাক তাঁর বোনকে লিখলেন,

"তোমার ওপরেই ভরসা করে আছি বোন, আমরা যখন আমাদের পাভিলিওঁ ব্যুজোঁতে এসে পৌছব দেখো যেন তখন মা সেখানে না থাকে। তুমি তাকে বুঝিয়ে সুজিয়ে তোমার কাছে নিয়ে এসো।'

বালজাকের যেন ভয় ইভা তাঁর মাকে ঝি মনে করবে, তার সঙ্গে ঝিয়ের মতন ব্যবহার করবে, কি তার উপস্থিতিকে গ্রাহ্য করবে না, শাশুড়ী বলেই স্বীকার করবে না তাঁকে। মায়ের অসম্মান সম্পর্কে এখন এত সচেতন বালজাক। অথচ জীবনের

শুরু থেকে এই মাকে তিনি শুধু ঘৃণাই করে এসেছেন, এই মায়ের জন্যেই যে তাঁর জীবনের যত কষ্ট বালজাক তা ভুলতে পারেন নি কখনো, যদিও মাঝে মাঝে অভাবের তাড়নায় হাত পাততে হয়েছে তাঁর কাছে, ঋণ নিতে হয়েছে তাঁর থেকে এবং আজ অবধি সে ঋণের সামান্যই তিনি শোধ দিতে পেরেছেন। ইভা জানে সব। মায়ের সম্পর্কে বালজাক তাঁর মনোভাব কথনো ইভার কাছে গোপন করেন নি। আসলে মায়ের প্রতি বিমুখ মনোভাব বালজাকই কি ইভার মনে তৈরি করেন নি? অথচ আজ ইভার কাছে মা অসম্মানিত হবে ভেবে তাঁর কী অস্বস্তি!

মেয়ের কাছে লেখা এই চিঠি পড়ে মা বেদনার দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। স্বাভাবিক। বালজাকের অনুপস্থিতিতে মাসের পর মাস তিনি সতর্ক চোখে ছেলের বাড়ি আর বাড়ির ঐশ্বর্য পাহারা দিয়েছেন। ছেলের ঝি চাকর সামলেছেন। বাড়ির পিছনে জন-খাটানোর হিসেবপত্র রেখেছেন। অবশ্য তিনি মনে মনে জানতেন, ধনী রুশ রূপসী পুত্রবধু বাড়ি এসে উঠবার পূর্ব মুহূর্তে তাঁকে বাড়ি ছেড়ে চলে যেতে হবে। মেয়ের কাছে লেখা ছেলের চিঠি পড়ে তিনি নিঃসন্দেহ হলেন এবার। তাঁর তথন আর একটি কাজ মাত্র বাকি। ডেকরেটরকে ডেকে পাঠাতে হবে। পুত্রের শেষ ইচ্ছা অনুযায়ী ফুলে পাতায় আলোর মালায় সাজাতে হবে বাড়ি। পুষ্প-সজ্জা আলোক-সজ্জা মনের মতন হল কিনা দাঁড়িয়ে থেকে দেখতে হবে। তারপর আর কিছু করণীয় নেই। তারপর তিনি নিঃশব্দে সদর বন্ধ করে মেয়ের কাছে চলে যাবেন। ঝি, জাবেলাকে ছাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে, বাড়িতে থাকবে একমাত্র ফ্রাঁসোআ। জাবেলা চলে যাওয়ার পর ফ্রাঁসোআর কেমন যেন একটু মতিচ্ছন্ন ভাব, তা হোক তবু বালজাকের বহুদিনের বিশ্বস্ত চাকর সে। নববধূকে নিয়ে ছেলে যখন গাড়ি থেকে দরজার সামনে নামবে ফ্রাঁসোআ একাই দরজা খুলে তাদের অভ্যর্থনা করতে পারবে, করবে। আর কারোর উপস্থিত থাকার দরকার নেই। উপস্থিত আর থাকতে যাচ্ছেই বা কে! মাকে ত বালজাক আগে থেকেই বিদায় হতে বলেছেন।

তিনি চলে যাচ্ছেন। বাড়ির ভিত থেকে ছাদ আলোর মালায় জ্বলজ্বল করবে। বাহারী ফুলে পাতায় ঝকমক করবে চারধার। ডিভান পালঙ্ক চেয়ার ডেস্ক আলমারি, শোভন আরো বিবিধ সামগ্রী থাকবে যথাস্থানে সাজানো—সব সমস্ত থাকবে, কেবল থাকবে না বৃদ্ধা মা, কেবল তারই স্থান হবে না এই প্রাসাদ-পুরীতে। মা তাই ফ্রাঁসোআকে সব বুঝিয়ে সুজিয়ে নীরবে গিয়ে বাস ধরলেন।

বালজাকের জীবন নিয়ে নিয়তির নাটক শেষ অঙ্কে এইভাবে জমে উঠল। নিয়তির মতন নিপুণ নাট্যকার নেই; অন্তত বালজাকের জীবন নিয়ে নিয়তি যে কাণ্ডটা করল তার তুলনা হয় না। অথবা পৃথিবীতে কেউ কেউ যেন এমন দুর্ভাগ্য নিয়েই জন্মায়—সারা জীবনে যত অলৌকিক প্রতিভার কর্মই তুমি কর না কেন, জীবনে তিলেকের জন্যে সুখী হবে না, ভাগ্য বিধাতা যেন আঁতুড়েই এ কথা লিখে দেন কারো কারো কপালে। সেই একটি কপাল বালজাকের। এত করেও মানুষটির ভাগ্যে সুখ জুটল না।

সত্তরটা বছরের ধ্যান ও স্বপ্ন নিয়ে যে-দূর নক্ষত্রের দিকে তাকিয়ে তিনি এতগুলি বছর নতজানু হয়ে প্রেম ভিক্ষা করেছেন, আজ তাকে বুকের মধ্যে পেয়েও কি হেনস্তা দেখুন। শেষ পথটুকু তাঁরা এলেন রেলে চড়ে। ট্রেন ছিল ভয়ানক লেট। স্টেশন থেকে তারা যখন ঘোড়ার গাড়িতে করে পাভিলিওঁ ব্যজেঁাতে এলেন তখন মধ্য রাত্রি কি রাত্রির তৃতীয় প্রহর।

সারা পথ বালজাক মনের মধ্যে প্রচণ্ড অস্থির হয়েছিলেন; তাঁর নির্দেশ ছিল, আগাগোড়া বাড়িটা হবে আলোর মালায় আর ফুলের বোকেতে সুদর্শন; আর সে সুদর্শন বাড়ির সদরে দাঁড়িয়ে থাকবে তার বিশ্বস্ত ভৃত্য ফ্রাঁসোআ, এক হাতে থাকবে তার মোমবাতির ঝাড়লণ্ঠন আর একহাতে ফুলের তোড়া।

এই দৃশ্য দেখতে উৎকণ্ঠিত বালজাককে আর তাঁর নবপরিণিতা বধূকে নিয়ে ঘোড়ার গাড়ি এসে দাঁড়ালো পাভিলিওঁ ব্যজেঁার দরজায়। তখন আলোয় আর ফুলে সেজে বাড়ি খানা যেন সত্যি খুশীতে হাসছিল। প্রথম লহমায় আশ্বস্ত বালজাক উৎকণ্ঠা থেকে উত্তীর্ণ হয়ে স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়লেন; নিঃশ্বাস পড়তে না পড়তে আবার উৎকণ্ঠায় শ্বাসরুদ্ধ হয়ে এল তাঁর। ফ্রাঁসোআ কোথায়? জলন্ত ঝাড়লণ্ঠন আর ফুলের তোড়া হাতে তার যে দরজায় অপেক্ষা করার কথা! বালজাক দরজার ঘণ্টা বাজালেন। কেউ এসে দরজা খুলে দাঁড়াল না। বারবার ঘণ্টা বাজাতে থাকলেন বালজাক কিন্তু নিঃশব্দ নির্জন পুরীর কোন কোথাও থেকে একটা পিন পড়ার শব্দও শুনতে পেলেন না তিনি। ইতিমধ্যে কৌতুহলী কিছু প্রতিবেশী এসে ঘিরে দাঁড়িয়েছে তাঁদের। তাদের মধ্যে কেউ বলতে পারল না কেন বাড়ির ভিতর থেকে সাড়া আসছে না। বাড়িতে লোক আছে কিনা তাই কেউ বলতে পারল না। তখন কোচমান ছুটল চাবিওলা খুঁজতে। কোথা থেকে একজনকে ধরে নিয়ে এল সে। তার অনেক কারসাজির পরে দরজা খুলতে পারা গেল।

কিন্তু বন্ধ দরজার ওপাশে যে এমন মর্মান্তিক অভ্যর্থনা অপেক্ষা করছে এ বালজাকের নিষ্ঠুর নিয়তি ছাড়া আর কারো জানার কথা নয়।

দরজা খুলতেই সামনে দেখেন ফ্রাঁসোআ। তার এক হাতে ঝাড় লণ্ঠন আর এক হাতে ফুলের তোড়া। কিন্তু মানুষটা সম্পূর্ণ নগ্ন। তার চোখে উন্মাদের দৃষ্টি। বালজাককে দেখেই চিৎকার করে উঠল সে—"আসুন আসুন আলোর সমারোহ দেখুন, ফুলের বাহার দেখুন আপনাদের অভ্যর্থনা করতে এতটুকু অসম্পূর্ণ রাখিনি।" বলে সে ঝাড় লণ্ঠন ফুলের তোড়া দূরে রেখে বালজাকের পায়ের উপরে পড়ে হাউ হাউ করে কাঁদতে থাকল। বালজাক-জীবনীকার আন্দ্রে মোরো বলেন, প্রেমিকা জাবেলার বিরহেই নাকি শেষমেশ ফ্রাঁসোআ পাগল হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু নিয়তির কৌতুক কি নির্মম, এতকালের বিশ্বস্ত মানুষটির বোধ-বুদ্ধি নিঃশেষে হরণ করে নেবার উপযুক্ত সময়ই বেছে নিয়েছিল সে।

প্রতিবেশীদের সাহায্যে অনেক হাঙ্গামার পর সে বদ্ধ উন্মাদকে বেঁধেছেঁদে বাড়ি থেকে পাচার করে তবে বালজাক তাঁর ধ্যানের ধন প্রাণের মানুষটিকে তাঁর মর্ত্যের স্বর্গে এনে তুললেন।

"অবশেষে আমরা এলাম," প্রায়ান্ধ বালজাক চোখ বিস্ফারিত করে চারদিক দেখতে দেখতে বললেন, "অবশেষে আমার স্বপ্ন সত্যি হল।" রোগে অবসন্ন, পথের ধকলে রুদ্ধশ্বাস, বালজাক চোখ বুজে একটা কৌচের ওপর বসে পড়লেন এসে। তাঁর বুকের বাতাস সম্পূর্ণ নিংড়ে নিয়ে একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল।

সতর

বালজাকের যত দূর দুর্লভ স্বপ্ন কেবল সার্থক হয়েছে তাঁর বইতে ; বিষয় নির্বাচনে ও তার বিন্যাস শৈলীতে সমকালকে অতিক্রম করে এবং চিরকালকে স্পর্শ করে তিনি তাঁর স্পর্ধার সঙ্কল্প সম্পন্ন করেছেন। কিন্তু জীবন থেকে গেছে নিস্ফল। মরুভূমি। যতদূর চোখ যায় ঊষর প্রান্তর। আনন্দের দু' একটা ফুল প্রীতির দু' একটা প্রজাপতি চোখে যদি বা পড়ে থাকে সে কেবল সুখের মুখোশ-পরা দুঃখের ছলনা—বারে বারে মুখোশ খুলে ভ্রুকুটি করেছে তাঁকে, উপহাস করেছে, যন্ত্রণা দিয়েছে। অবশেষে বড় আশা ছিল সর্বস্ব পণ করে তিনি যে নীড় নির্মাণ করলেন, সতর বছর প্রার্থনার পর যাকে তিনি লাভ করলেন তাকে বুকে করে বুকে রেখে সেই নীড়ে সকল কষ্টের শেষে এবার তিনি সুখী হবেন। আরও পঁচিশটা বছর সুস্থ দেহে নিরুদ্বিগ্ন মনে বেঁচে থাকবেন। নিবিষ্ট নিশ্চিন্ত মনে বসে লিখবেন কমেদি য়ুমেন-এর অবশিষ্ট পঞ্চাশটা খণ্ড। যখন সেই সব সমস্ত পরিকল্পনা সম্পূর্ণ হল, তখন সেই নীড়ে সেই প্রিয়াসান্নিধ্যে তিনি এলেন কেবল রোগ-শয্যায় শুয়ে মৃত্যুর পদধ্বনি শুনতে।

এক মহান প্রতিভার এই অকাল মৃত্যু-শয্যা গ্রহণের জন্যে বালজাকের আবাল্য চিকিৎসক ও বন্ধু ডাঃ নাকোয়ার্ত দায়ী করতেন ইভা দ্য হানস্কাকে। বালজাককে নাকোয়ার্ত পইপই করে বারণ করেছেন, "এমন অমানুষিক খাটুনি খেটো না নোরে, শরীরের ওপরে এত অত্যাচার সইবে না, সইবে না।" বালজাক কান দেন নি সে কথায়, গ্রাহ্য করেন নি। হীনবংশজাত দরিদ্র চিরঋণী বালজাক বিখ্যাত বংশের একজন অভিজাত ধনী বিদুষীকে জয় করতে চেয়েছিলেন তাঁর প্রতিভার ঐশ্বর্যে। ইভা যত দুর্লভ হয়ে উঠেছেন তত দুশ্চর হয়েছে তাঁর তপস্যা। ইভা যত বিমুখ বিতৃষ্ণ হয়েছেন তত অবনত হয়েছেন বালজাক। এই কুহকিনী সুন্দরী কখনো বর্ষার নদীর মতন কূলছাপানো ভালবাসায় প্লাবিত করে দিয়েছেন বালজাককে, কখনো অবহেলার বালুচরে ফেলে রেখে শীতের শীর্ণ নদীর মতন নিরাসক্ত শীতল হয়ে দূরে সরে থেকেছেন। কখনো বালজাক সম্পর্কে এমন উচ্ছ্বসিত উদ্‌ভ্রান্ত হ'য়ে উঠেছেন যেন বালজাক তাঁর জীবন-দেবতা, তিনি তাঁর প্রণতা পূজারিণী। কখনো এমন উদ্ধত ভ্রুকুটি কুটিল ভঙ্গী করেছেন যেন তিনি সম্রাজ্ঞী, আর বালজাক তাঁর পদতলে আনত ক্রীতদাস। বিয়ে করবেন প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন কিন্তু সে প্রতিশ্রুতি রক্ষার জন্যে আন্তরিক হওয়ার প্রয়োজন তিনি কখনো অনুভব করেন নি। বিয়ে করবেন না এমন কথা যেমন তিনি কখনো উচ্চারণ করেন নি, তেমনি কবে বিয়ে

হবে তার নিশ্চিত কোন সময় কখনো নির্দিষ্ট করতেও চান নি। সতরটা বছর এই অনিশ্চয়তার তুষের আগুনে দগ্ধ করেছেন তিনি বালজাককে। চিরদিনের জন্যে যেমন কখনো তাঁকে বুকের ঘনিষ্ঠ করেন নি, তেমনি চিরদিনের জন্যে তাঁকে একেবারে দূরে সরে যেতেও দেন নি—এমনই এক নিষ্ঠুর প্রেমের খেলার সামগ্রী হয়ে বালজাক মর্মে মর্মে ক্ষতবিক্ষত হয়েছেন আর তিলে তিলে নিঃশব্দে আত্মহননের পথে এগিয়ে গিয়েছেন। আজ সে পথের শেষ প্রান্তে এসে মৃত্যুর ধূসর ছায়ার মধ্যে শুয়ে শুয়ে আত্মনাশের বদলে দীপ্ত মহিমায় পুনরায় আত্মপ্রকাশের আকুল প্রার্থনায় দিন দিন অস্থির অসহিষ্ণু হচ্ছেন বালজাক।

কিন্তু নিয়তি কেন বাধ্যতে। তুরস্কে এক প্রবাদ আছে, "বাড়ি তৈরি শেষ হলে মৃত্যু এসে ঢোকে।" বালজাকের বেলায় সে প্রবাদই অক্ষরে অক্ষরে সত্য হল : প্রিয়াকে নিয়ে গৃহ-প্রবেশ করলেন বালজাক আর মৃত্যু এসে তাঁর সঙ্গে সঙ্গে প্রবেশ করল সেখানে।

অজস্র বইয়ের সুন্দর সুসজ্জিত লাইব্রেরি, মূল্যবান কাঠের কারুকার্য করা সুদৃশ্য আলমারি-আলনা-টেবিল-চেয়ার, বহুশাখ মোমদানি, উৎকৃষ্ট পালকের মসৃণ কলম, মৃদু নীল রংয়ের দামী লিখবার কাগজ সব প্রস্তুত—এখানে বসে তিনি সম্পূর্ণ করবেন তাঁর জীবনের প্রতিশ্রুতি 'কমেদি যুমেন'। শ'খানেক খণ্ড লেখা হয়ে গেছে, আরও পঞ্চাশ খণ্ডের পরিকল্পনা তাঁর মাথার ভিতর। কলম ধরতে পারলে আর দ্বিধা দুশ্চিন্তা করতে হবে না। পরিণত প্রজ্ঞার রচনা স্বতঃই কলমের মুখে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠবে। কিন্তু বিধাতা বিরূপ। তার একটি লাইনও বালজাক কাগজের ওপরে কালির আঁচড়ে উপস্থিত করতে পারলেন না। চোখের সামনে অন্ধকারের পর্দা ক্রমশ ভারি হয়ে উঠছে। উঠতে উঠতে পৃথিবীর সবটুকু আলো কেড়ে নিয়েছে তাঁর চোখ থেকে। অন্ধ। বালজাক শেষমেশ অন্ধ হয়ে গেলেন।

রু ফরতুনে থেকে বালজাকের নিজের হাতে স্বাক্ষর করা একখানি চিঠিই মাত্র উত্তর কালের ভাণ্ডারে জমা আছে। সে চিঠি তেওফিল গোতিএকে লেখা।

প্রাচীন দুর্লভ চমৎকারিত্বের স্মারক সংগ্রহের নেশা বিদেশে বেরোলেই যেন আরও বেশী করে পেয়ে বসত বালজাককে। ড্রেসডেনে তখন তাঁর কী অসুখ, কী অসুখ, তবু তারই মধ্যে একটু খোলা হাওয়ায় ঘুরবার আবদার ধরে যখনই তিনি বাইরে বেরোতে পেরেছেন, যা চোখে লেগেছে মনে ধরেছে কিনেছেন। ড্রেসডেন থেকে বাক্স বোঝাই হয়ে এসে সেগুলি পারীর কাসটমস্ হাউসে কিছু দিন থেকে পড়েছিল। যাঁর বিছানা থেকে নামা বারণ ; যাঁর বিছানায় উঠে বসা পর্যন্ত নিষেধ ;

সব সময় যাঁর বিছানায় শুয়ে থাকার কথা, তিনি গেছেন ইভার কাঁধে ভর করে তাঁর ব্রুহামে চড়ে কাসটমস্ হাউসে—বিল অব লেডিংএ সই করে মালগুলি খালাস করে আনবেন। এতে প্রাণ দেহ ছাড়ে ছাড়ুক, তিনি কিছুতেই তাঁর শখের সামগ্রী হাত ছাড়া হতে দেবেন না, এমনই মমতা সেগুলির জন্যে তাঁর।

সেদিন ১৯শে জুলাই। গোতিএ অনেক দিনের জন্যে ইতালি যাচ্ছেন, যাওয়ার আগে বন্ধু বালজাকের সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন, এসে শুনলেন বালজাক বাড়ি নেই। তিনি ফিরে গেলেন। বাড়ি ফিরে এসে সে খবর শুনে বালজাকের আপসোসের আর অন্ত থাকল না। তিনি তক্ষুনি ইভাকে তাগিদে তাগিদে অস্থির করে চিঠি লেখাতে বসালেন। নাও চিঠির কাগজ নাও, লেখ:

"গোতিএ, আমি একটুক্ষণের জন্যে বাইরে গিয়েছিলাম সত্যি, তাই বলে যেন মনে করো না, আমি সুস্থ হয়ে উঠেছি। আমি আজও আগেকার মতই অসুস্থ শয্যাগত। নিজেকে অনেক কষ্টে হিঁচড়ে টেনে নিয়ে গেছি কাসটমস্ হাউসে। ডাক্তারের নিষেধ মানি নি। সবাই বলছে আমি নাকি ভাল হয়ে উঠব; কিন্তু এখন যে আমি জীবন্মৃত হয়ে আছি সে তুমি দেখলে বুঝতে। আমাকে কথা বলতে দেয় না। আমার নড়াচড়া বারণ।... ..."

ইভা চিঠিখানা লিখে দিলে অন্ধ বালজাক অতিকষ্টে তার তলায় একটা লাইন লিখলেন, "আমি অন্ধ। আমি আর এখন পড়তেও পারিনে, লিখতেও পারিনে।" এবং এই তাঁর শেষ রচনা।

পরম যত্নে নানা দেশ থেকে সংগ্রহ করে তিনি তাঁর পাভিইওঁ ব্যুজোঁর সুদর্শন লাইব্রেরি মূল্যবান করেছিলেন; কিন্তু তার একখানা বইয়েরও তিনি পাতা উলটে দেখতে পারেন নি; পারীশিয়ান বুদ্ধিজীবীদের নিয়ে আড্ডা মারবেন বলে সোনালী বুঁটিদার বনাতে মোড়া ড্রইং রুম করেছিলেন, কোন দিন সে ঘরে এসে আর বসতে পারেন নি তিনি। একদিনের জন্যেও পারীর সম্ভ্রান্তদের মজলিস বসে নি সে ঘরে।

বালজাকের সব প্রিয় আকর্ষণ ছিল তাঁর ছবির গ্যালারি। সমকাল ও পূর্বকালের প্রতিভাধর কলাকারদের উৎকৃষ্ট চিত্রের সংগ্রহ ছিল সে গ্যালারিতে। তাঁর শিল্প-রুচি ও শিল্প-জ্ঞানের প্রমাণ সংগ্রহ করেছিলেন বালজাক। তিনি একদা তাঁর এক বন্ধুকে অহঙ্কার করে বলেছিলেন, "শিল্প সংগ্রহের ব্যাপারে আমার মতন সূক্ষ্ম দৃষ্টির উচ্চকলা রসিক আর কাউকে দেখেছ কখনো?"

বড় সাধ ছিল বালজাকের, লেখক, সম্পাদক, রসিক মানুষদের ডেকে এনে তিনি তাঁর গ্যালারি দেখাবেন। তাঁদের কাছে চিত্রকলার সূক্ষ্ম তাৎপর্য ব্যাখ্যা করে

তাঁর সেই উন্নত শিল্প রসানুরাগের পরিচয় দেবেন। কিন্তু কিছুই তিনি পারলেন না। অমিয় সাগরে আকণ্ঠ নিমজ্জিত হয়ে অবগাহনের যখন সুযোগ এল, দেখা গেল অমৃত নেই, সে-সাগর অথৈ গরলে ভরে উঠেছে। মৃত্যুর নির্মম বিষ নীল করে দিয়েছে উজ্জ্বল উদ্‌ভাসিত রৌদ্রের জীবন।

ভিকতর য়ুগো একদিন বালজাকের পাভিইওঁ ব্যুজোঁ দেখতে এলে নৈরাশ্যে নিবস্ত বালজাক চোখের জলে ডুবন্ত গলায় বউকে বলেছিলেন ; "আমার বন্ধুকে বাড়িটা ঘুরে ঘুরে দেখাও।"

বালজাক স্বপ্ন দেখেছিলেন প্রাসাদের, সে হয়ে উঠল তাঁর কারাগার।

মস্ত বড় বাড়িতে বালজাক একা। রোগ শয্যায় নিঃসঙ্গ। মাঝে মাঝে লাজুক ছায়ার মতন মা এসে পাশে দাঁড়ান। হতভাগ্য সন্তানের যন্ত্রণার মুহূর্তগুলি দেখেন। এটা-ওটা এগিয়ে দেন। কাছে বসেন। তারপর আবার তেমনি নিঃশব্দ-ছায়ার মতন চলে যান। মেয়ের বাড়ি থেকে নিত্য ছুটে এসে দেখতে পারেন না। বৃদ্ধা মায়ের সে-কষ্টের সাক্ষী শুধু রুগ্ন মেয়ে লোর। কিন্তু সেদিন অনেকেই জানত ইভা দ্য বালজাক কী নিদারুণ নিস্পৃহ ছিলেন বালজাকের প্রতি।

মেয়েকে লেখা ইভার চিঠিতেই তার প্রমাণ রয়েছে। তিনি বিরক্ত অপ্রসন্ন মনে চিঠি লিখেছেন, "নোরে যেহেতু এখন আর চোখে দেখতে পায় না, ওর চিঠিপত্র সব এখন আমাকেই লিখতে হয়। ও বলে আমি লিখি। ওর চিঠিপত্র লেখা, সংসার দেখা, আর ওর সেবার মধ্যেই আমার আজকাল দিনরাত্রি আবদ্ধ থাকতে হচ্ছে। ছোট্ট বাগানটাতে এসে যে হাঁপ ছেড়ে এক তিল বসব, সে সময় পাইনে। এখন বেগুনি লিলাক ফুটেছে, ল্যাবারনাম-এর সোনালী ফুল ঝরছে, সবুজ ঘাসে সোনার চুমকির মতন ছড়িয়ে আছে ফুলগুলি, তার মধ্যে ক্ষণকাল পায়চারি করব, ভবিষ্যতের মধ্যে ক্ষণকাল মনটাকে ডুবিয়ে একটু নিস্তার পাব তার উপায় নেই।"

এ পত্র থেকেই বোঝা যায় ভের্ঝকোভানিয়ার মুক্ত পাখি যেন পাভিইওঁ ব্যুজোঁর সোনার খাঁচায় বন্দী হয়েছেন। তিনি মুক্তি চাইছেন। ভবিষ্যৎ খুঁজছেন। অতএব শাশুড়ীকে ডেকে বললেন, "আপনি ত মাঝে মাঝেই ছেলেকে দেখতে আসছেন, এখন থেকে এখানেই বরং থেকে যান। একজন নার্স রয়েছে, আপনিও থাকুন, দু'জনে মিলে দেখাশোনা করুন ওঁর। বলে মর্যাদা সচেতন ইভা তক্ষুনি যোগ করলেন, "তবে হাঁ, মনে করবেন না যেন আমি আমার দায়িত্ব বইতে চাইছি না। আসলে নার্স করার অভ্যাস নেই বলেই আমি আপনার সাহায্য চাইছি।"

:"তাই বটে, রাজকন্যা ঝিয়ের কাজ করবে তাই বা কে আশা করে!" দাঁতে দাঁত চেপে পঁচাত্তর বছরের বৃদ্ধা সাল্‌ঁাবিএ জবাব দিলেন।

:"আমি রাজকন্যা নই, একজন সামান্য কাউনটেস।" স্বরে উষ্মা ছড়িয়ে জবাব দিলেন ইভা।

সাল্‌ঁাবিএ-র দু' কাঁধ নড়ে উঠল। তিনি শীতল চোখে পুত্রবধূর দিকে তাকালেন। উদ্ধত নিস্পৃহ বিলাসিনী রমণীকে দেখতে দেখতে তাঁর মনের ঘৃণা ঠোঁটে এসে চেপে বসল। ঠোঁট শক্ত হয়ে থাকল ক্ষণকাল। পরে আস্তে করে বললেন, "আমার ছেলেকে শেষ সময়ে আমি ছাড়া কে দেখবে? স্বাভাবিক।"

বালজাকের বোন লিখেছে, "বউদির সঙ্গে মা'র এই প্রথম সাক্ষাৎকার ও শেষ বাক্যালাপ। সেই যে ঘৃণায় মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিলেন দু'জনে তারপর আর একদিন কেবল দু'জনে মুখোমুখি হয়েছিলেন।"

সেবার দায় থেকে মুক্ত ইভা আর সময় নষ্ট করলেন না। বসন্তের রৌদ্রে মাজা বর্ণাঢ্য পারী তাঁকে হাত ছানি দিচ্ছিল, তিনি সর্বাঙ্গ মন সমর্পণ করে তাকে স্বাগত জানালেন। অবশ্য তখনও মনের মধ্যে কিছু কর্তব্যবোধ অবশিষ্ট ছিল: দিনান্তে একটিবার এসে দাঁড়াতেন রোগ শয্যার সামনে। অত্যন্ত যত্নে বালজাকের প্রতি তাঁর ঔদাসীন্য গোপন করে রাখতেন।

কিন্তু ক্রমশ সে উদাসীনতা গোপন করার আপাত চেষ্টাটুকুও আর থাকল না। বালজাকের ওপরে ইভা যে অত্যন্ত বিরূপ সকলের চোখেই তা স্পষ্ট হয়ে উঠতে থাকল।

অভিসারিণী ইভা অচিরেই পারী জয়ে আত্মনিয়োগ করলেন।

মানুষের মধ্যেকার দু'টি আদিম বাসনা যখন একসঙ্গে প্রবল হয়ে ওঠে এবং একজনের মধ্যে যখন সে দুই বাসনার তৃপ্তি অসম্ভব হয় তখন বুঝি ইভার দশাই হয় মানুষের। কুশলী কথাশিল্পী বালজাক তাঁর ক্ষুধিত হৃদয়ের আকুল ভাষায় ও প্রতিভায় ইভার দেহমনে যে বাসনায় পিপাসা জাগিয়েছিলেন তাকে তিনি তৃপ্ত করতে পারেন নি। তাঁর অকাল জরা তাঁকে অসময়ে পঙ্গু অক্ষম করে দিল। কিন্তু বালজাক পঙ্গু হলেন বলে ইভা তার অপূর্ণ পিপাসা নিয়ে উপবাসী থাকতে চাইলেন না, বুঝি থাকতে পারলেন না। দেহ ও মনের দুই নব জাগ্রত ক্ষুধা নিয়ে তিনি ঝাঁপিয়ে পড়লেন পারীর বুকে।

প্রায় পঞ্চাশ বছর বয়স ইভার। তখনও এই য়ুক্রেনবাসিনী পোল-নন্দিনী রীতিমত সুন্দরী। চিরদিনই তাঁর অভিজাত সৌন্দর্য চিত্তাকর্ষক ছিল; আজ এই বয়সে এসে কিঞ্চিৎ মেদ সঞ্চয় করেছেন। কিন্তু অটুট স্বাস্থ্যের শরীরে লাবণ্যের

অভাব ঘটেনি, সে সঙ্গে আছে একটি সোচ্চার যৌন-আবেদন। যার জন্যে অতি অনায়াসে তিনি পারীর রুশো-পোলিশ বাবু-সমাজের মধ্যমণি এবং মক্ষিরাণী হয়ে উঠতে পেরেছিলেন। ইতিমধ্যেই তাঁর রূপমুগ্ধ বিশ পঁচিশ জন ভক্ত জুটে গেছে। তাঁকে ঘিরে মাছির মতন গুনগুন করছে তারা।

চিরদিনই ইভার পোশাক আর গহনার শখ। সর্বাধুনিক ফ্যাশানের অন্ধ-ভক্ত এই রমণীকে হামেশাই বিখ্যাত পোশাক-ব্যবসায়ী আর জড়োয়া গহনার কারবারীদের শোরুমগুলিতে ঘুরতে দেখা যায়। তাঁকে দেখা যায় নাইট ক্লাবে, বিউটি পার্লারে, থিয়েটারে। সঙ্গে কামান্ধ কেউ না কেউ একজন থাকছে। তিনি জলের মতন টাকা খরচ করে যাচ্ছেন। নিবৃত্তিহীন ভোগের স্রোতে গা ভাসিয়ে চলেছেন তিনি। জীবনের পড়ন্ত বেলার শেষ সোনালী রোদটুকু তিনি মদের মতন পেয়ালা ভরে এক নিঃশ্বাসে পান করে ফেলতে ব্যস্ত, এতটুকু নষ্ট হতে দিতে, চলকে পড়ে যেতে দিতে তাঁর যেন সহ্য হচ্ছিল না। তাই আর কোন দিকে একবিন্দু ভ্রূক্ষেপ নেই তাঁর। পারীতে এসে সর্বাগ্রে তিনি একখানা ব্রুহাম কিনেছেন, তার জন্যে একজন কোচমানও রেখেছেন—ব্রুহামের ঘোড়া দুটো এসেছে খাস ইংল্যাণ্ড থেকে।

এভাবে বেপরোয়া ব্যসনের মধ্যে মগ্ন হয়ে যেতে যেতে বালজাকের, তাঁর প্রিয় বিলবোকের, অস্তিত্বও যেন ভুলে গেছেন ইভা। দিনান্তে একবার এসে মুমূর্ষুর শিয়রে দাঁড়াবার সামান্য সামাজিক সৌজন্যটুকুও আর নেই তখন। তিনি তখন জাঁ জিগুর সঙ্গে প্রণয়মত্ত। বালজাকের এককালের চেনা-পরিচিত এই শিল্পী বালজাককে দেখতে আসার ছুতোয় বাড়িতে ঢুকতেন কিন্তু অবসর কাটাতেন ইভার সঙ্গে। ঘরে এবং বাইরে অধিকাংশ সময়ই তাঁরা একসঙ্গে থাকছেন তখন। তখন ইভার ব্রুহাম টগবগিয়ে সারা পারী চষে ফিরছে তাঁদের নিয়ে। তাঁরা কখনো এসে নামছেন রেস্তোরার সামনে, কখনো ঢুকছেন থিয়েটারে কখনো ঘুরছেন পার্কে বুলভার-এ। ইভা এভাবে যখন পারীময় কলঙ্ক ছড়িয়ে বেড়াচ্ছেন, বালজাকের পরম ভাগ্য তিনি তখন এমনই অসুস্থ যে, কী যে কোথায় ঘটছে কিছুই তিনি জানছেন না। এমনকি জানছেন না যে, দিনে একটিবার মুহূর্তের তরেও ইভা এসে তাঁর শয্যাপার্শ্বে দাঁড়াচ্ছেন না।

সবাই বুঝে গেছে, বালজাক আর বাঁচবেন না; কিন্তু বালজাক তখনও বিশ্বাস হারান নি। মাঝে মাঝে যখন রোগের প্রকোপ একটু কমে আসে, শরীরে সামান্য বল বোধ করেন, দৃঢ়স্বরে বলেন, "দেখো ছ'মাসের মধ্যেই আমি একদম ভাল হয়ে গেছি। আমার বাবা আশি বছর বেঁচেছিলেন, আমি তার কমে মরছি না।"

একদিন জুলাই মাসে য়ুগো এলেন তাঁকে দেখতে। তাঁর হাত চেপে ধরে বালজাক বললেন, "তুমি ত জান য়ুগো, কী দীর্ঘায়ু পরিবারের ছেলে আমি, দেখো, আমি বাবার বয়স পাব তবে মরব।"

য়ুগো মাথা নেড়ে সায় দিয়েছেন ; কিন্তু অলক্ষ্যে জামার হাতায় চোখ মুছেছেন তিনি। ওই সময়েই একদিন অসুস্থ বোন এল দেখতে। বালজাক তার মাথায় মুখে হাত বুলিয়ে বুলিয়ে তাকে অনুভবে চিনতে চেষ্টা করলেন। হাঁটু পেতে বসে লোর তাঁকে জড়িয়ে ধরল। অনেক কষ্টে অস্পষ্ট স্বরে বালজাক ডাকলেন, "লোর্!"

দাদার একমাত্র শুভানুধ্যায়ী তাঁর সারা জীবনের কষ্ট ও সংগ্রামের সাক্ষী বালজাকের পরম আদরের ছোট বোনটি দাদার বুকে মাথা রেখে হাহাকার করে কেঁদে উঠল।

জুলাই মাসটা মন্দয় ভালয় কোন মতে কেটে গেল কিন্তু আগস্ট এল চরম সংকট নিয়ে। আগস্ট পড়তে না পড়তে বালজাকের অবস্থা দ্রুত অবনতির দিকে যেতে থাকল। সংজ্ঞাহীন পড়ে থাকেন তিনি। গা দিয়ে অনর্গল ঘাম বেরোয়। এ অবস্থার হঠাৎ পরিবর্তন ঘটল আগস্টের মাঝামাঝি এসে। হঠাৎই যেন তিনি অনেকটা সুস্থ হয়ে উঠলেন। তাঁর চোখে জ্যোতি ফিরে এল। স্পষ্ট স্বর ফুটল গলায়।

সেদিন সকাল। আগস্টের ১৮ তারিখ ডাঃ নাকোয়ার্ত ছিলেন বিছানার পাশে। চোখ চেয়েই বালজাক তাঁকে চিনতে পারলেন। আর চিনেই চিৎকার করে উঠলেন, "আমি তোমাকে দেখতে পাচ্ছি ডাক্তার, আমার চোখ ভাল হয়ে গেছে।" আর এ কথা বলতে পেরে, বলে ফেলে, তিনি আরও খুশি হলেন, "আমার স্বর-ভঙ্গ সেরে গেছে ডাক্তার, আমি কথা বলতে পারছি।" উৎসাহে তিনি উঠে বসতে চাইলেন। ডাক্তার বাধা দিলেন, শুইয়ে দিলেন তাঁকে। অবশ্য না দিলেও বালজাক উঠে বসতে পারতেন না, তাঁর উত্থান-শক্তি ছিল না।

"আমাকে শুইয়ে দিলে ডাক্তার, কিন্তু দেখো আমি আর বেশী দিন শুয়ে থাকছি না।..."

প্রবীণ অভিজ্ঞ চিকিৎসক ; তাঁর বুঝতে কিছু বাকি ছিল না। তিনি নিঃশব্দে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন।

বালজাক প্রবল বিশ্বাসে জ্বলে উঠে বললেন, "আমি কমেদি য়ুমেন শেষ করব, আমি উঠে বসব শিগ্‌গিরই। কিন্তু...."বলে তিনি দু'মুহূর্ত চুপ করে থাকলেন তারপর বিষণ্ণ গলায় বললেন, "বলত ডাক্তার আমি কী ততদিন বাঁচব ?"

নাকোয়ার্ত চুপ করে রইলেন।

"বল, তোমাকে বলতে হবে ডাক্তার, আমি জানতে চাই?" বালজাক উত্তেজিত হয়ে উঠলেন।

নাকোয়ার্ত তখন মৃদু হেসে প্রশ্ন করলেন, "কতদিন লাগবে শেষ করতে?"

"ছ'মাস, ছ'মাসেই শেষ করে ফেলব দেখো।"

বৃদ্ধ ডাক্তার মাথা নাড়লেন।

"কী তুমি আমাকে ছ'মাস সময় দিতে পারো না? বেশ তবে ছ' সপ্তাহ?"

ডাক্তার আবার মাথা নাড়লেন।

"ছ' সপ্তাহও না? বেশ তবে ছ'দিন। ছ'দিন সময় দাও। আমি আমার অবশিষ্ট বইগুলির একটা আউট লাইন করে রেখে যাব ছ'দিনে। আমার বন্ধুরা শেষ করবে—যুগো কিংবা গোতিএ।"

নাকোয়ার্ত তখনও মাথা নাড়লেন।

"তবে, কতক্ষণ আমি বেঁচে আছি, আর ক'দিন?" বালজাক এবার আকুল হয়ে প্রশ্ন করলেন।

"নোরে, তোমাকে আমি সেই জন্মকাল থেকে জানি। আমি তোমাকে মিথ্যে বলতে পারব না। তুমি…তুমি…তোমার পরমায়ু আর বড় জোর আজকের রাতটা।"

মহাকালের নির্দেশ যেন শুনলেন বালজাক—অমোঘ নির্মম।—"ছ'টা ঘণ্টাও না?" আর্তস্বরে চিৎকার করে উঠে হতাশায় ডুবে গেলেন তিনি। তাঁর মাথা বালিশের একপাশে এলিয়ে পড়ল। তাঁর হাত শিথিল হয়ে ঝুলে থাকল একধারে।

তিনি এতকাল জীবনকে কঠিন হাতে মুষ্টিবদ্ধ করে রেখেছিলেন। আজ যেন পরম অনীহায় মুঠো খুলে তাকে মুক্তি দিলেন।

বড় দুঃখ করে নাকোয়ার্ত তাঁর ডায়েরিতে লিখেছিলেন, "একমাত্র ঈশ্বর জানেন তাঁর অলিখিত বইগুলির যে আউট লাইন তিনি দিতে চেয়েছিলেন তা না রেখে আমরা কী মূল্যবান সম্পদ হারিয়েছি। যে আইডিয়া, যে ক্যারেকটার, যে থীম আর তিনি লিখতে পারলেন না, তার কিছুই আমরা রাখতে পারলাম না, জানতে পারলাম না।"

ডাঃ নাকোয়ার্ত-এর সঙ্গে উত্তর কালের সকল সাহিত্যরসিকই কণ্ঠ মিলিয়েছেন, মিলাবেন। বালজাক তাঁর পরিকল্পনার সম্পূর্ণরূপ দিয়ে যেতে পারেন নি; কিন্তু যতখানি তিনি দিতে পেরেছেন তাও নিঃসন্দেহে জগৎ ও জীবন সম্পর্কে বিরাট এক স্বর্ণখনি। আমরা সে-খনির সবটুকু সোনা আজও উদ্ধার করতে পারি নি। আজও তাঁর বিপুল সৃষ্টির সম্পূর্ণ মূল্যায়ন সম্ভব হয় নি।

দেশে দেশে কালে কালে ক্রমাগত তাঁর পাঠক বেড়ে চলেছে। যে প্রকাশকই তাঁর কমেদি য়ুমেন ছাপছেন, দেখছেন, তা ফুরিয়ে যেতে দেরি লাগছে না।

বর্ষণসিক্ত আকাশে সূর্যাস্ত দেখতে দেখতে ভিকতর য়ুগো যেদিন বালজাককে বিদায় অর্ঘ্য দিতে গিয়ে বলেছিলেন, "নিরপেক্ষ বিচার করবার দিন এখনও আমার আসেনি", সেদিনকার থেকে আজ বালজাকের খ্যাতি আরও উজ্জল আরও ব্যাপ্ত।

ভিকতর য়ুগোর বাণী ব্যর্থ হয় নি, কিংবা তিনি ঠিকই বলেছিলেন, "দিস ইজ নট দ্য এন্ড্ বাট দ্য বিগিনিং।"

১৮৪২-এ বালজাক বলেছিলেন, "খ্যাতি আসে মন্থর পায়ে। প্রত্যেক সুউচ্চ মিনারই দীর্ঘছায়া ফেলে। মানুষ প্রথমে ওই ছায়া ছাড়া আর কিছুই দেখতে পায় না। কালক্রমে ওই ছায়া সরে যায়, আলোকিত চূড়ার দিকে মানুষের চোখ পড়ে তখন।"

বুঝি শ্রেষ্ঠদের দিকে শ্রেষ্ঠদেরই চোখ পড়ে সব আগে। তাঁরাই প্রথম চিনতে পারেন। ভিকতর য়ুগোই সব প্রথম চিনেছিলেন বালজাককে। য়ুগোর পরে বোদলেয়ার। তারপর একে একে দস্তয়েফ্স্কি, মার্ক্স, স্ট্রিনডবের্গ, এঙ্গলস্-এর দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। চোখ পড়ে প্রুসতের এলেই-এর। শেষমেশ সারা বিশ্বের—সারা বিশ্ব সচকিত হয়ে ওঠে। চোখ ফেরায় বালজাকের দিকে, তাঁর প্রতিভায় মুগ্ধ হয়।

এই যুগোত্তর প্রতিভার জীবন যখন নির্বাণোন্মুখ কয়েকজন অতিথির মাঝখানে ভিকতর য়ুগো তখন ডিনার টেবিলে। সংবাদ পেয়েই তিনি অসমাপ্ত ডিনার ফেলে উঠে দাঁড়ালেন। কোচমানকে গাড়ি তৈরি করতে হুকুম দিয়ে অতিথিদের দিকে তাকালেন, "আমার পরম বন্ধুটি বুঝি আর বেঁচে নেই, আমাকে ক্ষমা করবেন।" বন্ধুদের শুধু এইটুকু বলে দ্রুত পায় নেমে এলেন নিচে।

পাভিইওঁ ব্যুজোঁর দরজায় এসে তিনি যখন ঘন্টি বাজালেন তখন বিরাট এক মেঘের পাহাড় চাঁদের আধখানা ঢেকে রেখেছে। পথ নির্জন। বাড়ির ভেতরেও যে জনমনুষ্য আছে বোঝা যায় না। তাঁর ঘন্টি বাজানোর শব্দে কেউ সাড়া দিল না। আবার তিনি ঘন্টি বাজালেন। এবার দরজা খুলে গেল।

য়ুগো লিখছেন:

"ঝির হাতে একটা মোমবাতি। সে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছিল। আমি তার পেছনে পেছনে বিরাট হল ঘরটায় এলাম। ফায়ার প্লেসের বিপরীত দিকে ভাস্কর দাভিদ্ দাঁজের-এর তৈরি বালজাকের আবক্ষ মর্মর মূর্তি আমার চোখে পড়ল। আমি দরদালান পেরিয়ে ভিতরে বালজাকের ঘরের দরজায় যখন এলাম, একটা অস্বাভাবিক ঘড়ঘড় শব্দ আমার কানে এল। আমি ঘরের

ভিতরে পা দিলাম। একটা বিশ্রী পচা গন্ধে আমার পেট মুচড়ে উঠল। বালজাকের পা দুটো শোথে ফুলে গিয়েছিল। মাসখানেক আগে খাট থেকে নামতে চেয়ে পায়ে জোর হোঁচট খেয়েছিলেন। চামড়া ছিঁড়ে গিয়েছিল। শোথের পায়ে ঘা—সে আর শুকোয় নি। পচে উঠেছিল। সেই পচা ঘায়ের গন্ধে ঘরটা থিকৃথিক্ করছিল। আমি বালজাকের বিছানার কাছে এগিয়ে গেলাম। অনেকগুলি বালিশের ওপরে অবশ হয়ে পড়ে আছেন বালজাক। তাঁর মুখ লাল, প্রায় কালচে দেখাচ্ছিল। খোঁচা খোঁচা দাড়ি গালে, কতদিন যেন কামানো হয় নি। খাটো করে ছাঁটা মাথার চুলগুলি উষ্কখুস্ক। চোখ ঘোলাটে, দৃষ্টি নিথর। মোমের মৃদু আলোয় মুখের আধখানা দেখছিলাম। আমার মনে হয়েছে, যেন বালজাক নয়, সম্রাট নাপোলেওঁকে দেখছি। বালজাক আর কথা বলতে পারছিলেন না। দৃষ্টি ত অনেক আগেই স্তিমিত। আমি যে এসেছি এ আর জানাব কাকে। আমি এগিয়ে এসে ওঁর গায়ের চাদরখানা একটু সরালাম। ওঁর হাতখানা হাতে নিলাম আমি। ঘামে ভেজা হাত, শিথিল। আমি হাতে মৃদু চাপ দিলাম। বালজাক চাপ ফিরিয়ে দিলেন না। বালজাকের মা বললেন, "নাকোয়ার্ত বলেছেন, আজকের রাতটা ওর পার হবে কিনা সন্দেহ।" তিনি দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেললেন। আমি কমেদি য়ুমেন-এর স্রষ্টার মুখের দিকে তাকিয়ে ছিলাম। আমার বুকটা মুচড়ে মুচড়ে উঠছিল। আমার জীবনের একমাত্র মহৎ বন্ধুর বিয়োগ ব্যথায় আমার চোখ ভরে জল এল। আমি তাঁর কপালে চুমু খেলাম। তারপর আর এক মুহূর্তও থাকতে পারলাম না সেখানে। আমি বেরিয়ে এলাম। বালজাকের মুমূর্ষু মুখ আমার মনে গেঁথে রইল। হলঘরের মধ্যে দিয়ে যখন ফিরছি, আর একবার চোখে পড়ল—গর্বোন্নত অবিচল সেই বিশাল আবক্ষ মর্মর মূর্তি। মোমের পলকা আলোয় অলৌকিক দেখাচ্ছিল। দেখে মৃত্যুর সঙ্গে অমৃতত্বের তুলনা করলাম। যখন বাড়ি ফিরলাম, আমার জন্যে অপেক্ষা করছিলেন তুরস্কের শার্জে দাফেয়ার রিজা বে, স্পেনের কবি নাভারেত, ইতালির নির্বাসিত কাউণ্ট আব্রভা বেন এবং আরও কয়েকজন মাননীয় মানুষ। আমি তাঁদের বললাম, "বন্ধুগণ, আজ য়ুরোপ এক মহান মানুষকে হারাতে বসেছে।"

বালজাকের নাভিশ্বাস উঠেছে। ইভা তখনও তাঁর শিয়রে নেই। তিনি তাঁর ঘরে। মাদাম সার্লাবিএ চাকর পাঠিয়েছিলেন তাঁকে ডাকতে। বন্ধ ঘরের ভিতরে থেকে কুচ্ছিৎ গাল পেড়ে তাকে হাঁকিয়ে দিয়েছেন ইভা। অগত্যা এবার সার্লাবিএ নিজেই এলেন। বন্ধ দরজায় টোকা দিলেন তিনি। কোন সাড়া পেলেন না। অনন্যোপায় তিনি তখন দরজার গুল ঘুরিয়ে পাল্লায় ধাক্কা দিলেন। দরজা হাট খুলে গেল। দরজায় খিল এঁটে দেওয়ার সৌজন্য বোধটুকুও যেন খুইয়ে বসেছিলেন বেপরোয়া বিলাসিনী। পলকের জন্যে ভিতরে চোখ পড়েছিল সার্লাবিএ-র। তিনি তক্ষুনি চোখ ফিরিয়ে নিয়েছেন, কিন্তু সেই এক লহমাতেই তাঁর চোখে পড়েছে এক আনগ্ন পুরুষ। সে চিৎ হয়ে শুয়ে আছে খাটের ওপরে। মাদাম সার্লাবিএ চিনতেন না: ইনি হলেন বালজাকের পুরোনো পরিচিত শিল্পী জঁ জিগু বালজাকের মৃত্যুর পরে অবশিষ্ট জীবন এঁরই উপপত্নী হয়েছিলেন ইভা।

ভিতরের দৃশ্য চোখে পড়তেই ঘৃণায় মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিলেন শ্রীমতী সার্লাবিএ আর তক্ষুনি ক্রুদ্ধ ভুজঙ্গীর মতন ছুটে এসেছেন ইভা: "ছোট লোক ইতর, কী স্পর্ধা আপনার।" শাশুড়ীর ঔদ্ধত্যে ক্রোধান্ধ ইভার জ্ঞান নেই যে, তাঁর বুক নিরাবরণ। তাঁর দেহে অন্তর্বাস নেই। একমাত্র বাস সূক্ষ্ম ভারতীয় মসলিনের গাউন তাঁর দেহের লজ্জা নিবারণ করতে পারছে না।

"তোমার স্বামীর নাভিশ্বাস উঠেছে, তাই বাধ্য হয়ে তোমাকে ডাকতে এলাম।" চাপা স্বরে ঘৃণা চাপা থাকল না শ্রীমতী সার্লাবিএ-র।

সাপের মাথায় যেন মন্ত্র-পড়া ধূলো পড়ল। শিউরে উঠলেন ইভা। মুহূর্তে মলিন হয়ে গেলেন। বেঁচে থাকতে যাঁর প্রতি পরম বিতৃষ্ণায় মুখ ফিরিয়ে নিয়ে তিনি বেপরোয়া হয়ে উঠেছিলেন, মৃত্যু-শয্যায় জেনেও যাঁকে তিনি নিদারুণ অবহেলায় ভুলে ছিলেন, এখন তাঁর আসন্ন-মৃত্যুর সংবাদ শুনে সহসা নিজেকে যেন বড় শূন্য বোধ হল তাঁর, অসহায় নিরাশ্রয় মনে হল।

বালজাককে তিনি যেমন দুরন্ত ভাবে ভালবাসতেন তেমনি নির্মম ভাবে ঘৃণাও করতেন। গত সতরটা বছরই তিনি এই দুই প্রবল বৃত্তির তাড়নায় ক্ষত বিক্ষত হয়েছেন···কখনো ভালবাসায় অবনতমুখ শরণাগত কখনো ঘৃণায় উদ্ধতশির নিষ্ঠুর। আর সব সময় এই দ্বিধা বিভক্ত সত্তার দ্বিমুখী বৃত্তির তীক্ষ্ণ কণ্টক তাঁকে কেবল ছিন্নভিন্ন করেছে। কিন্তু তিনি যে বালজাককে সত্যি ভালবাসেন, তাঁর বুকের মধু যে সবটুকু কেবল বালজাকের জন্যেই সংরক্ষিত রয়েছে, আজ এই চরম মুহূর্তের মতন করে আর কোনদিন বুঝি জানতে পারেন নি তিনি। কিংবা যেন জানতেন

বলেই ভুলে থাকতে ভুল পথে এমন নির্দয় হয়ে পা বাড়িয়েছিলেন। অথবা যে অক্ষম ভালবাসার দুর্নিবার আকর্ষণের কাছে আত্মসমর্পণ করা ছাড়া তাঁর উপায় ছিল না তারই বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে ইভা এমন স্বেচ্ছাচারিণী হয়ে উঠেছিলেন।

তিনি জনৈক নোটারি মঁসিয়ে মাতর্ দেলাপাল্ম্‌কে লিখেছিলেন, "বালজাকের সঙ্গে আমার বিবাহিত জীবনের সম্পর্ক মাত্র চারমাসের। এ চারমাস আমি বালজাকের বউ নয় ছিলাম নার্স। স্বামীর দুরারোগ্য ব্যাধির শুশ্রূষা করে আমি আমার স্বাস্থ্য খুইয়েছি আর খুইয়েছি আমার সঞ্চিত তাবৎ অর্থ, বিনিময়ে ভাগ্যে জুটেছে কেবল বিরাট এক ঋণের বোঝা আর কতকগুলি দরিদ্র পোষণের দায়।"

ডাঃ নাকোয়ার্ত এ চিঠিখানি তাঁর ডায়েরিতে উল্লেখ করে মন্তব্য করেছেন··· "তৎসত্ত্বেও বালজাকের মৃত্যুতে ইভার শোকের মধ্যে কোন খাদ ছিল না।" এ প্রসঙ্গে তাঁকে লেখা ইভার চিঠিখানাও উদ্ধৃত করেছেন ডাঃ নাকোয়ার্ত। তুর্কী সম্রাটের বাণী-উৎকীর্ণ বালজাকের বিখ্যাত ছড়িখানা নাকোয়ার্ত-কে বালজাকের স্মৃতি-চিহ্ন স্বরূপ দান করে ইভা লিখেছিলেন, "বালজাকের মৃত্যুর পরে আমি এখন আত্মাহীন শরীর মাত্র·······আপনার সংবেদনশীল মমতা আর তীক্ষ্ণ বুদ্ধি সত্ত্বেও আপনার পক্ষে অনুমান করা শক্ত হবে, আমি কী শোক পেয়েছি। জীবন যখন কেবল যন্ত্রণা হয়ে ওঠে তখন বেঁচে থাকতে কত যে সাহস চাই আপনি ভাবতে পারবেন না।"

বালজাক তাঁর মনে প্রেমের যে পিপাসা জাগিয়েছিলেন তা আর কেউ তৃপ্ত করতে পারে নি। ক্ষুধিত আত্মার সে পিপাসা শেষ অবধি অতৃপ্তই থেকে গিয়েছিল। তাঁর অন্তর-শূন্যতার সেই হাহাকারই তাঁকে অবশিষ্ট জীবন টেনে নিয়ে গেছে এক পুরুষের অঙ্ক থেকে আর এক পুরুষের অঙ্কে। এমনকি বালজাকের সন্তানপ্রতিম স্নেহভাজন সাতাশ বছরের তরুণ ছোটগল্প লেখক শঁফ্ল্যুরিকেও তিনি তাঁর বাসনার আগুনে ঝলসে দিতে ছাড়েন নি। সকলের শেষে যে পুরুষের কণ্ঠলগ্ন হয়ে তিনি শেষ জীবন কাটালেন সেই শিল্পী জঁা জিগু-ও তাঁকে নিয়ে কোন দিন সুখী হন নি। ইভা কাউকে সুখী করতে পারেন নি। তাঁর শোকের কেউ সঙ্গী ছিল না।

শাশুড়ীর কাছে দুঃসংবাদ শুনে তিনি আর তাঁর ঘরে ঢুকলেন না, জঁা জিগুকে খবরটা না দিয়েই, এমন কি পোশাকটা পালটানোর কথা ভুলে গিয়ে ছুটে এলেন বালজাকের ঘরে।

স্তব্ধ বিষণ্ণ কয়েকটি মূর্তি ঘরের মধ্যে। আর এক বিষণ্ণ গাঢ় ছায়া। মৃত্যুর ছায়া। ইভা এসে ঘরের মধ্যে ঢুকতে পচা ঘায়ের গন্ধে ঘিনঘিনে মলিন আলোর ঘর মুহূর্তের জন্যে তাঁর শরীরের সৌরভে ভরে গেল। সচকিত হয়ে উঠল উপস্থিত

কয়েক জোড়া চোখ। পলকের জন্যে তাঁকে দেখে আবার সে চোখগুলি মুমূর্ষুর ওপরে নিবদ্ধ হল। ইভা নতজানু হয়ে বসে পড়লেন বালজাকের খাটের সামনে।

বালজাকের জীবনও যেন কমেদি য়ুমেন-এরই একটি মহান পরিচ্ছেদ। তারই একটি বিয়োগান্ত কাহিনী। জীবন-ভোর তিনি নারীর অতৃপ্ত মনে ভালবাসার স্বপ্ন ও সুখ সঞ্চার করেছেন; কিন্তু কোন দিন সে ভালবাসার স্বপ্ন আর সুখকে নিজের জীবনে সত্য ও সম্পূর্ণ করে তুলতে পারেন নি। হাতের মুঠোয় আয়ত্ত করার মুহূর্তে সে সব—সমস্ত মরীচিকার মতন মিলিয়ে গেছে। এই করুণ ব্যর্থতার ছবিগুলি মর্মান্তিক হয়ে ফুটে উঠেছে তাঁর লে শুআঁ, লুই লাঁব্যের, আলব্যের সাভারু ইত্যাদি উপন্যাসে। প্রাচীন কালের দৌড়বীরদের মতন লক্ষ্য যখন করতলগত, মৃত্যু এসে কেড়ে নিয়ে গেছে এক একটি মহান চরিত্রের জীবন। তাঁর নায়কেরা সৌভাগ্য আর মৃত্যুকে হাত ধরাধরি করে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছে সাফল্যের দোর গোড়ায়। ভালবাসায় নারীকে জয় করে যখন এসেছে নায়ক, দেখেছে ভালবাসার প্রদীপটি গেছে নিভে। সুখী হওয়ার সকল সুযোগ যখন হাতের মুঠোয়, সুখ ভোগ করার সব শক্তি যেন অপচিত। বালজাকের নায়কদের বহু জনের ভাগ্যেই ঘটেছে বালজাকের জীবনের বেদনা-বিদ্ধ পরিণাম। বালজাক যেন আগেই জেনে গিয়েছিলেন কী ঘটবে তাঁর ভাগ্যে। সে ভাগ্যলিপি নানা চরিত্রের মধ্যে আগেই তিনি লিখে রেখে গিয়েছিলেন। কিংবা তাঁর অলৌকিক প্রতিভার আলোতে উদ্ঘাটিত হয়েছিল এক চিরন্তন সত্য—শূন্যতা আর নিঃসঙ্গতাই মানুষের ভাগ্য এ পৃথিবীতে।

বালজাক তাঁর অমিত-আকাঙ্ক্ষার আগুনেই শেষমেশ নিজেকে পূর্ণাহুতি দিয়েছিলেন। আসলে তাই দেয় সব মানুষ; সবাই শেষ অবধি নিজের তীব্র আকাঙ্ক্ষার আগুনে পোড়ে। কিন্তু ছাই-ই হয় অধিকাংশ মানুষ, দুর্লভ ভাগ্যের দু'চার জনই কেবল পুড়ে নিখাদ সোনা হন। বালজাক সেই কচিৎ ক্ষণজন্মাদের একজন। কৈশোর-যৌবনের প্রতিকূল পরিবেশ ও নৈরাশ্য এই নিদারুণ জেদী মানুষটির মধ্যে এক দুঃসাধ্য উচ্চাকাঙ্ক্ষা উপ্ত করেছিল। সে দুর্বার আকাঙ্ক্ষার দাবিতে তিনি চেয়েছিলেন—'টু বী লভড্, টু বী রীচ অ্যাণ্ড টু বী ফেমাস'। দুশ্চর সেই সাধনার দুরূহ পথের শেষে আশ্চর্য, তিনি সব পেয়েছিলেন—ভালবাসা, ঐশ্বর্য খ্যাতি কিছুরই অভাব ঘটে নি তাঁর। দুর্ভাগ্য কেবল তিনি তার কিছুই ভোগ করে যেতে পারেন নি।

ইভা এসে তাঁর খাটের পাশে নতজানু হয়ে বসে তাঁর শীতল হাতখানা তুলে নিলেন হাতে, মাথা নত করে কপালে চুমু খেলেন। উচ্ছ্বসিত শোক সংযত করতে ঠোঁট কামড়ে ধরেছেন ইভা, ততক্ষণে কয়েক ফোঁটা চোখের জল ভিজিয়ে দিয়েছে বালজাকের শুষ্ক কপোল।

বালজাক যেন প্রীতির এই শেষ স্পর্শটুকুর জন্যেই অপেক্ষা করছিলেন, মমতার এই অন্তিম উত্তাপটুকু উপভোগ করবার জন্যেই বুকের পাঁজরে প্রাণ যেন তাঁর তখনও পল গুনছিল। এইবার পরম নিশ্চিন্তে মর্ত্যলোকের শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন তিনি। মৃত্যু এসে মুছে দিল তাঁর সারা জীবনের সমস্ত জ্বালা। রণক্লান্ত বিজয়ী নায়কের ম্লান মুখে লেগে রইল মধুর একটি বিধুর হাসি। বুঝি এক অমর্ত্য শান্তির স্বপ্নে মগ্ন হয়ে গেছেন তিনি।

তাঁর সেই স্বপ্নমগ্ন অপরূপ বিষণ্ণ-হাসিমুখখানি কালের কঠিন হাত থেকে পরবর্তীকালের জন্যে উদ্ধার করেছেন স্ব-কালের নামী শিল্পী য়োজেন জিরো। বালজাকের মৃত্যুর অব্যবহিত পরে আঁকা এই করুণ-সুন্দর ছবিখানি এখন পারীর ম্যুজে দ্য বেজাঁসোঁ-তে সংরক্ষিত আছে।

১৮৫০ সালের ১৮ আগস্ট মধ্য রাতের পরে (১৯ আগস্ট) বালজাক শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। কিন্তু সে নিশ্বাস বায়ু পঞ্চভূতে মিলিয়ে যাওয়ার আগেই লক্ষ মানুষ উর্ধ্বশ্বাসে টেনে নিয়েছে সেই বায়ু—পৃথিবীর সর্বকালের মানুষের মনে তিনি অমরত্ব লাভ করেছেন।

"আজ তিনি সমাধির অন্ধকারে পরম শান্তিতে নিদ্রিত। কিন্তু সদাজাগ্রত আত্মা তাঁর সৃষ্ট আড়াই হাজার চরিত্রের মধ্যে দিয়ে চিরকাল তাঁর বাণী শুনিয়ে যাবে," শোক গম্ভীর কণ্ঠে বলেছেন ভিকতর য়ুগো, "……বন্ধুগণ শুনুন……"

২২ আগস্ট বালজাককে সমাধিস্থ করা হয়। তাঁর শেষ যাত্রার পুরোভাগে ছিলেন ভিকতর য়ুগো, অলেকজাঁদ্র্ দ্যুমা, স্যাঁৎ ব্যুভ্ ও ফরাসী রিপাবলিকের আভ্যন্তরীণ বিষয়ের মন্ত্রী মঁসিয়ে বারোশ।

এঁদের মধ্যে ভিকতর য়ুগো ছাড়া আর কেউ বালজাকের মিত্র ছিলেন না। সমালোচক মঁসিয়ে ব্যুভ-এর সঙ্গে ত বালজাকের মুখ দেখাদেখিই বন্ধ ছিল। এত ঘৃণা বুঝি বালজাক আর কাউকেই করতেন না। আর মঁসিয়ে বারোশ ত জানতেনই না বালজাক মানুষটি কে? ফরাসী রিপাবলিকের তরফ থেকে তাকে পাঠানো হয়েছিল শবানুগমন করতে। তখন আকাশ জুড়ে মেঘ, যে কোন সময় বৃষ্টি নামবে। বৃষ্টি নামলে তাঁকে ভিজতে হবে। মঁসিয়ে বারোশ বিরক্ত মুখ গম্ভীর করে ভিকতর

য়ুগোর পাশে হাঁটছিলেন, শুধোলেন, "হাঁ, মশাই, বালজাক মানুষটি কে? চিনিনে জানিনে অথচ সরকার থেকে হুকুম এল, যাও তাঁর শবযাত্রায় সঙ্গী হও গে।"

শুনে য়ুগো ভীষণ রেগে গেলেন। ঘৃণায় তাঁর ঠোঁট বেঁকে গেল। মূর্খ রাজনীতিকটির দিকে দু'পলক চুপ চোখে তাকিয়ে থেকে তিনি চাপা ঠোঁটে জবাব দিলেন, "বালজাক ছিলেন ফরাসী দেশের এক শ্রেষ্ঠ প্রতিভা।"

প্যের লাশ্যইজ-এর পাহাড় চূড়ার সমাধি ক্ষেত্রে যখন বালজাকের শব এসে পৌঁছল তখন বৃষ্টি নেমেছে আকাশ ঝেঁপে, দীর্ঘশ্বাসের শব্দ করে বইতে শুরু করেছে বাতাস। যেন প্রিয়তম পুত্রকে হারিয়ে জননী ফরাসী ভূমি আকুল হয়ে কাঁদছেন।

কাঁদছিল শবানুগামী শ' খানেক মানুষও।

মৃতের প্রতি শেষ শ্রদ্ধা নিবেদন করতে ভিকতর য়ুগো শবাধারের সামনে এসে দাঁড়ালেন। শাবল গাঁইতি চলছে তখন, তখন বালজাকের জন্যে কবর খোঁড়া হচ্ছে।

অশ্রুরুদ্ধ গলায় য়ুগো বলতে লাগলেন: "মঁসিয়ে দ্য বালজাক ছিলেন শ্রেষ্ঠদের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম, উৎকৃষ্টদের শিরোমণি। তাঁর সব বই মিলিয়ে একটাই বই—উজ্জ্বল জীবন্ত অগাধ। উত্থান পতন চঞ্চল আমাদের স্বকালীন সভ্যতার চলচ্চিত্র চিরকালের মতন বিধৃত হয়ে গেছে তার মধ্যে। আমাদের আনন্দ বেদনা ভয় ভালবাসা ক্ষোভ ঘৃণা সব সমস্ত ওতপ্রোত হয়ে গেছে তাঁর কাহিনীর কুশীলবদের সঙ্গে। বালজাক তাঁর সমগ্র রচনার একটিই নামকরণ করেছেন, 'হিউম্যান কমেডি' কিন্তু আমার তাকে বলতে ইচ্ছে করে 'হিউম্যান হিস্ট্রি'। যে-সৃষ্টি বিষয়ে, বিন্যাসে, শৈলীতে অতীত ও বর্তমানকে অতিক্রম করে দূর ভবিষ্যৎকেও স্পর্শ করতে পারে তারই গৌরবে আমরা অতঃপর চিরকাল গর্ব করব।"......

বৃষ্টির ঝাপটায় আর ঝড়ো হাওয়ায় বার বার ভেসে যাচ্ছিল য়ুগোর বিষণ্ণ গম্ভীর কণ্ঠস্বর। বিষাদ-বিরস কতকগুলি মানুষ নতশিরে চুপ করেছিল।

য়ুগো বলছিলেন, "আজ থেকে আর মানুষ রাজা মহারাজদের দিকে ফিরে তাকাবে না। তারা মনীষীদের মুখ দেখতে চাইবে। এবং যখন তেমন একজন মনীষী আমাদের মধ্যে থেকে চলে যাবেন, তারা শিউরে উঠবে, কেঁদে ফেলবে, যেমন করে কাঁদছি আজ আমরা বালজাকের জন্যে।"

ইভার পরনে সদ্য বিধবার বেশ। তিনি মাথা নত করে নিশ্চল দাঁড়িয়ে আছেন, যেন পাথরে খোদাই বিষাদের মূর্তি। তাঁর কপালে গালে বৃষ্টির বিন্দু ছড়িয়েছিল, তিনি কাঁদছিলেন কিনা বোঝা যাচ্ছিল না কিন্তু শ্রীমতী সাল্ঁবিএ,

যিনি সারা জীবনে ছেলের জন্যে এতটুকু স্নেহ অনুভব করেন নি, তাঁর চোখে আজ জল ঝরছিল। চোখের জল বৃষ্টির বিন্দুর সঙ্গে মিশে সারা গালে লেপটে গিয়েছে।

নতমুখ মানুষেরা বালজাকের কফিনের দিকে তাকিয়ে আছে।

বাদল বাতাসে এলোমেলো হয়ে ভেসে আসছে ভিক্তর য়ুগোর বাণী : "আমরা, গোটা পারী শহর আজ বালজাকের মৃত্যুতে বিপন্ন বিভ্রান্ত বোধ করছি। এই কঠোর শ্রমী শিল্পী, এই দার্শনিক ভাবুক ও কবি, এই অবিনশ্বর প্রতিভা আমাদের মধ্যে থেকে সারা জীবন দুর্দিনের ঝড়ে মার খেয়েছেন, সারা জীবন সংগ্রাম করেছেন দুরদৃষ্টের সঙ্গে। আসলে এটা সব প্রতিভাবানেরই ভাগ্য। এই কষ্ট কপালে করেই তাঁরা পৃথিবীতে আসেন। সেই কষ্ট ও সংগ্রামের শেষে আজ বালজাক শান্তিতে শয়ান। আজ তিনি সকল বিরোধ বিদ্বেষ যন্ত্রণার অতীত। আজ তিনি সমাধিতে প্রবেশ করেছেন, কিন্তু সমাধির সমাপ্তিতে নয়, সে অন্ধকারে নশ্বর দেহ রেখে তিনি খ্যাতির চির-আলোকিত জগতে অবিনশ্বর হয়ে গেছেন। এখন থেকে আমাদের আকাশের উজ্জ্বল নক্ষত্রসমূহের একটি হয়ে তিনি অনন্তকাল আলো দিতে থাকবেন।"......

ক্রমশ বাতাসের বেগ শান্ত হয়ে আসছিল; এখন বাতাসের সঙ্গে বৃষ্টিও বন্ধ হল। পশ্চিম আকাশের মেঘের পাহাড়ে চিড় ধরেছে। ভাঙা মেঘের ফাটল দিয়ে এক ঝলক রোদ এসে পড়ল সমাধি ভূমির ওপরে। বিদায় নেবার আগে অস্ত রবি যেন এক পলক দেখে নিচ্ছে বালজাককে। দেখতে দেখতে সূর্য অস্ত গেল। আকাশ মাটি অন্ধকারে ধূসর হয়ে উঠল।

য়ুগো ভগ্ন কণ্ঠে বললেন,......"না। এ মৃত্যুকে অন্ধকার বলব না, এ আলো। এ শেষ নয় শুরু। এ শূন্য নয় অনন্ত। বন্ধুগণ, আপনারা কি শুনতে পাচ্ছেন? আমি কী সত্যি বলি নি? আসলে এ রকম সমাধিই হচ্ছে মানুষের অমরত্বের প্রমাণ।"

য়ুগোর সংক্ষিপ্ত ভাষণ শেষ হলে বালজাকের কফিন কবরে নামানো হল। চারধারের ভিজে মাটি টেনে এনে বুজিয়ে দেওয়া হল কবর। তাঁর নশ্বর দেহ চোখের আড়াল হয়ে গেল। তিনি চিন্ময় হয়ে উঠলেন।

মোলিয়ের, লা ফোঁতেঁ-র পাশে একটি শূন্য স্থান নীরবে অপেক্ষা করতে থাকল আর একটি স্মৃতি-স্তম্ভের।

কোন পথিক এ সমাধিভূমিতে এসে দাঁড়ালে তিনি সে স্মৃতি-স্তম্ভে পড়বেন: এখানে শান্তিতে শায়িত আছেন ফ্রান্সের বিখ্যাত কথাশিল্পী অনরে দ্য বালজাক। জন্ম ২০মে ১৭৯৯, মৃত্যু ১৮-১৯ আগস্ট ১৮৫০।

সমাপ্ত